ঈদুল আযহা সংখ্যা

২০১২ হিজরী ১৪৩৩

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১২

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১২

প্র কা শ কা ল
রমজান ১৪৩৩
আষাঢ় ১৪১৯
জুলাই ২০১২

প্র চ্ছ দ
মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্র কা শ না য়
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি ক্র ম

স ম্পা দ কী য়
রাসূলের [সা] আদর্শ ৯

চ য় ন
রক্ত রঞ্জিত পথ ॥ সাইয়েদ কুতুব শহীদ ১১

প্র ব ন্ধ
রোম সম্রাটকে লিখিত নবী করীম [সা]-এর পত্র
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ২১
মানবজাতির মহান শিক্ষক
প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ২৮
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ॥ সৈয়দ আশরাফ আলী ৩৪
রাসূলুল-াহর [সা] যুদ্ধনীতি
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৩৯
ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা
ড. মাহফুজ পারভেজ ৪৫
আদর্শ সমাজ গঠনে রাসূলুল-াহর [সা] ভূমিকা
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ৬২
আজও প্রয়োজন রাসূলের [সা] অনুসরণ ॥ সাদী রায়হান ৮০
হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়য়াতুর রিদওয়ান
প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন ৮২
অধীনস্তদের সম্পর্কে প্রিয় নবী [সা]
মাওলানা হাবীবুর রহমান খান ৮৬
রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ [সা] ॥ মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী ৮৯
রাসূলুল-াহর [সা] যৌবনকাল ॥ ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ৯৩
মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ [সা] ॥ জাফর আহমাদ ১০০
মহানবী [সা]-এর বাল্যজীবন ॥ নাসির হেলাল ১০৫
আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ [সা] ॥ মো. জিয়াউল হক ১১০
মহানবী [সা]-এর শিক্ষাব্যবস্থা : প্রকরণ ও পদ্ধতি
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১১৭
বিশ্ব নবীর [সা] ন্যায় বিচার ॥ এম. মুহাম্মদ আবদুল গাফফার ১২৬
আল-াহর দিকে আহবান : মহানবীর রিসালাতের প্রধান মিশন
মুহাম্মদ আবুল হুসাঈন ১৩১

www.pathagar.com

ক বি তা

আবদুল হালীম খাঁ ১৫৭ ॥ হাসান আলীম ১৫৯ ॥ হারুন ইবনে শাহাদাত ১৬০ ॥ নিজাম উদ্দীন সালেহ ১৬১ ॥ মাহবুবুল আলম গোরা ১৬২ ॥ আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী ১৬৩ ॥ আমিনুল ইসলাম ১৬৪ ॥ শহীদ সিরাজী ১৬৫ ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল ১৬৬ ॥ ইসমাইল হোসেন মুফিজী ১৬৭ ॥ নাজমা ফেরদৌসী ১৬৮ ॥ মতিউর রহমান খালেদ ১৭০ ॥ রহমাতুল-াহ খন্দকার ১৭১ ॥ এম. মুবীনুল ইসলাম ১৭২ ॥ ফারুক মোহাম্মদ ১৭৩ ॥ তারিকুল ইসলাম ১৭৪ ॥ সাইফ আলি ১৭৫

ভ্র ম ণ

কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ॥ ১৭৬

সা হি ত্য

আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব ॥ শফি চাকলাদার ২০৮
সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী [সা] ॥ মুকুল চৌধুরী ২১৪
রাসূলের [সা] যুগে কাব্যচর্চা ॥ মুস্তাফা মনজুর ২১৯

স ং স্কৃ তি

আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ॥ হেলাল আনওয়ার ২৩১

অ র্থ নী তি

মহানবী [সা]-এর অর্থনৈতিক দর্শন ও মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ॥
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ২৩৭

ভা ষ ণ

মহানবী [সা]-এর বিদায় হজের ভাষণ শাশ্বত মানবিক আদর্শের পয়গাম ॥
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ২৪৪

ছো ট গ ল্প

তালে ঠিক ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ২৪৭
নূরের পরশ ॥ জুবায়ের হুসাইন ২৫১

প্র তি বে দ ন

বার্ষিক প্রতিবেদন ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ২৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] আদর্শ

আল কুরআন ও আসসুন্নাহই মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয়। এর বাইরে আমাদের জন্য তৃতীয় কোনো পথ নাই। রাসূল [সা] ছিলেন আল-কুরআনেরই জীবন্ত প্রতীক। সুতরাং তিনিই আমাদের একমাত্র রাহবার।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] আগমনের পূর্বে আরবসহ গোটা পৃথিবীই ছিল অশান্তির কালো ছায়ায় আবৃত। সর্বত্র সংঘাত, ক্ষমতার আসফালন, যুদ্ধ, অবিশ্বাস আর হানাহানির সয়লাব বয়ে গিয়েছিল। সুনীতি কিংবা সুবিচার ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল। তখনই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মানুষের তৈরি আইন, মগজপ্রসূত শাসন ব্যবস্থা মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়ে বরং সার্বিকভাবে অকল্যাণ ও ধ্বংসই ডেকে আনে। মানুষ তখন মুক্তির আশায় চাতকের মত চেয়েছিল। কিন্তু কোন্ পথে মুক্তি আসতে পারে, সেটা তাদের জানা ছিল না।

ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে, ঘন-ঘোর তমসা ভেদ করে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে [সা] সেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত ঠা-ঠা মরুভূমির বুকে, মক্কা নগরীতে প্রেরণ করলেন। নবী মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনাকে কেন্দ্র করে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করলেন আরব উপদ্বীপে। পরবর্তী মাত্র দশটি বছরে তিনি সুখ, শান্তি, কল্যাণ, সুনীতি, ন্যায় ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ গড়ে তুললেন। এর মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামের সুমহান আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সে ছিল এক বিস্ময়কর বিপ্লব। রাসূলের [সা] এই যুগান্তকারী বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল কেবল আল কুরআন। আর আল কুরআন অর্থই তো মানুষ ও পৃথিবীর জন্য এক নির্ভুল জীবন বিধান ও সঠিক দিকদর্শন। এই জীবন দর্শনের বাস্তব নমুনা বা পশপ্রদর্শক ছিলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসূলের [সা] যুগে তো বটেই, তাঁর ইন্তেকালের পরও যতদিন রাসূল [সা] প্রদর্শিত আল কুরআনের জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততোদিনই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব এক পরম নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার মধ্যে কাল যাপন করেছে। কিন্তু মানুষের জন্য চরম দুর্ভাগ্য তখনই নেমে এসেছে, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের [সা] প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে এসেছে।

বস্তুত এমনটি হতে বাধ্য। আদর্শিক ও ন্যায়ের ভিত্তি আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং তার সর্বকূলপ্লাবী আলো ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই কোথাও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এর বাস্তব প্রমাণ তো আজকের অস্থির ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ যুদ্ধোন্মুখ পৃথিবী।

আল কুরআন এবং রাসূলের [সা] পথ অনুসরণ না করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কম করা হয়নি। যুগে যুগে তার ব্যর্থতার ইতিহাসই কেবল ভারী হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনের জন্ম হয়েছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেটা কোনো কাজেই আসেনি। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনের মতো একই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলো জাতিসংঘ সংস্থা। কিন্তু নির্মম পরিহাসই বটে! সেই জাতিসংঘ সংস্থা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম কোনো ভূমিকাই রাখতে সক্ষম হয়নি।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, মানুষের গড়া আইন ও মানুষের তৈরি শাসন ব্যবস্থা এমনি হিংস্র ও পশুসুলভ হতে বাধ্য। বৃহৎ শক্তির দেশ বা শাসক দুর্বলতম দেশকে গ্রাস করার শিক্ষায় তারা উদ্বোধিত। সুতরাং তাদের লোলুপ জিহ্বা ক্রমসম্প্রসারণ হবারই কথা। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে অতীতে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আজ এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে না।

মানুষের এই সর্বাঙ্গীন দুর্দশা ও চরম অধ:পতন থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আল কুরআন এবং রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ। ইতিহাস সাক্ষী, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ছিল একমাত্র কল্যাণ রাষ্ট্র।

মানুষ ও মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন সুমহান আদর্শের বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। এই আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছিল নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লার [সা] মাধ্যমে। আজও বিশ্ব শান্তি ও সার্বিক স্থিতিশীলতার জন্য রাসূলের [সা] আদর্শই মানব জাতির একমাত্র অভ্রান্ত মুক্তির সনদ। অতএব প্রয়োজন রাসূলের [সা] পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের। যত দ্রুত আমরা এই অনিবার্য সত্য উপলব্ধি করতে পারবো, ততোই ত্বরান্বিত হবে আমাদের অশান্ত দাবদাহ থেকে মুক্তি।

রাসূলের [সা] আদর্শ এবং আল-কুরআনের আলোকধারা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টাই হোক আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও জীবনমিশন। ■

www.pathagar.com

রক্ত রঞ্জিত পথ

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

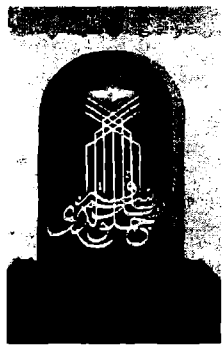

সুদৃঢ় দুর্গময় আকাশমণ্ডলের শপথ এবং শপথ সেদিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে। শপথ দর্শকের এবং দৃষ্ট বিষয়ের। ধ্বংস হয়েছে গর্ত খননকারীগণ, যাদের খনন করা গর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। যখন তারা গর্তের মুখে বসেছিল এবং ঈমানদারদের সাথে যা কিছু করা হচ্ছিল, তারা তামাশা দেখছিল। ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা [ঈমানদারগণ] প্রবল পরাক্রানমশ ও সদা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। যিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের অধিপতি এবং সে আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের প্রতি জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে এবং তারপর ঐ কাজ থেকে তওবা করে নাই– নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আজাব এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে ভস্মকারী আজাব। যারা ঈমান আনয়ন ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য সুনিশ্চিত পুরস্কার হিসেবে রয়েছে জান্নাতের বাগিচা যার নিচ দিয়ে

www.pathagar.com

ঝরনা প্রবাহিত। এটাই হচ্ছে সত্যিকার সাফল্য। মূলত তোমার আল্লাহর পাকড়াও খুবই শক্ত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় আরশের অধিপতি ও মহান। তিনি নিজ ইচ্ছায় সকল কাজ সম্পন্নকারী। [আল বরুজ : ১-১৬]

কুরআনে বর্ণিত গর্ত খননকারীদের কাহিনী সকল ঈমানদার ব্যক্তির জন্যই চিন্তা ভাবনার উদ্রেক করে যারা দুনিয়াতে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এ সূরা [সূরায়ে বুরুজ] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআন কাহিনীর ভূমিকা, বিবরণ, মন্তব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় যেভাবে পেশ করেছে, তার মধ্যে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের যাত্রাপথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটে উঠেছে। দ্বীনি আন্দোলনের প্রকৃতি, মানবগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও সুপ্রশস্ত পৃথিবীতে এ দাওয়াত প্রসারকালে যা যা ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দান করা হয়েছে। কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহতাআলা ঈমানদারদের চলার পথে সব বাধাবিপত্তি আসতে পারে তা উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপদ আপদ ও দু:খ-কষ্টকে বরণ করে নেয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

কাহিনীটি হচ্ছে একদল ঈমানদারের। তাঁরা তাঁদের পরওয়ারদিগারের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের ঈমানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সমাজের অত্যাচারী ও পরাক্রান্ত শত্রুগণ প্রশংসিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঐ ব্যক্তিদের ঈমান আনয়ন করার অধিকার দান করতে রাজি ছিল না। তাই ঈমানদারগণ চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। শত্রুদল আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা হরণ করে তাদের শাসকগোষ্ঠীর হাতের ক্রীড়নক বানানোর অপচেষ্টায় নিষ্ঠুর দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান পবিত্র হৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁদের ওপর আপতিত পরীক্ষায় পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন। তাঁদের ঈমান নশ্বর দেহের ওপর বিজয়ী হয়। তাই তাঁরা অত্যাচারীদের ভয়ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বরং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছেন তবু তাঁরা নিজেদের দ্বীন থেকে চুল পরিমাণ সরে যেতেও রাজি হননি। তাঁরা পার্থিব জীবনের মায়া ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত ছিলেন। এ জন্য নির্মম পন্থায় তাঁদেরকে পশুর মতো হত্যার উদ্যোগ আয়োজন করা হলেও তা দেখে তাঁরা জীবনের বিনিময়ে আকিদা পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাঁরা অস্থায়ী দুনিয়ার সুখ সম্পদের মায়া কাটিয়ে নির্ভীক চিত্তে উর্ধ্বজগতে চলে যান। স্বল্পস্থায়ী জীবনের ওপর ঈমানী শক্তির কী অপূর্ব প্রাধান্য।

পূর্ণ ঈমানদার, উন্নত চরিত্র, সৎকর্মশীল ও সদাচারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে ছিল আল্লাহদ্রোহী, হঠকারী, অসচ্চরিত্র ও অপরাধপ্রবণ হীন প্রকৃতির মানুষেরা। তারা জ্বলন্ত অগ্নিগহ্বরের কিনারায় বসে মুমিনদের যন্ত্রণাকাতর শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য উপভোগ করছিল। জ্বলন্ত আগুনে কিভাবে জীবন্ত মানুষকে গ্রাস করে এবং জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করে তা দেখার কৌতূহল নিয়ে তারা গর্তের পাশে জড়ো হয়েছিল।

www.pathagar.com

যখন কোনো ঈমানদার যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধা কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হতো, তখন তাদের আনন্দ উন্মত্ততায় রূপান্তরিত হতো। এবং রক্তের ফিনকি ও জ্বলন্ত মাংস খণ্ড দেখে তারা আনন্দে নৃত্য করতো। এ লোমহর্ষক কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, অত্যাচারী দল সম্পূর্ণরূপে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। কারণ হিংস্র জন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শিকার করে থাকে। তারা আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে জীব হত্যা করে না।

একই ঘটনা থেকে ঈমানদারদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করা যায়। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের অটল নির্ভরশীলতা পূর্ণতা লাভ করেছিল। সকল যুগ ও সকল কালের মানুষের জন্যই ঈমানের এ স্তর পরম কাম্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অত্যাচার নির্যাতন ঈমান আকিদার ওপর জয়যুক্ত হয়েছে। যদিও এ সচ্চরিত্র, ধৈর্যশীল ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের ঈমানী শক্তি শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল, তথাপি ঘটনার পরিণতি দৃষ্টে মনে হয় যেন বাতিলের সাথে শক্তি পরীক্ষায় তাদের ঈমানী শক্তি ব্যর্থতা অর্জন করেছে। এ জাতীয় জঘন্য অপরাধের দরুন নূহ [আ], হুদ [আ], সালেহ [আ], শুয়াইব [আ] ও লুত [আ]-এর জাতিগুলোকে যেভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, সেরূপ গর্ত খননকারীদেরকেও দেয়া হয়েছিল কি না, তা কুরআন পাক অথবা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। অথবা ফিরাউন ও তার লোক লস্করকে আল্লাহতায়ালা যে কঠোরতার সাথে পাকড়াও করেছিলেন, সেভাবে এদেরও দণ্ডবিধান করেছিলেন কি না তাও জানার কোনো উপায় নেই। ফলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এ ঘটনায় ঈমানদারদের পরিণতি ছিল খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি কি এখানে? ঈমানের উচ্চতম পর্যায়ে যারা পৌঁছে গিয়েছিলেন, সে আল্লাহভীরু ও সচ্চরিত্র দলটি কি অত্যাচার নির্যাতনের আবর্তে গর্তের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়েই শেষ হয়ে গেলেন? আর অত্যাচারী পশুসদৃশ মানুষগুলো কি সম্পূর্ণরূপে শাস্তি এড়িয়ে গেল? পার্থিব দৃষ্টিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগে। কিন্তু কুরআন ঈমানদারদেরকে অন্য ধরনের শিক্ষা দান করে এবং তাদের সামনে অপর একটি রহস্যের দ্বার-উদঘাটন করে। কুরআন ভালো-মন্দ নির্ণয়ের এক নতুন মানদণ্ড পেশ করে, যে মানদণ্ড হক ও বাতিলে সংঘর্ষে মুমিনদের চলার পথ নিরূপণে সহায়ক হয়।

সত্য ও মিথ্যার [হক ও বাতিলের] এ লড়াই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। আর শুধু পার্থিব জীবনেই পরিপূর্ণ মানবজীবন নয়। সংগ্রামে শুধু সমসাময়িক যুগের মানুষই অংশগ্রহণ করে না। বাতিলের বিরুদ্ধে হকের যুদ্ধে ফেরেশতাগণও শরিক হন, লড়াইয়ের গতিধারা, পর্যবেক্ষণ করেন এবং যা কিছু হয়, তা প্রত্যক্ষ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঘটনাবলিকে তুলাদণ্ডে ওজন করেন। এ তুলাদণ্ড সকল যুগ ও সকল ধরনের মানবীয় তুলাদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর তুলাদণ্ড থেকেও ফেরেশতাদের তুলাদণ্ড স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফেরেশতাগণ আল্লাহর মহান সৃষ্টি। এক সময় সমগ্র দুনিয়ায় যত সংখ্যক মানুষ বাস করে, ফেরেশতাদের সংখ্যা তাদের

www.pathagar.com

চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। তাই নি:সন্দেহে বলা যায় যে, হকপন্থীদের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা দুনিয়ার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান।

এ সকল স্তরের পরে হচ্ছে আখেরাত। আর সেটিই হচ্ছে ফলাফল প্রকাশের প্রকৃত স্থান। দুনিয়ার এ মঞ্চটি আখেরাতের সাথে সংযুক্ত– বিচ্ছিন্ন নয়। এটাই প্রকৃত সত্য এবং মুমিনদের অবিচল ঈমানও তাই। হক ও বাতিলের লড়াই দুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাপ্ত হয়ে যায় না। প্রকৃত সমাপ্তির স্তর তো এখনো আসেনি। দুনিয়ার মঞ্চে লড়াইয়ের যে অংশটুকু সংঘটিত হয়েছে, সেটুকুর ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। কারণ তাহলে এ সিদ্ধান্ত যুদ্ধের কয়েকটি সাধারণ ঘাত প্রতিঘাত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

যারা পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। চঞ্চলমনা ব্যক্তিগণই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি [অর্থাৎ আখেরাতের দৃষ্টিভঙ্গি] সুদূরপ্রসারী; বাস্তব ও ব্যাপক। কুরআন ঈমানদারদের মনে দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে আর এটিই হচ্ছে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় ঈমানভিত্তিক চিন্তাধারার বিশাল ইমারত। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য ইমান ও আনুগত্যের দৃঢ় এবং ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় অটল ধৈর্যধারণের প্রতিদানে যে পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন তা হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তি। এরশাদ হচ্ছে– যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের ফলে প্রশান্তি অর্জন করেছে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকিরই অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। [সূরা আর রাদ : ২৮]

আর এর সাথেই শামিল রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রেম ভালোবাসার ওয়াদা। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করে জীবন কাটিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা [মানুষের] অন্তরে মুহব্বত পয়দা করে দেবেন। [সূরা মরিয়াম : ৯৬] তাছাড়া ঊর্ধ্বজগতে তাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনার ওয়াদাও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, যখন আল্লাহর কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহাতাআলা ফেরেশতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার অমুক বান্দার সন্তানের রূহ হরণ করেছ?

ফেরেশতাগণ বলেন 'জি, হ্যাঁ।'

আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরো হরণ করেছো?"

তাঁরা বলেন, "জি হ্যাঁ, পরওয়ারদিগার।"

আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা সে সময় কী বলেছে?"

ফেরেশতা বলেন, "তিনি আপনার প্রশংসাকীর্তন করেছেন এবং "আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে– এ কথা বলেছে।"

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা তখন আদেশ দেন, "আমার এ বান্দার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরি কর এবং তার নাম দাও বায়তুল হামদ [প্রশংসার ঘর]।" [তিরমিযী]

হযরত নবী করীম [সা] থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতায়ালা বলেন, "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি হুবহু সেরূপ। যে যখন মনে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে লোকের সামনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আরও বড় মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি, যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে কয়েক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" [বুখারী ও মুসলিম] আর ওয়াদা রয়েছে যে, ঊর্ধ্বজগতে ঈমানদারগণের জন্য দোয়া করা হয় এবং তাদের জন্য সেখানে গভীর প্রেম ও সহানুভূতি রয়েছে।

"যেসব ফেরেশতা আরশ বহন করে এবং যাঁরা আল্লাহর চার পার্শ্বে থাকেন, সকলেই নিজেদের রবের প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন। আর তাঁরা ঈমানদরদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে বলেন, 'প্রভু! পরওয়ারদিগার! তোমার রহমত ও জ্ঞান সর্বত্র পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং যারা তওবা করে এবং তোমার প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করে, তাদের ত্রুটি মাফ করে দাও এবং তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রেহাই দাও।" [সূরা আল মুমিন : ৭]

শহীদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা শাশ্বত জীবনের ওয়াদা করেছেন– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিজিক দেয়া হয়। আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন,তা পেয়ে তারা খুবই প্রীত ও সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত যে, ঈমানদারদের মধ্যে যারা এখনো দুনিয়ায় রয়েছেন এবং এখনো পরপারে পৌছেননি, তাদের জন্যও কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভ করে তারা পরিতুষ্ট এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" [সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭১]

অনুরূপভাবেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, জালিম ও অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেন, যে পার্থিব জীবনের কিছুকাল তাদের রশি ঢিলা করে দিয়ে কিছুটা সুযোগ দান করেন এবং আখেরাতে তাদের বিচার হবে। অবশ্য কোনো কোনো সময় আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতেও পাকড়াও করে থাকেন। তবু প্রকৃত শাস্তির জন্য আখোরাতই নির্দিষ্ট।

গর্ত খননকারীদের কাহিনী ও সূরায়ে বুরুজের আলোচনা থেকে দাওয়াতে দ্বীনের প্রকৃতি ও এ পথের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মুখে আহ্বায়কদের ভূমিকা সম্পর্কে অপর একটি দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। দাওয়াতে দ্বীনের আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করেছে।

www.pathagar.com

এ আন্দোলন হযরত নূহ [আ], হযরত হুদ [আ], হযরত শুয়াইব [আ] এবং হযরত লুত [আ]-এর নিজ নিজ জাতির ধ্বংস এবং অল্পসংখ্যক ঈমানদারদের রক্ষাপ্রাপ্তির দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। কিন্তু যারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারা পরবর্তীকালে কী ভূমিকা পালন করেছেন, তা কুরআন আমাদেরকে বলেনি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকারার্থে আল্লাহতাআয়ালা কোনো কোনো সময় দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে আংশিক আজাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দেন। পরিপূর্ণ বিচার শেষে যথোপযুক্ত আজাব তো আখেরাতেই দেয়া হবে।

ইসলামী দাওয়াতের আন্দোলন, সৈন্য-সামন্ত সহকারে ফিরাউনের ধ্বংস, অনুচরসহ হযরত মূসা [আ]- এর উদ্ধারপ্রাপ্তি এবং পরবর্তীকালে তাঁর রাজ্য লাভ প্রত্যক্ষ করেছে। সে যুগের ইতিহাসে বনি ইসরাইলরা ছিল উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যদিও তারা কখনো পরিপূর্ণ দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি এবং দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে তাঁরা পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে কখনো কায়েম করেননি, তবু পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁদের দৃষ্টান্ত ছিল ভিন্ন ধরনের। যারা নবী মুহাম্মদ [সা]-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি এবং তাঁর আনীত জীবনবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ইতিহাস সেসব মুশরিকদের লাশের স্তূপও দেখতে পেয়েছে। ইতিহাস আরও দেখতে পেয়েছে কিভাবে ঈমানদারদের অন্তরে পরিপূর্ণরূপে ঈমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহর সাহায্য এসে তাদের গলায় সাফল্যের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। আর দুনিয়া সর্বপ্রথম মানবজীবনে ওপর পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নমুনা দেখতে পেল। এ সময়ের আগে বা পরে কখনোও রূপ দেখা যায়নি।

ইতিহাস গর্ত খননকারীদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। তাও আমরা দেখেছি। এ ছাড়াও ইতিহাস অনেক প্রাচীন ও নতুন ঘটনা ঘটতে দেখেছে। অবশ্য এগুলো ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেনি। আর আজকাল ইতিহাস অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাচ্ছে, যেগুলো ইসলামী ইতিহাসের শত শত বছরের প্রাচীন ঘটনাবলির সাথে কোনা না কোনো দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যান্য ঘটনাবিলর পর্যালোচনা করা অবশ্যই জরুরি। তবে গর্ত খননকারীদের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ এ ঘটনায় ঈমানের অগ্নিপরীক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ পরীক্ষায় হকপন্থীদের পক্ষে কোনো পার্থিব সাহায্য এগিয়ে আসেনি এবং বাতিলপন্থীদেরও পার্থিব জীবনে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। ঈমানদার ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করার জন্য তাদের বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে যাওয়ার ফলে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এ জাতীয় ঘটনায় তাদের পক্ষে কোন শক্তিই এগিয়ে আসবে না। তাদের এবং তাদের ঈমানের বিষয়াবলি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এ অবস্থায় ঈমানদারদের দায়িত্ব হচ্ছে কর্তব্য কাজে অটল থেকে দুনিয়াতে বিদায় গ্রহণ করা। তাদের কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই পরম ও চরমকাম্য হিসেবে গ্রহণ করা, আকিদা বিশ্বাসকে জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে করা এবং অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হলে ঈমানী শক্তিতে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

www.pathagar.com

ঈমানদারগণ এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত, মুখ এবং আমলের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সত্যতার সাক্ষ্যদান করবে। আর দ্বীনের দুশমনদের পরিণাম কিরূপ এবং দাওয়াতে দ্বীনের কাজে কিভাবে অগ্রসর হবে, এসব বিষয় আল্লাহতাআলার ওপর ছেড়ে দেয়াই উত্তম। ইসলামের অতীত ইতিহাসে যেসব পরিণামের নজির রয়েছে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে সে ধরনের পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন অথবা দ্বীনে হকের পতাকাবাহী ও বাতিলপন্থীদের জন্য কোনো নতুন পরিণাম ও নির্ধারণ করতে পারেন।

হকপন্থীগণ আল্লাহর দ্বীনের কর্মী। আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে যে ধরনের কাজ করতে চান, যখন যে স্থানে ও যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়ে নেন, ঠিক সেভাবেই কর্তব্য সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট পুরস্কার গ্রহণই মুমিনের দায়িত্ব। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তাদের নিজেদের হাতে নেই এবং এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। এটা একমাত্র প্রকৃত মালিক যিনি তাঁরই কাজ। কর্মীদের এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর কোনোই প্রয়োজন নেই।

ঈমানদারগণ তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারের প্রথম কিস্তি তো দুনিয়াতেই হাসিল করেন। আর এ পুরস্কার হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তির চিন্তা ও উপলব্ধির উচ্চমান, উৎকৃষ্ট ধ্যান-ধারণা, পার্থিব লোভ লালসা, ভয়ভীতি ও দু:খ-কষ্টের অনুভূতি থেকে মুক্তি লাভ। দ্বিতীয় কিস্তিও তাঁরা এ পৃথিবী থেকেই আদায় করে নেন। সে পুরস্কার হচ্ছে, ফেরেশতা মহলে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি ও তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা। পৃথিবীর গুণগ্রাহী লোকেরা তো তাদের প্রশংসা করেই থাকে। ফেরেশতা মহলে আলোচনা ঊর্ধজগতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিরই পরিচয়। পুরস্কারের সবচেয়ে বড় কিস্তিটি আখেরাতেই দেয়া হবে। সেখানে তাঁদের সহজ ও মামুলি ধরনের হিসাব-নিকাশ হবে এবং তাঁরা অপরিমিত লাভ করবেন। আর এসব কিস্তির মাধ্যমে দেয় সকল পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে সকল কিস্তিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর অশেষ মেহেরবানিতে তিনি মু'মিনদেরকে তাঁর কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ সৈনিক হিসেবে তাঁরই ইচ্ছানুসারে সকল কাজে ব্যবহার করার জন্য তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। এটাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কুরআনপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম মহান কাফেলাটির মধ্যে উল্লিখিত ধরনের চরিত্র উচ্চতম মান অর্জন করেছিল তাঁরা আল্লাহর সৈনিক হিসেবে কাজ করার প্রেরণায় নিজেদের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন এবং সকল অবস্থায় ও সকল সময়ই তাঁরা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন।

কুরআনের পাশাপাশি নবী করিম [সা]-এর প্রশিক্ষণের ফলে জান্নাতের দিকে তাঁদের সুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে কোনো মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অটল দৃঢ়তার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার মনোভাবও গড়ে ওঠে। আল্লাহর মীমাংসাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য তাঁদের নিকট পরম ও চরম কাম্য ছিল। হযরত আম্মার [রা] ও তাঁর মাতা-পিতাকে যখন মক্কার জালিমরা চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করেছিল তখন নবী [সা] স্বচক্ষে তাদের অবস্থা দেখেন এবং

www.pathagar.com

মাত্র এ কথা কয়টি উচ্চারণ করেন :

"ইয়াসিরের লোকজন, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে।"

খাব্বাব বিন আরাত [রা] বলেন, "আমরা নবী [সা]-এর খেদমতে অভিযোগ করেছিলাম, তিনি তখন কাবা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন আল্লাহর দরবারে সাহায্যের আবেদন করছেন না? কেনই বা আমাদের জন্য দোয়া করছেন না? তিনি জবাবে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের সময় মানুষকে ধরে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। এ ছাড়াও করাত দিয়ে তাদেরকে জীবন্ত চিরে ফেলা হতো। লোহার চিরুনি দিয়ে হাড় থেকে গোশত ছিন্ন করে পৃথক করা হতো। কিন্তু তবু তাদেরকে দ্বীনে হক থেকে ফিরানো সম্ভব হয়নি। আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এমন সময় আসবে, যখন একজন আরোহী সানয়া থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে এবং পথিমধ্যে তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর তার মেষপালের ওপর নেকড়ে বাঘের সম্ভাব্য আক্রমণ ছাড়া অন্য কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছ।"

আল্লাহর প্রতিটি কাজেই কল্যাণকর উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ পরিচালনা করেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টির খবরা-খবর সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত থাকেন। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় তা ঘটে। অদৃশ্য জগতে যে কল্যাণকারিতা লুকিয়ে আছে তা শুধু তিনিই অবগত আছেন। লুকানো কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীনেই ইতিহাস রচনা করে এবং তাঁরই মর্জি মাফিক ঘটনাবলির রহস্য এক সময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

যখন উল্লিখিত ধরনের অন্তর তৈরি হয়ে যায় এবং তা পার্থিব জীবনে প্রতিদানের আশা ব্যতীতই দ্বীনের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে, আখেরাতকেই হক ও বাতিলের প্রকৃত মীমাংসার ক্ষেত্র বিবেচনা করে আর যখন আল্লাহ তাআলা তাদের আন্তরিকতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ ও ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হন তখন তিনি দুনিয়াতেই তাদের সাহায্য করেন। পৃথিবীতে খেলাফত পরিচালনার পবিত্র আমানত তাদের হাতে সোপর্দ করেন। মু'মিনদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় এবং দ্বীনে হকের স্বার্থে তাদেরকেও আমানত অর্পণ করা হয়।

এ মহান দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ও অধিকার তারা সে দিনই অর্জন করেছে, সেদিন দুনিয়ার সম্ভাব্য প্রতিদানের কোনো প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি পার্থিব স্বার্থের পরবর্তে পরকালীন স্বার্থের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তারা যেদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অপর সকল প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছিল, সেদিন থেকেই তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহভাজন বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা করা হয়েছে গনিমাতের ধনসম্পদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, দুনিয়াতেই কাফেরদের ধ্বংস করার সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে, যেসব আয়াতই মদিনায় নাজিল হয়েছে।

www.pathagar.com

মুমিনদের অন্তর থেকে পার্থিব স্বার্থের সকল কামনা বিদূরিত হবার পর আল্লাহ তাআলা স্বয়ং অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সাহায্য দানের সুসংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র দ্বীনকে মানবসমাজের জীবন বিধান হিসেব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ সাহায্য দানের ওয়াদা করেন। মু'মিনদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ তাদের প্রতি পার্থিব জীবনে সাহায্য নাজিল হয়নি বরং এটা আল্লাহতায়ালার নিজেরই সিদ্ধান্ত ছিল। আর এ সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা আমরা আজ উপলব্ধি করতে পারছি।

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে আগ্রহী সকল দেশ, জাতি ও বংশের সাথে সংশি-ষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালো করে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ সূক্ষ্ম বিষয়টিই দাওয়াতে দ্বীনের সমগ্র পথ ও তার প্রতিটি মনযিল ও মোড় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং যারা পরিণাম ফলের তোয়াক্কা না করেই পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাদের অন্তরে অটল ধৈর্যশক্তি দান করে। তারা মনে করে, আল্লাহ তাআলা দাওয়াতে দ্বীন ও এ পথের আহ্বায়কদের যে পরিণামই নির্ধারণ করে রেখেছেন তা যথার্থ। তারা সহকর্মীদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে চরম বিপদসঙ্কুল খুনরাঙা পথ ধরে এগিয়ে যাবার সময় আশু বিজয় লাভের আশায় উদগ্রীব হবে না। অবশ্য স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই যদি দাওয়াতে দ্বীনের আন্দোলনকে পূর্ণত্ব প্রদান করে তার দ্বীনকে মুমিনদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে সে তো ভালো কথা। অবশ্য যদি এরূপ সিদ্ধান্ত হয় তবে তা নিছক আল্লাহ তায়ালারই মর্জি বলতে হবে– মু'মিনদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ নয়। কারণ এ পৃথিবী কর্মফল প্রাপ্তির ক্ষেত্র নয়।

গর্ত খননকারীদের কাহিনীর ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে কুরআন অপর একটি তথ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। আমাদের প্রত্যককেই সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত। কুরআন বলে– "এবং এ ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে।" [সূরা বরুজ : ৮]

সকল যুগের ও সকল বংশের লোকদেরই গভীর মনোযোগ সহকারে আয়াতে বর্ণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ঈমানদার ও বিরোধী দলের মধ্যে লড়াই অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র ঈমান, আকিদা ও চিন্তাধারার পার্থক্যের দরুন। অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে নয়। বিরোধী পক্ষ মুমিনদের ঈমানকে সহ্য করতে পারে না। তাদের সকল ক্রোধ ও শত্রুতার মূল কারণ হচ্ছে মু'মিনদের আকিদা বিশ্বাস। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ অথবা বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন– এ লড়াইয়ের লক্ষ্য কখনোই নয়। এ জাতীয় বিরোধ তো সহজেই মিটানা অথবা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু এখানে তো নির্ভেজাল আদর্শের লড়াই চলছে। বিরোধের বিষয়বস্তু হচ্ছে, কুফরি ব্যবস্থা চলবে, না ঈমান? জাহেলিয়াত থাকবে না ইসলাম?

মক্কার মুশরিকগণ নবী [সা]-এর নিকট ধনসম্পদ, শাসনক্ষমতা ও অপরাপর পার্থিব সুযোগ সুবিধা দানের প্রস্তাব পেশ করেছিল। তাদের স্বার্থ ছিল মাত্র একটি। আর সেটি হলো, নবী করিম [সা] যেন আকিদা বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব কলহ বন্ধ করে তার বিনিময়ে তাদের

www.pathagar.com

নিকট থেকে অন্য সুযোগ সুবিধা ও স্বার্থ আদায় করে নেন। নবী [সা] যদি তাদের ইচ্ছা পূরণে সম্মত হতেন, তাহলে তো মুশরিকদের সাথে তাঁর কোনো বিবাদই থাকতো না। তাহলে, বোঝা গেল যে ঝগড়ার মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান ও কুফর অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত আকিদা বিশ্বাস। যে ক্ষেত্রেই দুশমনদের সম্মুখীন হোক না কেন, মুমিনদের সর্বদা বিবাদের মূল বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কেননা, শত্রু দলের শত্রুতা ও ক্রোধের কারণ হচ্ছে এই যে, মুমিনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করে শুধু তাঁরই সামনে মাথা নত করে থাকে।

শত্রুপক্ষ মুমিনদেরকে লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের অন্তরের প্রজ্বলিত ঈমানের অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আকিদা বিশ্বাসের লড়াইকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা গোত্রীয় বিবাদের রূপ দেয়ার অপচেষ্টা চালাতে পারে। তাই মু'মিনদের কখনো প্রতারিত হলে চলবে না। তাদের বুঝতে হবে যে, পরিকল্পিত উপায়ে ষড়যন্ত্র মারফত তাদের পদচ্যুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ যুদ্ধে যারা এ জাতীয় ধুয়া তোলে, তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিনদেরকে চূড়ান্ত বিজয়ের অমূল্য হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী। এ বিজয় আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গর্তে নিক্ষিপ্ত ঈমানদারদের মতো অটল মানোন্নয়নজনিত পার্থিব লাভের আকুতিতেও অর্জিত হতে পারে।

আজকের দুনিয়াতে, বিশেষ করে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতারণামূলক প্রচার ও ইতিহাস বিকৃতকরণ প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা বিভ্রান্তির অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করছি। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, ক্রুশ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য লাভ। তাদের এ উক্তি একেবারেই মিথ্যা। সত্যি কথা এই যে, ক্রুশ যুদ্ধের অনেক পরে ক্রুশপন্থীদল সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ ধারণ করে। কারণ, ক্রুশীয় আকিদা বিশ্বাসের পক্ষে মধ্যযুগে যেরূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল ঠিক সেরূপে আজ পুনরায় ময়দানে আসা সম্ভব নয়।

এ জন্য তাদেরকে নতুন মুখোশ ধারণ করতে হয়েছে। কারণ ক্রুশের আকিদা বংশ-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রচিত গলিত ধাতু নির্মিত প্রাচীরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উল্লিখিত মুসলমানগণের মধ্যে কুর্দী গোত্রের সালাহুদ্দিন, মামলুক গোত্রের তুরান শাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ নিজেদের গোত্রীয় ও বংশীয় পার্থক্য ভুলে গিয়ে শুধু ঈমানী শক্তিকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একমাত্র ইসলামের পতাকা হস্তে বিজয় লাভ করেন।

"ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা যে, তারা [ঈমানদারেরা] প্রবল পরাক্রান্ত ও সদা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন।" [সূরা বরুজ : ৮]

আল্লাহ তায়ালার বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য এবং প্রবঞ্চক, ভোজবাজ ও অত্যাচারী দল মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট। ■

www.pathagar.com

রোম সম্রাটকে লিখিত নবী করীম [সা]-এর পত্র

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের দুই দিকে ছিল দুটো বিরাট রাষ্ট্রশক্তি– একটি পারস্য সাম্রাজ্য এবং অপরটি রোমান সাম্রাজ্য। আর এ দু'টি সাম্রাজ্যই ছিল তখনকার দুনিয়ার সেরা দু'টি শক্তি। আরব উপদ্বীপের পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরের দুই তীরে বিস্তৃত ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। বর্তমান আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইয়ামান পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। তখনকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক শক্তিমান এবং প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারকরূপে পারস্য সাম্রাজ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা এখন পর্যন্ত ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে আছে।

অপর দিকে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রাচীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। আরবরা এটাকে রোম সাম্রাজ্যরূপে অভিহিত করত। এই দু'টি বিশাল সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

সীমান্ত বর্তমান ইরাকের দজলা-ফুরাত তীরে একত্রিত হয়েছিল। রোম ইউরোপের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। বর্তমানে ইতালির রাজধানী। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশাল রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের আওতাধীন ছিল এশিয়ার মাইনর, মিসর, শাম, ফিলিস্তিন প্রভৃতি অঞ্চল। সম্রাট কনস্টানটাইন ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত বসফোরাস প্রণালির তীরে একটি শহরের পত্তন করেন। এটির নামকরণ করা হয়েছিল সম্রাটের নিজের নামের সাথে যুক্ত করে কনস্টানটিনোপল। মুসলমানগণ এ শহরটি অধিকার করে এর নামকরণ করেছিলেন ইস্তাম্বুল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই ঐতিহ্যবান শহরটি ইসলামী খিলাফতের রাজধানী ছিল এবং এখন পর্যন্ত এটি মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে বিবেচিত।

কনস্টানটিনোপলকেন্দ্রিক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশকেই পবিত্র কুরআনে এবং ইসলামী ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি ছিল কায়সার।

ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সাম্রাজ্যটি ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুসভ্য এবং সম্রাট কায়সার সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হওয়ার পাশাপাশি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রধান রূপেও বিবেচিত হতেন। প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির তিন বছরের মাথায় [৬১৩ খ্রি.] ইরানের শাহান শাহ খসরু পারভেজ হঠাৎ করেই রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আগ্রাসী ইরানীরা ইরাক, শাম ও মিসর অধিকার করে এশিয়া-মাইনরে ঢুকে পড়ে। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস [৬১০-৬৪১ খ্রি.] ইরানীদের এই হামলা প্রতিহত করতে পারলেন না। অগ্নিউপাসক ইরানীরা রোম সাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চল দখল করে রাজধানী কনস্টন্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অভাবিত পূর্ব জয় লাভ করার পর ইরানীরা খ্রিষ্টান জনগণের ওপর ভীষণ অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। খ্রিষ্টধর্মের সব ক'টি আলামত ভূলুণ্ঠিত করা হয়। এমনকি তাদের সর্বপ্রধান ধর্মীয় আলামত পবিত্র ক্রসের সেই দুর্লভ কাষ্ঠখণ্ডটি বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে ছিনিয়ে এনে তদানীন্তন পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছে দেয়া হয়– যা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ কাষ্ঠখণ্ডটিতেই হযরত ঈসা [আ]কে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল!

প্রতিবেশী দু'টি বৃহৎশক্তির মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ এবং রোমানদের সেই শোচনীয় পরাজয়ের সময়টিতে মক্কায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীগণের ওপর চলছিল কাফের-মুশরেকদের পক্ষ থেকে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন। অগ্নিউপাসক পারস্যবাসীদের অবিশ্বাস্য বিজয় সংবাদে মক্কার অংশীবাদী পৌত্তলিকরা ছিল দারুণ উল্লসিত। তারা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, অহি-নবী-রাসূল এবং আসমানি দীনের দাবিদার খ্রিস্টানরা যেভাবে পৌত্তলিক পারসিকদের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আসমানি প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির দাবিদার মুসলমানরাও আমাদের হাতে উৎখাত হবে।

www.pathagar.com

মক্কার কাফেরদের সে উল্লাস ও আস্ফালনের জবাবেই নাযিল হয় পবিত্র কুরআনের সূরা রোমের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত। যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, রোম তার প্রতিবেশীর হাতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয়ই শেষ কথা নয়। খুব শিগগিরই আগামী কয়েক বছরের মাথায় ওরা পুনরায় জয়ী হবে। অগ্র-পশ্চাৎ সব বিষয়ই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেদিন মুসলমানগণও উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও দয়ালু। এটা আল্লাহর ওয়াদা, তিনিও কখনও ওয়াদা খেলাপ করেন না।

পবিত্র কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। এক, তখনকার সেই দুরবস্থার কবল থেকে রোম সাম্রাজ্যের আশু উত্তরণ ঘটবে এবং পৌত্তলিকদের বর্তমান উল্লাস বিষাদে রূপান্তরিত হবে। দুই. সেদিন আল্লাহর সাহায্যের বরকতেই মুসলমানদেরও উল্লসিত হওয়ার কারণ ঘটবে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যখন উচ্চারিত হয়েছিল তখন রোমানদের পক্ষে বিজয়ী পারস্য শক্তির ওপর পুন:বিজয় লাভ তো দূরের কথা, তাদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোনো দূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। অপর দিকে মুসলমানগণও তখন যেরূপ অবর্ণনীয় দুরবস্থায় পতিত ছিল সেই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষেও অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে কোনো সুসংবাদের আশা করাটা ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা মাত্র। কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর এতটাই দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন যে, হযরত আবু বকর [রা] উবাই ইবনে খালফ নামক জনৈক কুরাইশ সর্দারের সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া না হওয়ার প্রশ্নে এক শ উটের বাজি ধরে বসলেন। অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কুরআনে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবায়িত না হয় তবে হযরত আবু বকর [রা] উবাইকে একশ উট দেবেন। আর যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায় তবে উবাই হযরত আবু বকর [রা]-কে একশ উট প্রদান করবে। এই ঘটনার কয়েক বছর পরই [৬২২ খ্রি.] একদিকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এলেন, অপর দিকে রোম সম্রাট কায়সার তার রাজধানী কনস্টানটিনোপলের সন্নিকটে ইরানের অবরোধ ভেঙে প্রতিপক্ষের ওপর প্রতি আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইরানীদের ওপর প্রতি-আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের বহু জ্ঞানী-গুণীর মনেও এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, এটাই সম্ভবত রোম সম্রাটের শেষ যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু সকল জল্পনা-কল্পনার জাল ছিন্ন করে রোম সম্রাট বিজয় লাভ করলেন। শুধু জয়লাভই করলেন না, আজারবাইজান পর্যন্ত পৌঁছে পারসিকদের সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিকুণ্ডটি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিলেন। অপর দিকে হিজরি ২ সনে বদরের ময়দানে অকল্পনীয় বিজয় লাভ করে মজলুম মুসলমানগণও উল্লসিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন। আর এভাবেই পবিত্র কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হলো। হৃতরাজ্য

www.pathagar.com

পুনরুদ্ধার এবং শত্রুর ওপর অকল্পনীয় বিজয় লাভ করার আনন্দে উদ্বেলিত হিরাক্লিয়াস বাইতুল মোকাদ্দাস জিয়ারত করতে এসেছিলেন। ঠিক এ সময়টিতেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত দেহইয়া বিন খলিফা কালবী [রা] হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রসহ বাইতুল মোকাদ্দাস পৌঁছেন।

ভরা দরবারে হযরত দেহইয়া বিন খলিফা কালবি [রা] প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রটি সম্রাটের হাতে অর্পণ করেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম!

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বরাবর। ন্যায়পথের অনুসারীগণের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি শান্তি লাভ করতে চান তবে ইসলামে দীক্ষিত হোন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহতায়ালা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনার সকল প্রজাসাধারণের ভ্রষ্টতার দায়ও আপনার ওপরই পতিত হবে।

হে আহলে কিতাবগুণ! বিতর্কিত সকল বিষয় স্থগিত রেখে এস আমরা এমন একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছি যে বিষয়ে তোমাদের এবং আমাদের মধ্য কোনো মতপার্থক্য নেই। আর তা হচ্ছে, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবাদত করব না। অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক সাব্যস্ত করবো না। আল্লাহ ছাড়া কাউকেই আমাদের উপাস্য রূপে গ্রহণ করবো না। যদি এ বিষয়গুলো আপনি অস্বীকার করেন তবে শুনে রাখুন যে, সর্বাবস্থায়ই আমরা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসে অটল থাকবো।– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এই মোবারক পত্রের পাঠ শ্রবণ করে সম্রাট হিরাক্লিয়াস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনোজগতে তখন যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। দরবারের লোকদের নির্দেশ দিলেন, আরবের কোনো বাণিজ্য কাফেলা বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থানরত থাকলে তাদের মধ্যে থেকে দু-একজন বিজ্ঞ লোককে যেন দরবারে ডেকে আনা হয়। ঘটনাক্রমে সে সময় কোরাইশদের প্রধান ব্যক্তি আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। তাকেই দরবারে হাজির করা হলো।

সম্রাট তার সাথে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশমর্যাদা, তাঁর চরিত্র, তাঁর প্রচারিত দীনের মৌল শিক্ষা, এই ধর্ম যারা গ্রহণ করেছেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

আবু সুফিয়ানের সাথে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের যে কথোপকথন হয়েছিল, বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তা ছিল নিম্নরূপ–

সম্রাট কায়সার : তোমাদের শহরে যিনি নবুওয়তের দাবি করেছেন, তাঁর বংশমর্যাদা কিরূপ?

আবু সুফিয়ান : অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।

কায়সার : নবী-রাসূলগণের সবাই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন যেন

www.pathagar.com

কেউ তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতে গিয়ে নিজেকে ছোট করা হচ্ছে এমনটা ভাবতে না পারে।

এর বংশে কি অতীতে অন্য আরও কেউ নবী হওয়ার দাবি করেছেন বা কেউ কি রাজত্ব করেছেন?

আবু সুফিয়ান : না, কখনও না।

কায়সার : যদি এমনটি হতো তবে এরূপ মনে করার অবকাশ ছিল যে, পারিবারিক ধ্যান-ধারণার প্রভাবে এ ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে প্রচার করছে। কিংবা সে তার পূর্ব পুরুষের বাদশাহী পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে এমন একটি দাবির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যারা তার ধর্মমত গ্রহণ করেছে তারা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর, না দুর্বল শ্রেণীর?

আবু সুফিয়ান : সাধারণ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক।

কায়সার : নবী-রাসূলগণের অনুসারী প্রথমাবস্থায় সাধারণ গরিব লোকেরাই হয়ে থাকে। তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে না কমে যাচ্ছে?

আবু সুফিয়ান : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে, কমছে না।

কায়সার : ঈমানের আকর্ষণ এমনটাই হয়ে থাকে; তা দিন দিন শুধু বর্ধিত হয়। আচ্ছা! এ পর্যন্ত কি কেউ বিরূপ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে গেছে?

আবু সুফিয়ান : এ পর্যন্ত কেউ এমনটি করেনি।

কায়সার : ঈমানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সত্যের প্রভাবেই তা মানব হৃদয়ে দৃঢ়মূল হয়। আর একবার তা হৃদয় স্পর্শ করলে আর কখনও তা বিচ্যুত হয় না। আচ্ছা! নবুওয়তের দাবি উত্থাপন করার আগে কি তোমরা এই লোকটিকে সত্যবাদী বলে মনে করতো না কখনও তাকে মিথ্যায় জড়িত হতেও দেখা গেছে?

আবু সুফিয়ান : না, সে কখনও মিথ্যা বলতো না।

কায়সার : যে ব্যক্তি কোনো সময় মানুষের সাথে মিথ্যা বলে না, সে কেন সৃষ্টিকর্তার নামে মিথ্যা বলতে যাবে? নবীগণ কখনও মিথ্যা বলেননি, কাউকে প্রতারণাও করেননি। ইনি কি কখনও কোনো চুক্তি বা ওয়াদা অঙ্গীকারের অন্যথা করেছেন?

আবু সুফিয়ান : এখন পর্যন্ত তো এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, তবে সম্প্রতি তার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে [হুদাইবিয়ার সন্ধি] দেখা যাক, সেটির মর্যাদা তিনি রক্ষা করেন কি না?

কায়সার : পয়গম্বর কখনও চুক্তি ভঙ্গকারী হননি। তোমাদের সাথে কি তার কখনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : জি হ্যাঁ, কয়েকবারই যুদ্ধ হয়েছে।

কায়সার : যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছি, কখনও তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন।

কায়সার : আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলগণের অবস্থা সাধারণত এমনটিই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জয় তাঁদেরই হয়ে থাকে। তাঁর শিক্ষার মূল কথাগুলো কী?

আবু সুফিয়ান : তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর। অন্য কাউকে

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে শরিক করো না। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চল। সত্য কথা বল। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। পূর্ব-পুরুষদের অংশীবাদী রীতি-নীতি পরিত্যাগ কর। নামাজ পড়।

কায়সার : প্রতিশ্রুত যে নবীর কথা আমরা জেনে আসছি, তাঁর শিক্ষা হবে এরূপই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, অতিসত্বরই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তবে এমন ধারণা ছিল না যে তিনি আরবের বুকে আবির্ভূত হবেন! হে আবু সুফিয়ান! যদি তুমি মিথ্যা বলে না থাক, তবে সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমি যে স্থানটায় বসে আছি, এটিও তাঁর পদানত হয়ে যাবে। হায়! আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারতাম তবে তাঁর পা দুয়ে দিতাম। [বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, তারিখে-তাবারি, তৃতীয় খণ্ড]

আবু সুফিয়ান পরে বর্ণনা করেছেন, আমার একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ [সা] যেহেতু আমাদের দীন ধর্মের শত্রু সুতরাং তাঁর সম্পর্কে সম্রাটের মন বিষিয়ে দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় সত্য কথাই আমাকে বলতে হয়েছে। আমি সম্রাটের প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাবে সঠিক উত্তর দিয়েছি। তবে এতটুকু বলতে ছাড়িনি যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান কুরাইশ গোত্রের মধ্যে মোটেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মমতটি এমন কিছু নয়, যা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত কিছু থাকতে পারে! আবু সুফিয়ানের সাথে সম্রাটের আলোচনা দরবারিদেরকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে ফেলেছিল। হযরত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের প্রতি সম্রাটের মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দরবারিদের ক্ষোভের মাত্রা চরমে পৌঁছেছিল।

এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় সম্রাট হযরত দেহইয়া [রা]কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আপনজনদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এবং তাদের হাতে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের নবীর আনুগত্য গ্রহণ করতাম। নি:সন্দেহে তিনি সেই প্রতিশ্রুত নবী, আমরা যাঁর অপেক্ষা করছি। [বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, তারিখে তাবারি, তৃতীয় খণ্ড]

বুখারী শরীফের আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অন্তরে সত্যের জ্যোতি পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিংহাসন হারানোর ভয়ে সে আলো স্তিমিত হয়ে যায়।

ইতিহাসের প্রামাণ্য বর্ণনা অনুযায়ী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত এই পত্রটি ছিল হযরত আবু বকর [রা]-এর হস্তলিখিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পত্রের ওপর সিলমোহর লাগিয়েছিলেন। হিজরি সপ্তম শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই পবিত্র পত্রটি স্পেনে সংরক্ষিত ছিল। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দেস ও ইতিহাসবিদ আল্লামা সুহাইলী [রহ] তাঁর সময়কালে পত্রটি স্পেনে সংরক্ষিত ছিল এবং তিনি সেটি জিয়ারত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কস্তলানি [রহ] [৮৫১ হি.-৯২৩ হি. মোতাবেক ১৪৪৭-১৫১৭ খ্রি.] লিখেছেন যে, মালিক মনসুর কালাদুন সালেহি [৬৭৮-৮২ হিজরি] স্পেনের এক শাসক আলফানসুর নিকট এখন দূত প্রেরণ করেছিলেন। আলফানসু

www.pathagar.com

মালিক মনসুরের দূত সাইফুদ্দীন ক্বালিজকে উক্ত পবিত্র পত্রখানা দেখিয়েছিলেন। পত্রটি স্বর্ণনির্মিত একখানা বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। আলফানসু বলেছিলেন যে, এটি রাসূলুল্লাহর ওই পত্র যা তিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। [কস্তলানি প্রথম খণ্ড, ৬৭ পৃ:] পবিত্র এ পত্রটি বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে পুনরায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণী অনুযায়ী স্পেনে মুসলমানদের পতনের পর পত্রটি কোনো না কোনোভাবে পবিত্র মক্কায় নীত হয়। সেখান থেকেই এটি শরীফ হোসাইনের পুত্র আমীর আবদুল্লাহর হস্তগত হয়। এই আমীর আবদুল্লাহ ছিলেন জর্দানের পরলোকগত বাদশাহ হোসেনের পিতামহ।

আমীর আবদুল্লাহর নিকট থেকে পত্রটি তার এক স্ত্রীর হাতে পড়ে। সেই ভদ্রমহিলা পত্রটি হস্তান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তখনকার আবুধাবির শাসক [আরব আমিরাতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান শায়খ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান প্রিয়তম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পর্শধন্য এই অমূল্য পত্রটি নগদ দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যে ক্রয় কর নেন। এটা ছিল ইতিহাসে যে কোনা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সর্বোচ্চ মূল্য।

পবিত্র এই পত্রটি মসৃণ পাতলা চামড়ার ওপর লিখিত। আটটি ছত্রে পত্রটি সমাপ্ত। শেখ যায়েদের সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর ইবরাহীম কর্তৃক বিভিন্নভাবে বৈজ্ঞানিক বিশে-ষণের পর এটিই যে সেই আসল পত্র সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শায়খ যায়েদ মূল্যবান পত্রটি আবুধাবির জাদুঘরে সংরক্ষিত করেছেন বলে জানা যায়।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত পত্রাবলির যে কয়টি মূল কপি এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে আবুধাবিতে সংরক্ষিত এই পত্রটি তন্মধ্যে পঞ্চম। ইত:পূর্বে আরও চারটি পত্রের আসল কপি শনাক্ত করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে– ১. হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসীর বরাবর লিখিত পত্র।

২. রোম সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত মিসরের শাসক মকোকাসের উদ্দেশে প্রেরিত পত্র। ৩. বাহরাইনে নিযুক্ত ইরানের শাসনকর্তা মানযারের নামে প্রেরিত পত্র। ৪. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে লিখিত পত্র।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এগুলো যে আসল পত্র সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে। হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত পত্রাবলির যে বয়ান রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দ্বারা শনাক্তকৃত পাঁচটি পত্রের পাঠোদ্ধার করে দেখা গেছে, এগুলোতে একটি শব্দেরও গরমিল নেই। হাদিসের বর্ণনাগুলো কত বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষিত হয়েছে, এটাও তার একটা বাস্তব প্রমাণ!

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। ■

www.pathagar.com

মানবজাতির মহান শিক্ষক

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

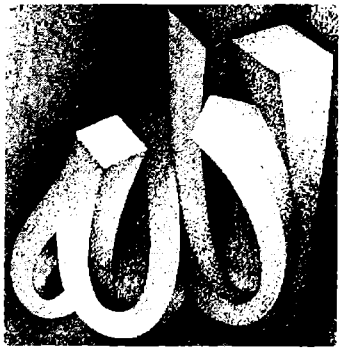

মানবজাতির শিক্ষকরূপে বিশ্বনবীর অবদান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে সর্বপ্রথম ইসলামে জীবনের স্বরূপ ও জীবনদর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ আসাদ যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পরিবারের লিওপোল্ড উইস পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৯২৬ সালে মুসলিম হয়েছিলেন মুহাম্মদ আসাদ। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মহান ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে সেই জ্ঞান সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে তিনি তুলে আনলেন এক রাশি মণিমুক্তা। ইসলামের কোন দিকটি তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এখনো জানি না ইসলামের কোন দিক আমার নিকট সবচেয়ে বেশি আবেদনপূর্ণ ছিল। আমার মনে হয়েছে ইসলাম এক পরিপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের মতো। এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে এমন সুদৃঢ়ভাবে সুবিন্যস্ত যে, এর

www.pathagar.com

কোনো একটি প্রয়োজনাতিরিক্ত নয় এবং কোনো একটিরও নেই স্বল্পতা। ফলে তা হয়েছে সুসমন্বিত এবং সুঠাম, সুশান্ত।'

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝায়, ইসলাম তা থেকে স্বতন্ত্র। ইসলাম হলো এক জীবনব্যবস্থা। এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। অন্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধুমাত্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিন্যাসযোগ্য আধ্যাত্মিক চেতনা নয়, তা হলো সুনির্দিষ্ট নীতিসূত্রের কাঠামোয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার কক্ষপথ। ইসলামের মূলমন্ত্র হলো একত্ববাদ। সমগ্র জীবন ঐক্যবদ্ধ, কারণ তা স্বর্গীয় একত্ব থেকেই উৎসারিত। পার্থিব জীবনে ব্যক্তি যা সম্পন্ন করে সেই ব্যক্তিত্বের সীমারেখায় সব কিছুর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এক ঐক্যবোধ-তার ভাবনা-চিন্তায়, কর্মে, এমনকি তার সজ্ঞান চেতনায় এক ঐক্যানুভূতি। ইসলামের সৌন্দর্য হলো–জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করতে হয় না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যক্তিকে কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে কোনো গোপন পথের অনুসন্ধানে যেতে হয় না। চূড়ান্ত মুক্তি অথবা মোক্ষ লাভের জন্য মনের ওপর দুর্বোধ্য কোনো তত্ত্বের প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে হয় না। ইসলামে এমন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। মুহাম্মদ আসাদের কথায়, 'এটি হলো সহজ সরল জীবন কর্মসূচি, যা পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত করছেন। এর শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে মাবন জীবনের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক দিকের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, পার্থিব জীবনব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব। খ্রিষ্টধর্মে বলা হয়েছে, কেবল দৈহিক আকাঙ্ক্ষা দমন করেই এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম। হিন্দু ধর্মের বিধান হলো, নিচু স্তর থেকে ক্রমাগত পুনর্জন্মের ধারাবাহিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েই ব্যক্তি লাভ করে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মোক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা চূর্ণবিচূর্ণ করে সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্মিলিত হওয়ার আকুতি হল নির্বাণ লাভের মাধ্যম।

ইসলাম কিন্তু বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত বিধান পালন করেই, গভীর আনুগত্যের সাথে, সচেতনভাবে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেই একজন মুসলমান পরিপূর্ণ জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারেন। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপার কৃপায় অত্যন্ত মূল্যবান নেয়ামত হিসেবে যে জীবন দান করেছেন তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এই সত্য মনে রেখে মানবজাতির শিক্ষকরূপে মহানবী [সা]-এর অবদান পর্যালোচনা করতে হবে।

মানবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ইসলামে রয়েছে এক উন্নততর বিশ্বাস। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'দেখো, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি।' বিশ্বের প্রথম মানব আদম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার এই উক্তি। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। মানব যে সবকিছুর ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করবে, তা পূর্বনির্ধারিত। তবে বিশ্ব চরাচরে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও অগ্রগতি সাধনের

www.pathagar.com

ধারণা ইসলামে একটু ভিন্ন। পাশ্চাত্যে এই সম্পর্কিত ধারণা হলো– মানুষ উত্তরোত্তর তার আত্মিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে তার জাগতিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানমনস্কতা লাভের মাধ্যমে। ইসলামে কিন্তু এই বিশ্বাস রয়েছে যে, মানবগোষ্ঠী ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত এই উভয় পর্যায়ে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে জাগতিক এবং পারমার্থিক উন্নয়নের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তাঁর জীবনের পর্যায়গুলো অত্যন্ত সাবধানে অথচ সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মদ [সা] হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন ঠিকই এবং উচ্ছন্নে যাওয়া মক্কা নগরীতে তার মিশন সফল করার জন্য তিনি ফিরে এসেছেন বারবার। মক্কা নগরী কিন্তু ইসলামের জন্ম নগরী হলেও ইসলাম তার পরিপূর্ণতা লাভ করে মদিনাতেই। হেরাগুহায় মহানবী [সা] ছিলেন উপবাসী, সন্ন্যাসী ও সুফি সাধক। তারপর মদিনাতে এসে তিনি হলেন ইসলামের বাণীবাহক। মদিনাতে এসে তিনি হলেন ইসলামের প্রবর্তক। মদিনাতেই ইসলামী চেতনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছতর হলো। পবিত্র কুরআন শরীফেই রয়েছে, 'আজ আমি আপনার দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ রহমত আপনার ওপর নাজিল করলাম। আমি খুশি যে ইসলাম আপনার দীন। [মাদানি সূরা : কুরআন; আলিয়া ইজেতবেগোভিচ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম, ১৯৯৬, ৭৯] মক্কায় নয়, মদিনাতেই ইসলামের সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর হেরাগুহায় ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে প্রত্যাবর্তন, এক কথায় পারমার্থিকতা ও যুক্তির তথা আধ্যাত্মিকতা ও কর্মনিষ্ঠার সমন্বয়–এই হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য। মরমিবাদ দিয়ে যার শুরু, রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণতা। এ যেন মানবজীবনের সারবত্তা। মনুষ্য জীবনের মতোই এর রয়েছে একদিকে 'স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ' যা এক মহাকবির মহাকাব্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সহজ, সরল ও আর্কষণীয় গদ্য।

খ্রিস্টবাদ কখনো একেশ্বরবাদে স্থির হয়নি। খ্রিস্টান গসপেলে তাই দেখা যায়, তিনি সত্তার অবস্থান, ট্রিনিটি। খ্রিস্টীয় তত্ত্বে ঈশ্বর হলেন পিতা, কুরআন শরীফে কিন্তু আল্লাহকে শ্রদ্ধা করেন। মা মেরী ও অন্যান্য সাধু বা সেইন্টরা খ্রিস্টবাদে দেবতুল্য। মুসলমানরা কিন্তু মহানবীকে শ্রদ্ধা করেন একজন পরিপূর্ণ মানবরূপে, কোনো ফেরেশতারূপে নয়। এইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মসজিদকে খ্রিস্টানদের গির্জা অথবা হিন্দুদের সাথে তুলনা করলেই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মসজিদে দেখা যায় বুদ্ধিবৃক্তিক চর্চার এক মুক্ত ও উদার আবহ। গির্জায় দেখা যায় রহস্যময়তার এক পরিবেশ। মন্দিরে পাওয়া যায় রহস্যময়তার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ বা বর্ণভিত্তিক কর্তৃত্ব এবং যাজকীয় প্রাধান্যের এক আবহাওয়া। মসজিদের অবস্থান সাধারণত কর্মস্থলে, কোনো বাজার বা বসতির কেন্দ্রে। মসজিদে নামাজ আদায়ের পর জাগতিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। গির্জা কিন্তু বাস্তবতার

www.pathagar.com

অনুষঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চায়। আনুষ্ঠানিক নীরবতা, অন্ধকার অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভব নির্মাণের প্রচেষ্টা এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। খ্রিস্টধর্মের মর্মবাণী অথবা গসপেলের [এড়ংঢ়বষ] লক্ষ্যশুধু ব্যক্তি, কিন্তু কুরআনের বাণী ব্যক্তিসমষ্টির জন্য। গির্জার ব্যবস্থাপনায় দেখা যায় এক ধরনের অভিজাততন্ত্র। ভাবগম্ভীর পরিবেশে যাজকীয় কর্তৃত্বের প্রকাশ। মসজিদে কিন্তু সাধারণ ও অ-সাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্র মূর্ত। ইসলামী আইনব্যবস্থায় ইজমা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জনগণের ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত, তার মাধ্যমে জনগণের অভিমতের প্রকাশ ঘটেছে ইসলামে।

ইসলামে এভাবে শুধু যে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাই নয়, নতুন সভ্যতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্র হলো শিক্ষা। কুরআন শরীফের প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া, কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে উল্লেখ করেছেন। মানুষ কিন্তু বিশ্বময় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শুধুমাত্র তার বিশেষ জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ দুটোই ইসলামে অবশ্য করণীয়। হযরত মুহাম্মদ [সা] নিজেই বলেছেন, 'আমি দু'জনের বিষয়ে অসন্তুষ্ট : অজ্ঞ ভক্ত এবং নাস্তিক পণ্ডিত'।

এও উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাহীন বিশ্বাস, বিশ্বাসহীন শাসক অনেকটা নোংরা শরীরে বিশুদ্ধ আত্মার মতো– মহানবীর বক্তব্য এমনিই ছিল। এই অর্থে ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য ব্যবস্থা। কারণ, ইসলাম মানব-প্রকৃতির দ্বৈত প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য যে কোনো ধর্ম বিকল্প মানবজীবনের খণ্ডিত প্রেক্ষিতকে ধারণ করে মাত্র। এদিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব প্রকৃতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সকল সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, মানুষের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক গঠন– সবই ছিল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর শিক্ষার বিষয়বস্তু। শুধু তাই নয়, এই নশ্বর পৃথিবী লয় হলেও পারত্রিক জগৎ পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত।

ইসলাম শিক্ষার আদি কেন্দ্র হলো মসজিদ। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম [সা] নবুওয়ত লাভের পর কাবা শরীফকে প্রথমে শিক্ষা কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, মক্কা নগরীতে তিনি 'দারুল আরকাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। পরে তিনি মদিনায় হিজরত করলে প্রথমে কুবা নামক স্থানে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে তিনি মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূলুল্লাহ [সা] আসরের নামাযের পরে অধিকাংশ সময় এই মসজিদে শিক্ষাদানে রত থাকতেন। এও জানা যায়, সপ্তাহে একটি দিন তিনি মহিলাদের জন্যও নির্ধারিত করেন। তা ছাড়া, হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরিতে মকরামহ ইবনে নাওফেল নামক আনসারের গৃহে 'দারুল কাররাহ' নামে একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল। সাহাবীগণ সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। রাসূলে করিম [সা]-এর জীবদ্দশায় মদিনায়

www.pathagar.com

৯টি মসজিদ ছিল। এসব মসজিদে মদিনা ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে ছেলে-মেয়ে, মহিলা-পুরুষ সকলেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আধুনিক কালের শিক্ষাদান পদ্ধতির মতো তখন ভর্তি এবং মাসিক মাইনের দ্বারা শিক্ষাকার্যক্রম কোনোক্রমে সংকোচিত হতো না। মধ্যযুগে ইউরোপে গিল্ডের আকারের যেভাবে বিশেষ কলাকৌশল শেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হতো, শিক্ষককে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়ে যেভাবে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে জনসাধারণের নিকট থেকে আড়ালে রেখে সঙ্কীর্ণ এক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গৃহীত হতো, মদিনায় এবং পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম বিশ্বে শিক্ষালয় ছিল অবাধ, মুক্ত, সম্মানীবিহীন, সবার ওপর জীবনমুখী। রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন এর প্রবর্তক। সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'মদিনার মসজিদে হযরত আলী [রা] এবং তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ [হযরত আব্বাসের পুত্র] দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আইন অলঙ্কারশাস্ত্রের ওপর প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা করতেন এবং অন্য শিক্ষকেরা শেখাতেন অন্য বিষয়।' হযরত মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন। এই শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন দুই অর্থে : এক, গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটলের কথায়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনের প্রয়োজন এবং টিকে রয়েছে উন্নত জীবনের লক্ষ্যে। রাসূলুল্লাহ [সা] উন্নত জীবনকে যে আলোকে দেখেছেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে সেই নিরিখে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সুস্থ দেহে বিশুদ্ধ মনের বিকাশ ঘটাতে এবং শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের জন্য নয়, আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রস্ফুটিত করতে এবং শুধু ইহলৌকিক নয়, পারলৌকিক জীবনেরও সৌষ্ঠব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করেন যাতে কেবল ব্যক্তিজীবন নয়, সামাজিক জীবনও উন্নততর হতে পারে। এদিক থেকে বলা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। দুই, এই শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু শুধু মুসলমানদের জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়নি, এর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি ছিল সমগ্র উম্মাহর জন্য এবং মদিনা সনদের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বনু আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য যে অন্যায় বা অপরাধ করবে, সে নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিই করবে। [এই নিবন্ধে মদিনা সনদের বঙ্গানুবাদ গৃহীত হয়েছে আব্দুল ওয়াহিদ রচিত একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মদিনা সনদের গুরুত্ব প্রবন্ধ থেকে, আলোর মিছিল, ১৯৯৯, ২২-৪৫ পৃষ্ঠা] মদিনা রাষ্ট্রের উম্মাহ শুধু মুসলমানদের নয়, নয় কুরাইশদের অথবা মুহাজির ও আনসারদের। এই উম্মাহ সকলের। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সকলেই কৃতসঙ্কল্প।

ইসলামের মৌল ভিত্তি যে একত্ববাদ তা যেমন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে, সেই ঐক্যানুভূতির প্রতিকৃতিও রূপ পেয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

সৃষ্টি মানবের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্রে বিশ্বময় আজ যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে তথ্য প্রবাহের অবাধ গতির প্রেক্ষাপটে, গণতান্ত্রিকতার বৈপ-বিক সম্প্রসারণের এ কালে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা প্রতিফলন দেখা যায় বটে কিন্তু তা আংশিক। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আইন-চিকিৎসা, অর্থনীতি, পরিকল্পনা, যুক্তিবিদ্যা-প্রকৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গতিশীল হলেও ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এখনো অপরিণত ও অপূর্ণ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর শিক্ষা এ ক্ষেত্রে এখানো পথিকৃৎ, এখনো দিশারিতুল্য, উজ্জ্বল দীপশিখার মতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ক্ষেত্রকে নৈতিকতার আবরণমুক্ত করে অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠী যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা যে কোনো মুহূর্তে সমগ্র মানবসমাজকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তখন কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর শিক্ষাব্যবস্থাই হতে পারে একমাত্র উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। ■

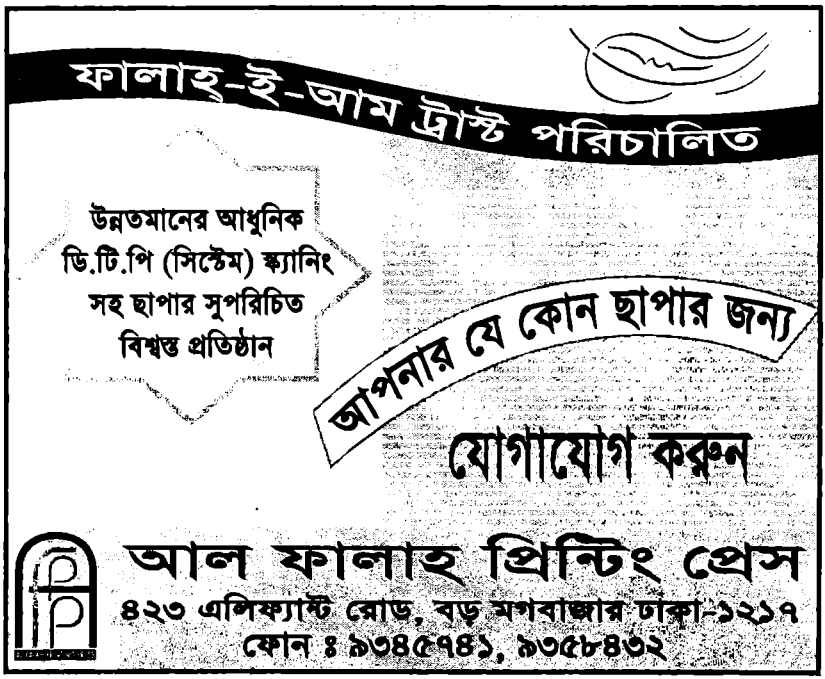

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

সৈয়দ আশরাফ আলী

মানবজাতির ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের, তথা সৃষ্টির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দিবস ১২ রবিউল আউয়াল। কোনো মুসলমান, কোনো মানুষ এ পবিত্র দিবসটিকে ভুলতে পারে না। অগ্রাহ্য করতে পারে না। এই সেই অনন্য সাধারণ, পুণ্যময় দিবস যেদিন আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন করুণায় ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হজরত মুহাম্মদ [সা]।

বিশাল মহাসাগরের মতো অতলান্ত তাঁর সুবিসৃত মহান জীবন। সে রত্নগর্ভ মহাসাগরের রোমন্ন মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, অভিজ্ঞতা ছিল সুবিসৃত ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম। রূপকথার মতো স্নিগ্ধ ও চমকপ্রদ, প্রজাপতির পাখার মতো বর্ণাঢ্য ছিল তাঁর বৈচিত্র্য-বিধৃত জীবন। বহু বর্ণ বিভূষিত তাঁর স্বপ্নিল জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন ঘটেছিল। এ সব ঘটনায় তাঁর ঔদার্য ও মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা, মনীষা ও তেজস্বিতা প্রকাশমান। স্বভাবতই বিশ্ব মনীষায় তাঁর অবস্থান অতি ঊর্ধ্বে। শীর্ষদেশে।

www.pathagar.com

মহৎ মানুষের মহিমা ও মাহাত্ম্যের রূপ-কল্প বিধৃত করতে মনীষী এমারসন একটি চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার ভাষায়–'জগৎবাসীর মত অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ এবং নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস করাও সহজ। কিন্তু তিনিই মহৎ ব্যক্তি যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন।'

সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মদ [সা] সেই অসাধারণ গুণাবলিরই অধিকারী, যার মধ্যে সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসের আলোকে তাই তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান, কর্মতৎপর, দূরদ্রষ্টা সত্যসন্ধ মহাপুরুষ হিসাবে নন্দিত। মানব-সমাজের জীর্ণ, ঘুণে ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রের। তাই তিনি অমতি তেজধারী বিরল ব্যক্তিত্বরূপে সমাদৃত।শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। হৃদয়-গভীরে বরণীয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতো নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছে যে, 'জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনিই [হজরত মুহাম্মদ সা] হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সফলকাম।'

কিন্তু বিশ্ব মনীষায় ইসলামের নবী [সা]–এর গৌরবমতি অবস্থানের স্বীকৃতি সঠিক অর্থে প্রথম প্রদান করেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। যখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'মুহাম্মদের ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।' নবী করিম [সা]–এর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভায় আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়ে তিনি এ মর্মে আশাও প্রকাশ করেন যে, 'আমি আশা করি, সে সময় খুব দূরে নয় যখন সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ একমাত্র সত্য ও যে নীতিসমূহই মানবকে স্বস্তির পথে পরিচালিত করতে পারে সেসব নীতির ওপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।'

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বও যাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও আদর্শে আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়, ইতিহাসে সে মহাপুরুষের অবস্থান যে কত গৌরবদীপ্ত তা বোধ হয় কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্ব মনীষায় প্রিয়নবী [সা]–এর সুষমা-স্নিগ্ধ, গৌরবমন্ডিত অবস্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লে ষণ সংবলিত আরো একটি বলিষ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় মনীষী টমাস কার্লাইলের কণ্ঠে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে এডনিবার্গে আয়োজিত একটি সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বা নবীদের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও 'নায়ক'-এর স্থান অধিকার করে রয়েছে সুদূর আরবের উষ্ট্রচালক হজরত মুহাম্মদ [সা]। শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি নবী করিম [সা] কেই সব নবী ও রসূলগণের মধ্যে ঐপড়স বা নায়ক হিসাবে পরিচিহ্নিত করেন। তার প্রাঞ্জল অনুপম ভাষায় :

'জগতের আদিকাল থেকে এ আরবজাতি মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষপালকের জাতি হিসাবে। তারপর তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে

www.pathagar.com

এমন একটি বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর পয়গম্বর প্রেরিত হলেন, আর অমনি ম্যাজিকের মতো সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল জগদ্বিখ্যাত, দ্বীনহীন জাতি হয়ে উঠল জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা থেকে পূর্বে দিল্লি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলো আরবের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর এক সুবৃহৎ অংশের ওপর আরব দেশ মহাসমারোহ ও বিক্রমের সাথে তার দ্যুতি ছড়িয়েছে।'

রাসূল [সা]-এর সুবিসৃত, মহিমাময় ও সুদূরপ্রসারী মনীষার বর্ণনা-বিশে-ষণ মহাসাগর মননের মতোই কষ্টসাধ্য ও দুরূহ। অতলান্ত মহাসাগরের মতো বিশাল, রত্নগর্ভ ও জ্ঞান-উদ্বেল ছিল তাঁর প্রতিভাদীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন। মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণা। চিন্তা-চেতনার প্রতিটি শাখা-পল্লবে ছিল তাঁর সুমহান, শুভ্র-সমুজ্জ্বল মনীষার প্রকাশ। এ কথা আদৌ অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি হবে না যে, মানবজীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে এমন কোনো বিভাগ বা শাখা নেই যেখানে খাইরুল খালায়িকি আফজালুল বাশার-এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

পার্থিব অর্থে তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'উম্মী' নবী ছিলেন জ্ঞানের আধার। শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে। ফলে শুধু জ্ঞানী হিসাবেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিদ্রেযোৎসাহী ব্যক্তি হিসাবেও তিনি পরিচিহ্নিত। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন : 'প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ। অবশ্যপালনীয়।' আর তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে সেই দু:সাহসিক ঘোষণা প্রদানের : 'জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত মসী শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।' ফলে পবিত্র কুরআনের শাশ্বত নির্দেশ ও নবী করিম [সা]–এর অনুপম সুন্নাহর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন হয়েছে আরব তথা মুসলিম জাতি। সৃষ্টিকর্তার কাছে ঐকান্তিক আবেদন পেশ করেছেন : 'রাব্বি জিদনি ইলমা।' হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো, যাতে আমি তোমাকে সঠিকভাবে জানতে পারি। তোমার সর্ববিসৃত জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব যেন সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারি। রাসূল [সা]–এর উম্মতেরা জানতে চায় সর্বত্র বিরাজমান সেই মহান অস্তিত্বকে যা, ইবনে রুশদ-এর ভাষায়, সুপ্ত থাকে পাথরের বুকে, স্বপ্ন দেখে জীবজনের মধ্যে, জেগে ওঠে মানুষের মাধ্যমে।

বিদ্রোযাৎসাহী নবী [সা]–এর নির্দেশেনুক্রমে তাঁর উম্মতেরা জ্ঞানার্জন নিমত্তি ছুটে গেছে শুধু চীনেই নয়, সেই সাথে ভারত, মিসরসহ দূর-দূরান্তের। জন্ম নিয়েছে সত্যিকার অর্থে 'আধুনিক' বিজ্ঞান, যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় রবার্ট ব্রিফো ও পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর অমর উক্তি থেকে। ব্রিফোর ভাষায় : 'আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কার বা যুগান্তকারী তত্ত্বকথার জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়, আধুনিক বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের নিকট চিরঋণী।'

'প্রাচীনকালে মিসর, চীন বা ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কোনো নিদর্শন আমরা পাই না। প্রাচীন গ্রিসে এর ছিটেফোঁটা দেখতে পাওয়া যায়। রোমেও এটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু আরবদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল। সুতরাং তাদেরকেই আধুনিক

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের জনকরূপে পরিচিহ্নিত করা যায়।' শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়। সৃষ্টিকর্তার সাশ্রয়ে লালিত 'উম্মী' নবীর মনীষা উজ্জীবিত করেছে এক নিষক্রিয়, ঘুমন্ত জাতিকে। জন্ম দিয়েছে এক নায়ক গোষ্ঠীকে, যারা আলোড়িত করেছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চকে। ফিলিপ কে. হিট্টির ভাষায় : নবীর [সা] মৃত্যুর পর স্থবির আরব যেন এক ম্যাজিকবেল মহাবীরদের এমন এক শিশুশালায় পরিণত হয় সংখ্যায় ও মানে যার তুলনা পাওয়া দুষ্কর।'

প্রিয়নবীর মনীষা, তাঁর বর্ণিল জীবনের অসাধারণ ঘটনাবলি শুধু মুসলমানদেরই নয়, অমুসলিমদেরও বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশী ও বিদেশী, মুসলিম ও অমুসলিম সাহিত্যের ওপরও তাঁর প্রভাব বিকাশমান। ইতালীয় সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে পরিচিত মনীষী দান্তেকেও প্রিয়নবীর মনীষা ও প্রজ্ঞা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করেছে। পবিত্র 'মিরাজ'-এর নজিরবিহীন ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর অমর মহাকাব্য 'ডিভাইনা কমেডিয়া'। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিগুয়েল আসিন বিরচিত ওঢ়লথশ গ্রেন এ সত্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ বিধৃত রয়েছে। বিশ্ব মনীষায় নারী জাতির অবদান অনস্বীকার্য। নজরুলের ভাষায় : 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

নারীমুক্তির প্রবক্তা হিসাবে আমরা কেট মিলে, জার্মেন গ্রিয়ার বা অ্যানি নূরাকিনের নাম উচ্চারণ করি, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মেরি উলস্টন, অ্যানি বেসান্ত, মেরি প্যাঙ্কহার্স্ট, মারগারেট সাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস নারীর মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, মানব জীবনে নারীর অধিকার পূর্ণভাবে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি একজন পুরুষ- আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা [সা]। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহাপুরুষ যিনি স্ত্রীজাতিকে বস্তুপক্ষে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন। মনীষী পিয়েখ ক্রাবাইটের ভাষায়, 'মুহাম্মদ [সা] সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে নারী-অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন।'

এ কথা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধু নারী জাগরণের ক্ষেত্রের তাঁর অবদানই বিশ্ব মনীষায় প্রিয়নবী [সা]-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।

একজন ন্যায়নিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক হিসাবেও নবী করিম [সা] বিশ্ব মনীষায় গৌরবময় আসনের দাবিদার। বিচারের ক্ষেত্রের যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার স্বাক্ষর তিনি রাখেন তা মুসলিম ও অমুসলিম সর্বমহলেই নন্দিত। তাঁর নির্দেশালোকে প্রণীত মুসলিম আইন বিংশ শতাব্দীতেও সর্বজনের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করে। ওয়ারেন হেস্টিংসের ঐতিহাসিক 'ইমপিচমেন্টের' ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক যে আইনশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন তা হচ্ছে মুসলিম

www.pathagar.com

আইন। বার্কের অনুপম ভাষায় : 'মুসলিম আইন মুকুটধারী সম্রাট হইতে সামান্যতম প্রজা পর্যন্ত সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এটা এমন একটি আইন যা জগতের সর্বোত্তম জ্ঞানানুমোদিত, পান্ডিত্যপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট আইনশাস্ত্রের সহতি ওতপ্রতভাবে জড়িত।'

ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ- উভয় অঙ্গনেই তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। স্বভাবতই সে নির্মল, কান্তিময় প্রভাব অনুপ্রাণিত করেছে দেশ ও বিদেশের মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীবৃন্দকে। ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল আচরণ, ক্রীতদাসদের মুক্তি প্রদানে তাঁর সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও মমত্ববময় নির্দেশাদি অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে আব্রাহাম লিঙ্কনকে ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্তকরণে। ইতিহাসে যে দাবি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে স্পার্টাকাস মাধ্যমে, তাই পূর্ণতা লাভ করে প্রিয়নবী অনুপম আদর্শের স্পর্শে, প্রতিফলিত হয় আব্রাহাম লিঙ্কনের যুগান্তকারী সফল সংগ্রামে।

শুধুমাত্র নির্যাতিত, শৃঙ্খলিত মানুষের দু:খ মোচনে নয়, পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ারের কষ্ট লাঘবে প্রিয়নবী [সা]-এর সহানুভূতিশীল, মমত্বময় আচার-আচরণও সর্বমহলকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। পশু-পক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষরাজি যে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ- এ চিন্তা- চেতনার পথিকৃৎ হচ্ছেন ইসলামের নবী [সা]। জীবজন্তর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করার, বৃক্ষরাজিকে অহেতুক নিধন করে প্রকৃতির ভারসাম্যতা রক্ষা করার নিমত্তি পৃথিবীর ইতিহাসে সার্থক ও সফলভাবে তিনিই প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যদিও বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিষ্ট, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব 'জীবে দয়া' করার প্রেরণা জুগিয়েছেন। প্রিয়নবী [সা]-এর বাস্তবানুগ, বিজ্ঞানসম্মত জীব-প্রেমই জন্ম দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর বহুল আলোচিত বাস্তববিদ্যায় বা ঊধসলসবী ।

এ কথা উল্লেখ করা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইউরোপীয় মনীষার উত্তরণেও প্রিয়নবী [সা]-এর আদর্শের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। জন উইলিয়াম ড্রেপার নি:সঙ্কোচে স্বীকার করেছেন যে, 'রেনেসাঁর জন্ম হয়েছে ইসলামের দরুন।'

বস্তু বিশ্ব মনীষার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌকর্য সাধনে মহানবী [সা]-এর অবদান অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিনের অমর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয় ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুন:সংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা- এই দেখো মুহাম্মদ! যে সব মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রত্যেকটির আলোকে তাঁকে বিবেচনা করা হলে, আমরা এ কথা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোনো মানব কি তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর ছিল?' স্বভাবতই, বিশ্ব মনীষায় শীর্ষতম শিখরে ইসলামের নবী [সা]-এর অবস্থানের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক মাইকেল হার্টও তার 'দি হানড্রেড' গ্রেন দ্বিধাহীনচিত্তে উল্লেখ করেছেন : কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় পর্যায়ে চরমভাবে সফলকাম ছিলেন। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন সংমিশ্রণই তাঁকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিহ্নিত করে। ■

www.pathagar.com

রাসূলূল্লাহর [সা] যুদ্ধনীতি

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

ইসলাম অর্থ শান্তি। আরবি 'সালাম' অর্থাৎ শান্তি শব্দ থেকে ইসলাম শব্দটি উদ্ভূত। ইসলামের অন্য অর্থ- আল্লাহর নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। মূলত উভয় শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য অভিন্ন। কারণ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নির্দেশ মতো জীবন পরিচালনা করলে শান্তি লাভ করা সম্ভব। আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীগণ দুনিয়ায় অন্যায়-অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। ফলে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অতএব, জীবনে তথা মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দুনিয়ায় কোনো কিছুই এমনি এমনি অর্জিত হয় না। কোন কিছু অর্জনের জন্য যেমন সাধনা দরকার, ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন, তেমনি দৃঢ়চিত্তে তা অর্জনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য। দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও তেমনি অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দুনিয়ায় যারা জুলুম-অন্যায় করে, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করে, তাদের প্রতিহত করা এবং প্রয়োজনে তাদেরকে বল প্রয়োগে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবে কারো কাম্য নয়। মহান স্রষ্টা অসংখ্য গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করে তা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

করছেন। সব কিছুকে তিনি একটি প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সকলে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় স্রষ্টার সে নিয়ম মেনে চলছে। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটলে সৃষ্টিজগতে বিশৃঙ্খলা ঘটতে বাধ্য এবং তার ফলে মুহূর্তেই সৃষ্টিজগতে মহাপ্রলয় ঘটে যেতে পারে। মহাসৃষ্টির একটি ক্ষুদ্র গ্রহ হলো আমাদের এ পৃথিবী। এ পৃথিবীতে অসংখ্য সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে মানুষ অন্যতম মাখলুক বা আল্লাহর সৃষ্টজীব। অন্য সব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম তৈরি করেছেন, মানুষের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে তেমনি একটি নিয়ম বা নীতিমালা তৈরি করে দেয়া হয়েছে। এক কথায় এ নীতিমালার নাম ইসলাম। তবে অন্যসব সৃষ্টির জন্য যে প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে, তারা ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তা মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মানবজাতির জন্য যে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে, মানুষ ইচ্ছা করলে তা মেনে চলে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তার জীবনকে সফল ও সুন্দর করে তুলতে পারে। তবে মানুষকে আল্লাহপ্রদত্ত এ নীতিমালা অমান্য করে তার নিজের খেয়ালখুশি মোতাবেক চলার অধিকারও দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের পরিণাম কী হবে এবং অবাধ্যদের পরিণতি কী হবে মহান স্রষ্টা তাও সুস্পষ্টভাবে তাঁর ঐশী কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীতে রাত-দিন, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি দিক বা বিষয় রয়েছে। এর কোন্‌টি শ্রেয় আর কোনটি শ্রেয় নয়, তা সহজেই বোধগম্য। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম অনুসরণের মাধ্যমে শ্রেয় বিষয়গুলো আয়ত্ত হয় আর ইসলাম বর্জনের ফলে অশ্রেয় বিষয়গুলো বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ায়। মহান স্রষ্টা যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছু এককভাবে যাঁর করায়ত্ত, তিনিই জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটি ভালো বা কল্যাণকর। সেভাবেই তিনি মানবজাতির জন্য এক নির্ভুল, নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর নীতিমালা দিয়েছেন, যা যথাযথ অনুসরণ করলে জীবনে সাফল্য অনিবার্য এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা-কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর ইসলাম অনুসরণ না করলে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ ও অকল্যাণকর। তাই মানবসমাজে শান্তি শৃঙ্খলা-কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এ জন্য আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সচেতনভাবে সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ইসলামকে ধারণ ও তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এটা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় জিহাদ। আল্লাহতায়ালা তাই ঈমানের পরই জিহাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত হলো–

"যাঁরা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।" [সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৮]

"তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৪]

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না [অর্থাৎ পরীক্ষা করা হয়নি]।" [সূরা আল ইমরান, আয়াত :১৪২]

এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯]

"যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।" [সূরা তওবা, আয়াত : ২০]

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান না তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা তওবা, আয়াত : ২৪]

সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে তাদের পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে মহাপুরস্কার দান করবো। [সূরা নিসা, আয়াত : ৭৪]

যারা আমার [আল্লাহ] উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সঙ্গে থাকেন। [সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯]

আল কুরআন থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, জিহাদ হলো এক নিরন্তর প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের নাম। নিজেকে সংশোধন করা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলানোর নাম জিহাদ। এ জিহাদেরই একটি বিশেষ দিক হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা অনুসৃত হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে সাধারণত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিগত স্বার্থ, লোভ-প্রলোভন, হিংসা-বিদ্বেষ ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ধরনের যুদ্ধে সর্বদাই ধ্বংস, হত্যা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, আধিপত্য বিস্তার অথবা পার্থিব কোনো কিছু অর্জনের জন্য সংঘটিত হয় না। মানব সমাজে বা পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা, সত্য-ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কেবল জিহাদ বা যুদ্ধ করা ইসলাম সমর্থন করে বা অপরিহার্য গণ্য করে। ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র অপশক্তির হাত থেকে মানুষ বা সমাজকে নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ [সা] আল্লাহর নির্দেশে

www.pathagar.com

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করার জন্য মহান স্রষ্টা তাঁকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ নির্দেশনার বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে পৃথিবীতে যুদ্ধের উন্নত মহান নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছেন, যা সর্বকালের কল্যাণব্রতী মানুষের জন্য একান্ত অনুসরণীয়।

মক্কায় ইসলাম গ্রহণের পর সেখানকার কাফিরগণ মুসলমানদের ওপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালায়। কিন্তু মুসলমানদেরকে তখন প্রতিরোধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আকাবার বাইয়াতের পরই আল্লাহর তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রথম অনুমতি আসে এবং হিজরতের পরে মদিনায় ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই তা কার্যকরী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা–

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। [অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যারা সচেষ্ট]। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ার। [সূরা হজ, আয়াত ৩৯-৪১]

ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে আরো কতিপয় আয়াতের অর্থ হলো–

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না। [সূরা বাকারা আয়াত : ১৯০]

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদেরকে ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না। [অর্থাৎ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্‌ণ, সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্ম-যাজক প্রমুখ যারা যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধে সহায়তা করতে অক্ষম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি]। [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৩]

পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে সবই মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার, অর্থসম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নারীলিপ্সার কারণে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের ক্ষুদ্র ও জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় না। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায় যে, কেবলমাত্র আক্রান্ত হলে বা জালেমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং অন্যায়-অসত্যকে প্রতিহত করে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত বা আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনকে কায়েম করা বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই শুধু যুদ্ধ করা সঙ্গত। আবার এরূপ যুদ্ধেও সীমালংঘন বা নীতিজ্ঞানবর্জিত হওয়া সঙ্গত নয়। অন্যায়-অসত্য বা জুলুম-নির্যাতনকে প্রতিহত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু শক্তি প্রয়োগই বিধেয়, তার অতিরিক্ত নয়। ইসলামের যুদ্ধ শুধুমাত্র অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ, জুলুম-নির্যাতন বন্ধ, মানবিক বিপর্যয় রোধ, অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তথা সার্বিক মানবিক কল্যাণে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই ইসলামের যুদ্ধ হত্যা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে না, বরং সমাজের নিরাপত্তা বিধানের অপরিহার্য তাগিদেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ [সা] দুনিয়ায় প্রচলিত যুদ্ধ সম্পর্কে যে ধারণা, নীতি-পদ্ধতি ও যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তা সম্পূর্ণ বদলে দিতে সক্ষম হন। প্রচলিত যুদ্ধের লক্ষ্য হলো– ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো জাতির স্বার্থ চরিতার্থকরণ, দম্ভ-অহমিকা ও শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং বলপ্রয়োগে রাজ্য দখল বা অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার। এ লক্ষ্য অর্জনে নির্বিচার হত্যা, রক্তপাত, ধ্বংস, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ নানা মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। এ ধরনের যুদ্ধে বিভিন্ন জনপদ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়, ইতিহাসে পাশবিক বর্বরতার নিষ্ঠুরতম চিহ্ন অবলোকন করে মানবজাতি যুগ যুগ ধরে শঙ্কিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্য দিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ [সা] যে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তা মানবজাতির জন্য চির অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ। এর লক্ষ্য ব্যক্তি-গোষ্ঠী-জাতির স্বার্থ-দম্ভ-অহমিকা ও বর্বর শক্তি প্রদর্শন নয়, জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে কাউকে পদানত, পরাভূত ও অধীনস্থ করা নয়। এ যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য স্রষ্টার প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়-দুর্নীতি, জুলুম-নির্যাতন, অসত্য-অবিচার ও মানবতাবিরোধী সব কিছুর মূলোৎপাটন করে সুখী-সুন্দর-কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে অতি স্বল্প ক্ষতির বিনিময়ে সর্বোত্তম সুফল অর্জন। এটাকে নিতান্ত যৌক্তিক বলা যায়। সাধারণত সমাজে যখন কেউ খুনখারাবি, চুরি-ডাকাতি, জুলুম-নির্যাতন বা অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তখন সমাজের প্রচলিত আইনে তা প্রতিষেধকের উপায় হিসেবে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। এ শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। তাই এটাকে যৌক্তিক ও কাম্য বলেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করাকে যারা নিষ্ঠুরতা বা বর্বরতা মনে করেন তারা প্রকারান্তরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেন। এটাকে কখনও সুবিবেচনাপ্রসূত মনে করা যায় না।

রাসূলুল্লাহর [সা] যুদ্ধনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যূনতম ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে মানবসমাজকে নিরাপদ করা। কোনোরূপ ধ্বংস বা অশান্তি সৃষ্টি করা কখনই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম যুদ্ধকে কখনো উৎসাহিত করে না, যুদ্ধ অপরিহার্য হলে কেবল তখনই রাসূলুল্লাহ [সা] যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এবং সে ক্ষেত্রেও আল্লাহর সুনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ [সা] প্রদর্শিত যুদ্ধনীতি অনুসরণ করার মধ্যেই মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত এবং বর্তমান অশান্তি ও বিভীষিকাপূর্ণ এ পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব। সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহর [সা] যুদ্ধনীতির কয়েকটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা হলো–

কেবলমাত্র আক্রান্ত হওয়ার পর আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা জায়েজ।

সমাজের ফিত্না দূর করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ।

যুদ্ধে একমাত্র শত্রুপক্ষের অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা জায়েজ।

নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ণ, সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক বা পুরোহিত এবং নিরীহ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা তাদের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন সম্পূর্ণ অবৈধ।

শত্রু-পক্ষের বাড়ি-ঘর, ফসল, গবাদিপশু ইত্যাদি ধ্বংস করা অবৈধ।

যুদ্ধাহত কোনো ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া নিষেধ।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ করা বিধেয়। কোনো অবস্থাতেই তাদের ওপর নির্যাতন করা বৈধ নয়।

যুদ্ধবন্দী নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন বা কোনোরূপ জুলুম করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে মদিনার রক্ষাব্যূহ নির্মাণে, অভিনব রণকৌশল অবলম্বনে, সৈন্য পরিচালনা, সমরকৌশল বিনির্মাণে ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতা এবং নৈপুণ্য ছিল অতিশয় বিস্ময়কর। এ ছাড়া যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শত্রুর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে মহানবী [সা] সে ক্ষেত্রেও এক অনুসরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি জীবনে মোট সাতাইশটি যুদ্ধ পরিচালনা এবং ষাটটি সমরাভিযানের আয়োজন করেন। সাধারণত বিধর্মীদের সরাসরি আক্রমণের মোকাবেলায় এ সাতাইশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামরিক অভিযানগুলো প্রেরিত হয় প্রধানত মদিনার নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ইসলাম প্রচার নির্বিঘ্নে পরিচালনার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ [সা] যখন খবর পেয়েছেন যে, কোন গোত্র বা অঞ্চলের লোকেরা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের সমরায়োজন ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করেন। সমরকৌশলের এটা এক অতি কার্যকর দিক। শত্রুপক্ষকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনা পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। তাই তাদের আগ্রাসী তৎপরতা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়ায় ব্যাপক যুদ্ধ এবং ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব হয়। এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুবাল্লিগ বা রাসূলের দূতকে অন্যায় অথবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়, কখনো বা বন্দী বা নিপীড়ন করা হয়। এমতাবস্থায় সমরাভিযান প্রেরণ করে বিরুদ্ধ-শক্তিকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ [সা] যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে মানবিক আচরণ করেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে তা এক অতুলনীয় আদর্শ হয়ে আছে। ■

www.pathagar.com

ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা

ড. মাহফুজ পারভেজ

এক.

প্রতিরক্ষা একটি জটিল এবং অনালোচিত বা অল্প আলোচিত ধারণা। সামরিকবিজ্ঞান, রাজনীতিবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, স্ট্রাটেজি, ভূ-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় চর্চা করা হয়।

প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার আড়ালে প্রায় সময়ই প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গটি চাপা থাকে; এ প্রসঙ্গে খোলামেলা আলোচনা বলতে গেলে হয়-ই না। এটা সত্যি যে, প্রতিরক্ষার মূল কৌশল ও পরিকল্পনা সাধারণ্যে আলোচনার বিষয়ও নয়; এতে করে শত্রু পক্ষের কাছে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও এ সংক্রান্ত পুরো ব্যবস্থাটি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এবং এটা কোনোভাবে কাম্যও নয়।

কিন্তু একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা নীতি ও ধারণা মানুষের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে থাকা অপরিহার্য। জানা থাকা দরকার, কে বা কারা

www.pathagar.com

আমাদের শত্রু, কোন কোন দিক থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যাহত হতে পারে, কিভাবে প্রতিরক্ষা নিরঙ্কুশ রাখা যায় ইত্যাদি বিষয়াবলি। কারণ যে মানুষ যে মানুষ ও তার ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি- ঐতিহ্য-নিরাপত্তা এবং মানুষের রাষ্ট্রটির জন্য প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার এত আয়োজন, সে রাষ্ট্রের মানুষই যদি স্বীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অধিকারী না হয়, তাহলে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও এর শক্তি বহুলাংশে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। মূলত রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা মানে সেই রাষ্ট্রের মানুষেরও প্রতিরক্ষা আর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য মানে রাষ্ট্রের মানুষের সম্মিলিত চেতনা এবং এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বস্তুগত আয়োজন। ফলে প্রতিরক্ষার জন্য বস্তুগত-উপাদানগত আয়োজন যেমন জরুরি, তেমনিভবে নাগরিকদের মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একীভূত ও পরিচ্ছন্ন চেতনাগত ধারণা থাকাও অপরিহার্য। এই দুই-এর সুসমন্বয় হলেই একটি রাষ্ট্র অভেদ্য প্রতিররোধব্যবস্থার অধিকারী হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম জীবনের সকল বিষয়ের মতো প্রতিরক্ষা বিষয়েও সুস্পষ্ট বিধানাবলি এবং ধারণা দিয়েছে। সে প্রমাণ করেছে, ইলামের প্রতিরক্ষা ধারণা এতই উন্নতর ও অগ্রসর যে তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় সকল পরাশক্তি ইসলামের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং এরই ভিত্তিতে ইসলাম তার আদর্শগত, রাষ্ট্রীয় এবং মানুষের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন রাখতেও সচেষ্ট হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ মানুষ যেহেতু মুসলিম, তাই এ দেশের মানুষের সকল চেতনার মত প্রতিরক্ষা চেতনা ও ধারণাতেও ইসলামের অনুভূতি থাকা অপরিহার্য এবং এভাবেই ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিরক্ষা নিরাপত্তার চিন্তাকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকেও মজবুত করতে সক্ষম হতে পারে। সোজা কথায়, আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মজবুতের জন্য ইসলাম একটি প্রধান উপাদানস্বরূপ। সন্দেহে নেই, উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিরক্ষা চেতনা গাছ-নদী-মা-মাটি প্রকৃতিকে সামনে রেখে একটি আবেগী উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু ইসলাম প্রতিরক্ষা চেতনার মাধ্যমে এমন একটি যৌক্তিক উপসংহারে মানুষকে পৌঁছাতে পারে বলেই সে তার মানবমণ্ডলীকে একটি অপরাজেয় শক্তিতে দেখতে পায়। ইসলামী প্রতিরক্ষা চেতনায় বলীয়ান জানবাজ জনগোষ্ঠী শত্রুপক্ষের কাছে যে ভয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের শক্তিতে পরিণত হয়, তাতে বিপুল পরাশক্তিও একে একে পরাজিত হয়েছে আর বিজয় চলে এসেছে অবধারিতভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের কাছেই। ইসলামের ইতিহাসেও সে সত্য দেদীপ্যমান; ইসলামের গৌরবময় জেহাদসমূহ সে সত্যের সাক্ষ্যবহ। আজকেও তাই, কেবল মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাছেই ইসলামের প্রতিরক্ষার ধারণা, এর ব্যবস্থাপনা ও কৌশল গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি নবাগত শক্তি হিসেবে এর অপ্রতিরোধ্য বিজয় ও অগ্রগতির বিষয়াবলি এখন পর্যন্ত গবেষণা, অধ্যয়ন অনুসরণের মাধ্যমে অনুসৃত হচ্ছে। ফলে প্রতিরক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ও

www.pathagar.com

নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমাদের মতো শত্রু পরিবেষ্টিত রাষ্ট্র অটল প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হতে পারে।

দুই.

বিশ্বে যারা শক্তিমান, কোনো যুদ্ধের সূচনা করে তারাই। যারা শক্তিহীন, তারা শক্তিমানের কাছে পরাভূত হয়। মানবেতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এটাই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তবে এর ভেতরেও ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। আর তা ঘটেছে মুসলিমগণের হাতে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মুসলিমগণই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে যে, শক্তি প্রদর্শন বা নিছক আত্মরক্ষার জন্য নয়, আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে হয়। এই যে বিশেষায়িত যুদ্ধ, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। প্রচলিত যুদ্ধ বলতে যা বোঝা যায়, জিহাদের সঙ্গে তার রয়েছে সুস্পষ্টরূপেই বিস্তর ফারাক। সাধারণ অর্থে যুদ্ধ ও জিহাদ বলতে সশস্ত্র সংগ্রাম বোঝালেও দুটোর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রয়েছে। যুদ্ধের মূলে রয়েছে পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্য দিকে, জিহাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বীন ও আত্মরক্ষার তাগিদ এবং অন্যায়ের প্রতিকারের মাধ্যমে ন্যায়, নিরাপত্তা, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রথাগত অর্থে, মুসলমানরা যুদ্ধ করে না, তারা জিহাদ করে। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণেই প্রচলিত সাধারণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য। একইভাবে প্রতিরক্ষার ধারণাগত দিক থেকেও গতানুগতিক আর ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রয়েছে অলঙ্ঘনীয় প্রভেদ। আজকের যুদ্ধবাজ পরাশক্তিসমূহের সামনে ইসলামের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও ধারণা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ, যার অনুসরণ তাদেরকে রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাভিত্তিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারে।

তিন.

ন্যায়-যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি যুগেই যুদ্ধবিগ্রহ কোনো না কোনো আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজমান ছিল। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমানকালে তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে একটি বিশ্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে হচ্ছে। বিশ্বায়ন নামের এহেন বন্ধনও বিশ্বকে যুদ্ধযুক্ত করতে পারেনি, বরং একটি যুদ্ধংদেহি পরাশক্তি জোটের লেলিহান বিপদের সম্মুখীন করেছে পৃথিবীর অপরাপর ক্ষুদ্র ও নিরীহ রাষ্ট্রসমূহকে। যুদ্ধের পেছনে খরচ হচ্ছে অপরিসীম অর্থ, যা মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানো হলে বিশ্ব ও মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতো। উদাহরণস্বরূপ, নৈতিক যুদ্ধ বা জিহাদ আর অনৈতিক যুদ্ধ বা আগ্রাসনের একটি পার্থক্যও এখানে লক্ষণীয়। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫ সালে যুদ্ধের পেছনে ব্যয় করেছে ৩২০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সালে সে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৭ ট্রিলিয়ন

www.pathagar.com

ডলারে। এর পর থেকে এই খরচের অঙ্ক প্রতি বছর ৫০% ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই বর্তমানে বিশ্ব ও মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত, সম্মানজনক, প্রীতিপূর্ণ এবং মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ, মৈত্রী ও ঐক্যের বাস্তবতাগত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদের শোষণমূলক মনোভাবের মাধ্যমে কতিপয় শক্তিশালী রাষ্ট্র যুদ্ধের ভয়াবহ ঘনঘটা গোটা মানবজাতির ওপর সততই সঞ্চরণশীল করে রেখেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অকল্পনীয় ধ্বংসের প্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশন্স জন্ম লাভ করে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায় ১৯৩৯ সালে জার্মানির ডিকটেটর হের হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার পর। গোটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিগর্ভে নিপতিত হলে লিগ অব নেশন্সের মৃতদেহের ওপর ভর করে যুদ্ধকালীন সময়েই জন্ম নিলো আজকের জাতিসংঘ। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য তা-ই যা ছিলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশন্সেব 'দুনিয়াকে যুদ্ধের ধ্বংস ও রক্তাক্ত হানাহানি থেকে বাঁচানো।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও কি যুদ্ধের স্থায়ী বিপদ কেটে গেছে? সাম্প্রতিক বিশ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস সে কথা বলে না। বরং একটি ক্ষুদ্র, শান্তি পূর্ণ, নিরীহ দেশকে যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি দেশ এমন একটি দেশের ওপর হামলা করে বসল যে আদৌ সে লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। কেউ আমেরিকাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু আমেরিকা বিশ্বের কমপক্ষে পঞ্চাশটি দেশে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এখনও একাধিক দেশে একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পদ ও খনিজসম্পদ লুণ্ঠন, প্রতিপক্ষীয় দর্শন ও আদর্শকে হত্যার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী মতলব বর্তমানে যার প্রধানতম শিকার মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ। ফলে কোনো নিরীহ, শান্তি পূর্ণ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে এবং যা বর্তমানে আকছার হচ্ছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই ক্ষুদ্র শান্তিপূর্ণ নিরীহ রাষ্ট্রটিকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতেই হবে; একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও কৌশল প্রণয়ন করে রাখতেই হবে। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ এবং প্রতিরক্ষা নীতিব্যবস্থা কৌশল প্রণয়ন করে রাখা এমন একটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং এই সঙ্গে একটি স্বাভাবিক অধিকার, যার সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি।

চার.

আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ, নিজেকে রক্ষার নীতিব্যবস্থা কৌশল প্রণয়ন, একটি বাস্তবসম্মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে নাগরিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যব্যবস্থা, সামগ্রিকভাবে যার নাম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, গ্রহণের ওপর ভিত্তি করেই আরবের একজন পিতৃমাতৃহীন যুবক, ইসলামের মহান প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, স্বীয় লক্ষ্যকে

www.pathagar.com

সামনে রেখে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রথম দিকে তাঁকে বিভিন্নমুখী বিপদ-আপদ ও ঝঞ্ঝা-মুসিবত মোকাবেলা করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নির্দেশে কৌশলগত কারণে স্বদেশ ছেড়ে অন্য স্থানে হিজরত বা স্থানান্তর করতে হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতিপথ তিনি কখনোই হারাননি। অবশেষে বিশ্ববাসী এ দৃশ্যও অবলোকন করলো যে, প্রতিটি আগ্রাসী আক্রমণকেই তিনি শুধু পরাজিত করেননি বরং অল্প দিন পরই সেই হিজরতকারী ব্যক্তিই বিজয়ীর বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং স্বীয় নীতিমালা বাধাহীনভাবে প্রচার করেছেন; সমগ্র জগৎকে শান্তি ও নিরাপত্তার মহামূল্যবান সম্পদে ভরপুর করেছেন।

এসব কিভাবে হলো?

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্য লাভের আসল কারণ কী ছিল–এই মৌলিক জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করা হলে ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে।

গভীরভাবে ইতিহাসের তথ্য উপাত্ত ঘেঁটে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র এবং আর্থিক দিক দুশমনের মোকাবেলায় কখনও কি এক- দশমাংশও ছিল?

এরপরও কি তিনি হতোদ্যম হয়েছিলেন কিংবা হিম্মত হারিয়েছিলেন? যদি তা না হয় তবে কেন তা হারাননি? এখানেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও কৌশল নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি টেকসই, কার্যকরী, মানবতাবাদী প্রতিরক্ষা ধারণা ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিবালোকের মতো প্রতিটি মুসলিমের সামনেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং কথিত যুদ্ধ, আগ্রাসন ও বর্বরতার নামে অকাতরে হত্যা, লুণ্ঠন আর বিপুল অর্থ অপচয়ের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মানবিক ও বস্তুগত দিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আজকের যুদ্ধবাজ বিশ্বের জন্য ইসলামী প্রতিরক্ষার ধারণা পরিত্রাণের প্রধান অবলম্বন। একই সঙ্গে বিপুল আগ্রাসী আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধবাজ ও তাদের বিপুল বিশাল রণসজ্জা ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে হিম্মত না হারিয়ে বিজয়ী হয়ে নিরাপদ থাকতে পারার মূলমন্ত্রও আমাদের জন্য নিহিত রয়েছে ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণায়। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ইসলামের প্রতিরক্ষাগত বিজয়ের আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা বেশি সৈন্য ও শক্তির সমাবেশ ঘটায়। সামগ্রিক জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানেরা আরবে বড়জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর কোনো তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলিমগণ অনাহারে মরছিল।

www.pathagar.com

কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রসমূহ। তদুপরি মুসলিমগণ একটি নতুন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে চেতনা মুসলিমদেরকে ক্রমাগত বিজয়ী করছিল, তাহলো চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রুদলও এটা অনুভব করতে পেরেছিল। কারণ শত্রুদল দেখতে পাচ্ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর নির্মল, নিষ্কলুষ চরিত্র, এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা, যা মানুষের দেহ অপেক্ষা হৃদয়কে পূর্বাহ্নেই জয় করে চলেছিল। একই সঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছিল যে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলিমদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল, শোষণমূলক ও নিপীড়নভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা কেবল যুদ্ধাবস্থাই নয়, শান্তির স্বাভাবিক সময়েও পরাজিত হতে বাধ্য হচ্ছিল। এখানেই নিহিত ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অপরাজেয় শক্তিমত্তা আর শ্রেষ্ঠত্ব।

পাঁচ.

প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তা হলো ইসলাম আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের ফলে মুসলিম ও ঈমানদারগণ এক দিকে হয়ে যান আর কাফের ও সত্যদ্রোহী দল অপর দিকে। মুসলিমদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য কিংবা কোনোও প্রকার আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। সবাই এক ও অভিন্ন, ভাই ভাই এবং সবাই বরাবর এভাবে সকলেরই লাভ ও ক্ষতি, নিরাপত্তা ও বিপদ একাকার হয়ে যায়। সকলের চিন্তা ও কর্মের নীতিপদ্ধতিও এক হয়ে যায়। ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হওয়ার ফলে তাদের ভেতর প্রবল শক্তির সঞ্চার হলো এবং এই সম্মিলিত মানবগোষ্ঠীর সামনে অপার সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হলো। রক্ত, গোত্র, সম্পর্ক, চিন্তা, কর্মের সকল যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম এবং কাফের-মুশরিক দু'টি পৃথক জাতিসত্তায় দাঁড়িয়ে গেলো। কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের সত্যপন্থী কথা ও কাজ মানতে পারে না, ন্যায়ানুগ আয়-উন্নতি বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রতিরক্ষার কাজে মুসলিমগণ যে তিনটি নেয়ামতের প্রয়োগ সশস্ত্র যুদ্ধের আগেই প্রয়োগ করে নিজেদের নিরাপত্তাকে মজবুত এবং শত্রুর ওপর নিজেদের প্রাধান্য পূর্বাহ্নেই নিরঙ্কুশ করতে সক্ষম হন। তাহলো :

ক) কুরআন–সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা পারলৌকিক জীবন ছাড়াও দুনিয়ার সকল সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নিয়ামক।

খ) ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য এবং

গ) জিহাদ যা শুধু যুদ্ধগত সশস্ত্র অর্থে নয় অন্তরের মুখের হাতের অস্ত্রের ধারাবাহিক ও সময়োপযোগী ব্যবহার।

www.pathagar.com

ছয়.

তিনটি নেয়ামতের বরকতে মদিনার ছোট রাষ্ট্রটি সকল দিক থেকে নিরাপদ, পরিপূর্ণ এবং সুসংহত হয়ে গেল। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। একই সাথে মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়িত রাখার পর জাতিসত্তাকে মুজাহিদ কওম বানাতে শুরু করেন। আর রাষ্ট্রকে চোখ কান খোলা একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত করেন, যারা নিজেরা যোগ্য, প্রশিক্ষিত এবং পারিপার্শ্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

উন্নত নীতিমালাশ্রিত রাষ্ট্রকাঠামোয় আরবরা পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং নৈতিক চরিত্রবান মানুষ থেকে আরও উন্নততর আল্লাহওয়ালা মানুষে পরিণত হতে লাগলেন। এ পর্যায়ে কুরআন তাদের জন্য যে সমরনীতি প্রণয়ন করেছে, মুসলিমগণ সর্বদা গর্বের সঙ্গে তা সভ্য দুনিয়ার কাছে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে প্রদর্শন করতে পারে। কারণ যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে ঐশী নির্দেশের অধীন, আর তা হলো সে সমস্ত লোকের যুদ্ধের অনুমতি, যাদের ওপর জুলুম অত্যাচার করা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ নিজেদের হেফাজত এবং জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ ও অবসানের জন্য করো, যাতে যালিমের জুলুম বৃদ্ধি পেতে না পারে এবং অপর কোনো কওমকে জুলুমের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করে দিতে পারে। মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করা শুধু আত্মরক্ষা, জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য সমীচীন বলে অভিহিত করা হয়েছে ঐশী বিধানে।

কিন্তু কী মহানুভবতার সঙ্গে এ-ও নির্দেশ এসেছে যে, অপরাপর ধর্মের উপাসনালয় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এমনিভাবে অন্য ধর্মের বুজুর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্যও তাগিদ এসেছে, যাতে মুজাহিদ বাহিনী জুলুম অবসানের জোশে সীমা অতিক্রম না করে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলির মূলভাবগুলো লক্ষণীয়।

মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামাল সম্পর্কেও সতর্কতামূলকভাবে বলা হয়েছে, "তোমাদের প্রবৃত্তির কোনো অধিকার সেখানে নেই।" আরও বলা হয়েছে, "এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, বাকি অংশ আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।"

যুদ্ধে সাহস ও মনোবল অটুট রাখার তাকিদ দেয়া হয়েছে। "যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলা করবে তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। যে কেউ লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তার ওপর আল্লাহর গজব পতিত হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

জুলুম প্রতিরোধ ও অবসানের লক্ষ্যে লড়াইকে অর্থাৎ জিহাদ করাকে 'জীবন' বলা হয়েছে এবং তার গুরুত্ব এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে : "হে মুমিনগণ, আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো, যে সময় তোমাদের সেই কর্মের দিকে আহ্বান করা হয় যার

www.pathagar.com

ভেতর রয়েছে তোমাদের জীবন।

বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে : "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে আল্লাহ পাক তোমাদের ফয়সালার বস্তু প্রদান করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি দূরীভূত করবেন আর দেবেন মাফ করে।"

জিহাদ কতদিন পর্যন্ত করা হবে, সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে : "আর তোমরা সেই সময়সীমা পর্যন্ত লড়তে থাকো যতদিন প্রাধান্য লুপ্ত না হয়, শিরক ও ফেতনা ফাসাদের এবং সমস্ত দীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।"

প্রতিরক্ষাব্যবস্থার নির্দেশনাস্বরূপ সূরা আনফালে পরিষ্কার আহকাম নাজিল হয়েছে। "আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মান্য করো, পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যাবে বিনষ্ট হয়ে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে, "শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য যথাসাধ্য সমরাস্ত্র ও সিপাহিসুলভ শক্তি সদাসর্বদা প্রস্তুত রেখো, যেন দুশমনের ওপর তোমাদের ভীতিকর প্রভাব কায়েম থাকে।"

জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল জুলুমের অবসান। এ ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গামবাহী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য আপাদমস্তক রহমতস্বরূপ। কুরআনুল কারিমের নির্দেশ : "যদি দুশমন সন্ধির প্রস্তাব করে তবে তোমরা তাতে সাড়া দেবে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা শক্তির মোহে সীমা অতিক্রম করো এবং দুশমনের আগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা সন্ধি স্থাপনে এগিয়ে না যাও।"

এগুলো কুরআনুল কারিমের সরাসরি ও প্রকাশ্য হুকুম-আহকাম। বস্তুত এটাই হল মূল বুনিয়াদ, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকনির্দেশ দেয় এবং এরই ভেতরে জায়েজ ও না-জায়েজ, নিষিদ্ধ ও উত্তমের সীমারেখা পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও অনিচ্ছা চর্চার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। খুলে দিয়েছে সকলের জন্য কল্যাণের পথ।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রতিরক্ষা নীতি ও বিধানের সঙ্গে মুজাহিদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিশ্বজয়ী অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেন এবং এভাবে এই নীতিমালা অনুসৃত প্রশিক্ষণই মুষ্টিমেয় মরুচারী মুসলিমকে এমনই শক্তি, একতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে যে, সমকালীন অপরাপর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ একজন মুজাহিদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগণিত দুশমনের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠিন ও বিজয়ী হয়ে দাঁড়ান।

যুদ্ধরত বাহিনীর জন্য সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জরুরি। এসব ছাড়া যুদ্ধের কল্পনা খুবই হাস্যকর। কিন্তু উত্তম কর্ম এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য ব্যতীত বিপুল সমরোপকরণের অধিকারও ফলপ্রসূ হয় না। যুদ্ধের এই নিয়ম-নীতি, বিশেষত আল্লাহর

www.pathagar.com

সাহায্যের খোশ-খবর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের যোগ্য কমান্ড, সত্যের পক্ষে উন্নত-মস্তক অবস্থান ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মূল ভিত্তি এবং এভাবেই ইসলাম নিজেকে নিরাপদ রেখেছে, দৃঢ় প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অধীনস্থ করেছে। আর বাতিলের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে। অতএব দুনিয়া এর বিস্ময়কর প্রদর্শনী দেখলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই দেখেনি বরং মুসলিমরা তাদের আসল ও মৌলিকত্বের দিকে যখনই প্রত্যাবর্তন করেছে এবং কিতাব ও সুন্নাহকে যখনই কর্মনির্দেশিকা বানিয়েছে, ফলাফল তখন এমনই বিস্ময়করভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে গিয়েছে।

সাত.

ইসলামের প্রতিরক্ষাধারণায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষাগত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কৌশল, তাঁর আওতায় পরিচালিত সমস্ত যুদ্ধ ও অভিযান ইত্যাদি সব কিছুই কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই নয়, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, সমরাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠক-গবেষক- বিশেষজ্ঞদের জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বর্তমানেও অনুসরণীয়।

* প্রতিরক্ষাপরিকল্পনা হবে সাদাদিধে কিন্তু পরিপূর্ণ। সাদাসিধে হওয়ার অর্থ হলো, এর ভেতর এমন সুযোগ রাখতে হবে যে, যুদ্ধে পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী যেন খুব সহজে উপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। কারণ কোনো বিশেষজ্ঞই আগাম ও সঠিকভাবে বলতে পারেন না যে, যুদ্ধের মধ্যে কখন কিরূপ অবস্থা হবে। ফলে নানা সম্ভাবনা ও আশঙ্কাকে সামনে রেখে এমন পরিকল্পনা করতে হবে, যাথে সেটাকে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী বা প্রতিপক্ষের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী অদল-বদল করা যায়। স্থবির ও অনড় যুদ্ধনীতির বদলে চলিষ্ণু ও পরিবর্তনযোগ্য যুদ্ধনীতি শ্রেয়।
* প্রতিরক্ষার মূল নীতি, অল্প, অপরিবর্তনীয় এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রণীত। তবে সেটা বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণগত ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে নানা পরিবর্তন হয় এবং এহেন পরিবর্তন হতেই থাকবে। সে কারণে প্রতিরক্ষাগত পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন ও গতিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুধাবনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের কাজে স্থায়ী, প্রশিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ জনশক্তির মাধ্যমে মানুষকে প্রতিরক্ষার গতি প্রকৃতিগত আপ-টু-ডেট ধারণা প্রদান ও সচেতন-সপ্রস্তুত রাখার কাজটি অব্যাহত রাখতে হবে।
* যুদ্ধের পক্ষ কোনো রাষ্ট্র বা একক শক্তি হতে পারে কিংবা একের অধিক রাষ্ট্র বা শক্তি মিলিত ফ্রন্ট বানিয়েও আসতে পারে। অতএব সব ধরনের বিবেচনা সামনে রাখা খুবই জরুরি।
* প্রতিরক্ষার বিষয়টি কেবল যুদ্ধের সময় নয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই তৈরি করে

www.pathagar.com

রাখা জরুরি এবং সেটা যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত হওয়া দরকার।

* প্রতিরক্ষার মূল বিষয় গোপন থাকা প্রয়োজন।
* প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলি মেধাগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
* প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্ব প্রকারের ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।
* প্রতিপক্ষের কৌশল সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব পূর্ব-জ্ঞান লাভ করা দরকার, যাতে তাদের চেয়ে অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষকে স্তম্ভিত ও অসহায় করে সহজ বিজয় অর্জন করা যায়। এ জন্য গুপ্ত সংবাদদাতা, গুপ্তচর, কমান্ডো ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।
* যোদ্ধা ও নাগরিকদের মনে ইচ্ছার দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, সাহসিকতা এবং নেতৃত্ব মান্য করার গুণাবলি সম্পন্ন করতে হবে। শত্রুকে ছোটজ্ঞান না করার পাশাপাশি নিজস্ব আস্থায় বলীয়ান হতে হবে। কোনোরূপ হীনম্মন্যতাকে স্থান দেয়া যাবে না।
* শারীরিক ও উপাদানগত প্রাধান্যের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* বিজয় কিংবা আত্মোৎসর্গের মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রাধান্যের সঙ্গে সামনে এগিয়ে দিয়ে এমন চেতনাই সকল চেতনার সামনে ইসলামকে বিজয়ী ও অপরাজেয় করেছে।
* প্রতিরক্ষার চূড়ান্ত সময়ে সিপাহি যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করেন আর জাতির প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে লড়ে যান। কেউ অস্ত্র চালান, কেউ কলম চালান, কেউ অর্থ-বিত্ত-মেহনত দিয়ে সহযোগিতা করেন। এভাবেই সকলে নানা ক্ষেত্রে থেকে ফরজ আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
* সকল পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীসহ নাগরিক সমাজের সকলের মধ্যে ইসলামের প্রতিরক্ষাগত প্রাথমিক ধারণা, সে ধারণার আলোকে স্ব স্ব শরিয়তি দায়িত্ব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষা কৌশল যুদ্ধনীতির পরিচ্ছন্ন বিবরণ ও জ্ঞান সঞ্চার করা একান্ত অপরিহার্য।
* এই বাস্তবতা ও বিশ্বাসকে স্মরণে রাখা দরকার যে, যদি কোনো জাতি প্রতিরক্ষাধারণা, ব্যবস্থাপনা ও কৌশল না বোঝে; সমরাস্ত্র, সমর শাস্ত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশ্বপরিস্থিতি, শত্রু-মিত্র চিহ্নিতকরণের জ্ঞানার্জন না করে; ঈমান, দেশপ্রেম, ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে না থাকে; জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটনের কাজে উৎসর্গীকৃত না হয়; জীবন ও মৃত্যুকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে না পারে তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে তারা কখনো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে না; শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে না বরং পদানত হয়।
* ইসলাম কখনোই পদানত হওয়ার শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় কল্যাণ, মানবতা,

www.pathagar.com

শোষণমুক্ত মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার পথে যে কোনো শত্রুপক্ষ ও বাধাকে পরাজিত করে বিজয়ী হতে। প্রতিরক্ষার জ্ঞানগত ধারণা ও প্রস্তুতি এমন বিজয়ের পথকে দেশ কালভেদে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের সামনে সহজ ও নিশ্চিত করে।

* ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মুসলিমের এ কথা মনে রাখা জরুরি যে নিজের দেশ ও নিজেকে রক্ষার জন্য, মজলুমের সাহায্যের জন্য, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তাগুতকে পরাজিত করে শান্তি নিরাপত্তা কল্যাণ প্রতিষ্ঠার্থে সামগ্রিক প্রতিরক্ষায় তার একটি নির্ধারিত ভূমিকা রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিকে জীবনের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে পালন করতে হবে এবং প্রতিক্ষার নীতি-কৌশল সম্পর্কে ইসলামের বিধানাবলি সম্পর্কে অভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমুক্ত স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।

আট.

ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করে সকল ঐতিহাসিকই বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমগণ পার্শ্ববর্তী উপজাতি ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে যেসব যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেগুলো ঘটেছিলো পৌত্তলিকদের আগ্রাসী ও নিষ্ঠুর শত্রুতার কারণে আর এ জন্যই দরকার হয়েছিল ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার। প্রথম আক্রমণ এলো কাফিরদের পক্ষ থেকে এবং বদর প্রান্তরে তারা পরাজিত হলো। পরাজিত ইসলামবিরোধী অপশক্তি দেখতে পেলো যে, বদর থেকে খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই মুসলিম শক্তির উত্থান ব্যাপকতর হতে শুরু করেছে। ফলে মুশরিক, কাফের, ইহুদি, মুনাফিক ও দোমনা-সংশয়ী নির্বিশেষে সকল ইসলামবিরোধী পক্ষ এ কথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে [ইসলাম] শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ একজোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদিনা আক্রমণ করেছিলা কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠে এক মাস ধরে মাথা কুটার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পিছু ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে যুদ্ধাঙ্গনে মুসলিম শক্তি এবং মুসলিমবিরোধী অপশক্তির মনোভাবটি স্পষ্ট হয়।

বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধের বিবরণেও আত্মরক্ষা, আগ্রাসী জুলুমবাজদের প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে চলে আসতে দেখা যায়। ইসলামের ইতিহাসে বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উত্থান মুতার যুদ্ধ আর তাবুকের অভিযান করা হয়েছিলো গ্রিকদের হাতে মুসলিম দূতের হত্যার কারণে। ইসলামের সীমান্তকে নিরাপদ করার জন্য। মুসলিমগণ যদি প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের এই নরহত্যার জন্য শাস্তি না দিত, তাহলে জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের সুমহান মর্যাদা এতটা সমুজ্জ্বল হতে পারতো না; হেরাক্লিয়াসের আগ্রাসী আধিপত্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসের গৌরবময় উল্লেযোগ্য বিষয় হলো এটাই যে, শত্রু ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এত অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতার সকল তথ্য সংবাদ জেনে ফেলার পরও মুসলিম বাহিনী সংযত

www.pathagar.com

এবং ইসলামের নীতিমালার অধীনে থাকতে সমর্থ হয়েছে। বরং যুদ্ধই মুসলিমদের ওপর এসে পড়েছে। যুদ্ধ কিভাবে মুসলিমদের ওপর এসে পড়েছে, সেটা মদিনায় কাফের-মুশরিক আক্রমণকারীদের তৎপরতার মাধ্যমে প্রমাণযোগ্য।

একইভাবে গ্রিক সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা মুসলিমদেরকে খ্রিস্ট জগতের অধিকাংশের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে টেনে আনে। কারণ, বাইযান্টাইন সম্রাটের ক্ষীয়মাণ কর্তৃত্বের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মর্যাদা এমন জগা-খিচুড়ি মার্কা ছিলো যে, তাদের কারও সাথে সন্ধি-চুক্তি করে বিবাদ নিষ্পত্তি করা মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে পরাভূত করে চুক্তির মধ্যে আনতে না আনতেই আরেকজন শত্রুতামূলক একটা কিছু করে বসে, আর মুসলিমগণ এ শাস্তিবিধান করতে বাধ্য হয়। ফলে মুসলিমগণ প্রায় সমগ্র খ্রিস্ট জগতের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নিপতিত হয়।

অর্থাৎ আত্মরক্ষা আর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার বাইরে আক্রমণকারী হিসেবে কখনওই মুসলিম শক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়নি এ জন্যই যে, ধর্মের বিধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই প্রতিরক্ষার বিধান ও আন্তর্জাতিক আইন নীতি নিয়মকেও লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইসলামে। কাজেই মুসলিমগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যাহ্নকালেও শত্রুদেরকে সব সময়ই বলতে পেরেছে :

"আমাদের প্রতি শত্রুতা বন্ধ করো, আর আমাদের মিত্র হয়ে যাও, আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো; অথবা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর দাও, আমরা তোমাদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবো আর রক্ষা করবো; অথবা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো, তাহলে আমাদের যা আছে তার সব সুযোগ সুবিধা তোমরা ভোগ করতে পারবে। মুসলিমদের যুদ্ধ আইনের ভিত্তি আল্লাহর যেসব প্রধান নির্দেশাবলি এবং যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিখিয়েছেন অপরাজেয় মানুষগুলোকে এবং এর মধ্যকার জ্ঞানবত্তা ও মানবতাবোধ ইসলামী ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে, সেই ঐশী নির্দেশনা অলঙ্ঘনীয়। আর এ সকলই আজ-কাল-আগামীকাল প্রতিরক্ষাগত চিন্তা ও বিবেচনার মৌলিক ভিত্তি, যাকে কেন্দ্র করে এবং মূলাদর্শ ধরে বিদ্যমান বাস্তবতায় প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল প্রণয়নের দাবি রাখে।

"আর তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, আল্লাহর ধর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো কিন্তু তাদেরকে প্রথমে আক্রমণ করে বাড়াবাড়ি করতে যেও না, কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর যেখাইে আক্রমণকারীকে পাও সেখানেই তাদেরকে হত্যা করো, আর যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছিলো সেখান থেকে তোমরাও তাদেরকে রেব করে দাও, কারণ নির্যাতন হত্যার চেয়েও খারাপ; আর কাবা প্রাঙ্গণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, কিন্তু তারা যদি আক্রমণ করে তবে তাদেরকে হত্যা করো; ওই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের উচিত পুরস্কার। আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যাবৎ তা যেন নির্যাতনে পর্যবসিত না হয়, কারণ ধর্মটা তো কেবল আল্লাহরই ব্যাপার; কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে আর যেন শত্রুতা করা না হয়, শুধু উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ছাড়া।"

www.pathagar.com

মুসলিমগণ যে পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘোরায়, তা কেবল অবস্থার গতিকে বাধ্য হয়েই। মুনযির বংশ নামে একটি আধা আরব পরিবার পারসিক রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় হিরায় রাজত্ব করছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে শত্রুভাবাপন্ন হলেও তারা ধর্ম আর সমস্বার্থের বন্ধনে বাইযান্টাইনদের সাথে মিত্র ভাবাপন্ন ছিল। গ্রিকদের সাথে মুসলিমদের প্রথম সংঘর্ষের ফলেই মুনযির শাসনাধীন প্রজাদের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা উচ্ছৃঙ্খলার অঙ্গ হিসেবে পার্শ্ববর্তী উপজাতিগুলোর ওপর লুটতরাজমূলক হামলা শুরু করে, আর ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একক শাসনকর্তার পরিচালনাধীন একটি শক্তিশালী সরকার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁরই নীতি আদর্শ প্রশিক্ষণে দীপ্ত হয়ে নানা বিদ্রোহ দমনের আরও সুসংবদ্ধ একটি সরকার, একটি ভেঙে পড়ো-পড়ো সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের হাতে অন্যায়ভাবে অপমান নীরবে সহ্য করতে পারেনি।

হিরা বিজয়ের ফলে মুসলিম বাহিনী এসে পড়ে পারস্য সাম্রাজ্যের অঙ্গনে। পারস্য তখন দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের পর একজন তেজোদীপ্ত শাসনকর্তা রূপে পেয়েছিল ইয়াযদজর্দকে। এই সম্রাটের নির্দেশে পারসিক সেনাপতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ত সাথী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মদিনার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা বিধানের একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে পারসিকদের যুদ্ধে আহ্বানের সশস্ত্র জবাব দেয়ার আগে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইয়াযদর্জদের কাছে দূত মারফত সাধারণ শর্তাবলি প্রেরণ করেন।

এই শর্তাবলি ছিল ইসলাম কবুল করা, যার অর্থ ছিল যে সমস্ত রাজনৈতিক অনাচারের ফলে চরম নীচ স্তরে নেমে যাওয়া সাসানীয় সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার সংস্কার, যে সমস্ত খাজনার ভারে জাতির জীবন শুকিয়ে যাচ্ছিল তার উচ্ছেদ, ইসলামের সাম্য ও ন্যায়নীতি অনুসারে বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, যার ফলে আইনের চোখে সমস্ত মানুষ পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে সামন বলে গণ্য হবে। বিকল্প শর্ত ছিল বশ্যতা স্বীকারমূলক কর দান, যার পরিবর্তে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।

এই শর্তাবলি পারস্য সম্রাট প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আসে কাদিসিয়ার দিন।

বিজয়ের পর খলিফা কঠোর নির্দেশ দান করেন যে মুসলিমগণ যেন কোনো ক্রমে তাইগ্রীস নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর না হয় এবং ঐ নদী চিরতরে পারসিক আর সারাসেনিক সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করবে। মেসোপটেমিয়ায় পরাজিত হয়ে পারসিকদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং তারা আরও বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা অব্যাহত রাখে। ফলে মুসলিমদের প্রচণ্ড প্রতিরোধমূলক আক্রমণে পারস্য রাজের ক্ষমতা অনুদ্ধরণীয়ভাবে বিচূর্ণ হয়ে যায়। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আর পুরোহিত শ্রেণীর নেতাদের স্বার্থ ছিল বিশৃঙ্খলা আর অত্যাচারের রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে, তাদের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমগ্র সাধারণ পারসিকরা মুসলিমদের তাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে অভ্যর্থনা জানায়। তাইগ্রিস থেকে আলবুর্জ, আর আলবুর্জ থেকে ট্রান্সঅক্সিনিয়া পর্যন্ত বিপুল ভূখণ্ড আর এর জনগণ মুসলিমদের বিজয়ে প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা অমৃত পান করে।

www.pathagar.com

নয়.

প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধনীতির পর্যালোচনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইসলাম তরবারিতে হাত দিয়েছে আত্মরক্ষার জন্য, তরবারি হাতে ধারে রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য আর তা করবেও চিরকাল এটা ইসলামের বিধান। ইসলাম কখনও কারো নৈতিক বিশ্বাস বা অধিকারের ওপর আগাম হস্তক্ষেপ করেনি, কখনও ধর্মীয় নির্যাতন করেনি, কখনও যাজকীয় তদন্ত সভা স্থাপন করেনি যেমনটি করেছে গোড়া খ্রিস্টানরা। মতভেদকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য, কিংবা মানুষের বিবেককে গলা টিপে হত্যার জন্য, অথবা বিরোধী ধর্মমত নিপাতের জন্য ইসলাম কখনও 'র‍্যাক' বা স্টেক আবিস্তার করেনি ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

ইতিহাসের উপযুক্ত জ্ঞান আছে, এমন কেউই অস্বীকার করতে পারবে নাম যে, খ্রিস্টান গির্জা যখন নিজেদেরকে পরম অভ্রান্ত বলে প্রচার করছে তখনও তারা নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত করেছে মানবজাতির মধ্যে সৃষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি মাত্রায়। যেসব নর-নারী গির্জার অধীনতা থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে, এমনকি অন্য ধর্মমতে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে, তাদের ভাগ্যও কোনো অংশে কম নিষ্ঠুর ছিল না। ষোড়শসপ্তদশ শতকে এমন অনেককে পুড়িয়ে বা ফাঁসি দিয়ে মারা হয়, কারণ তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন খারাপ লোক বলে মনে করতে পারেনি। এমনকি ১৫২১ সালে ক্রিস্ট জগতের দেশগুলোতে চরম ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থে ভিন্নমত প্রকাশকদের মৃত্যুদণ্ড দানের ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পুড়িয়ে মারা আর ফাঁসি দিয়ে মারা, জিহ্বা টেনে ছেঁড়া আর জিহ্বা মোচড়ানো ইত্যাদি ছিল গোঁড়া যাজকতন্ত্রী খ্রিস্টধর্মমত গ্রহণ করতে অস্বীকারকারীদের প্রতি প্রদত্ত সাধারণ শাস্তি ও নমুনা। গণতন্ত্রের তথাকথিত সূতিকাগার ইংল্যান্ড প্রোটেস্টান্ট হয়ে যাওয়ার পর প্রেসবাইটারিয়ানপন্থীদের পরপর বহু বছর বন্দী করে রাখে; তাদের দেহ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়; অঙ্গহানি ঘটায়; চামড়া খসানো হয়; এবং পিলোরিতে আটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। স্কটল্যান্ডে তাদেরকে ধরার জন্য চোর ডাকাতের মতো পাহাড়ে পর্বতে তাড়িয়ে নিয়ে নিভৃত্যে গিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তাদের কান গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

লোহা পুড়িয়ে গায়ে দগদগে দাগ দেয়া হয়েছে; আঙুলচাপা! যন্ত্র দিয়ে আঙুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে; পিটিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে গুঁড়া করা হয়েছে। মেয়েকে খোলা রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবুক মারা হয়েছে। আনাব্যাপটিস্ট আর অ্যারিয়ানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আবার অখ্রিস্টানদের [ইহুদি ও মুসলিম] বেলায় ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট, গোঁড়া আর অগোড়া,সমগ্র খ্রিস্ট জগৎ পূর্ণ ঐকমত্যের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরম উল্লাসে সম্মিলিতভাবে নির্যাতন করেছে। ইংল্যান্ডে ইহুদিদেরকে পশুর মতো পেটাতে পেটাতে নি:স্বভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। স্পেনে মুসলিমদেরকে মসজিদের ভেতরেই নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অশ্বেতাঙ্গদের বেলায় কী নির্মম আচরণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার মধ্যেও আতঙ্ক জেগে ওঠে।

www.pathagar.com

মানুষের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে পায়ে পিষে ফেলার এই ভয়ঙ্কর নিবর্তনমূলক ইতিহাস থেকে তুলনামূলক বিবেচনায় ইসলামের দিকে চোখ ফেরানো হলে সুস্পষ্ট পার্থক্যটি কারও পক্ষে অনুবধান করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টধর্ম যখন ইহুদি আর নেস্টোরিয়ানদেরকে সমান হিংস্রতা সহকারে নির্যাতন করে তাদের বিমূর্ত ঈশ্বরকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, ইহুদিরা তাদের বংশধর বলে, আর নেস্টোরিয়ানরা তাঁর মাকে উপাসনা করে না বলে ইসলাম তখন উভয়কেই আশ্রয় আর নিরাপত্তা দান করে। ক্রিস্টান ইউরোপ যখন ডাইনি বিচ্যুতমতাবলম্বীদেরকে পোড়ায় আর ইহুদিদেরকে ও খ্রিস্ট ধর্মে অবিশ্বাসীদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করে, মুসলিম শাসনকর্তারা তখন তাদের তরবারিকে অধীনস্থ অমুসলিম প্রজাদের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার্থে ব্যবহার করে। সুবিবেচনা ও সহনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠার এমন নজির বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। যে খ্রিস্টান জগতে ধর্মের পার্থক্য যুদ্ধ ও হত্যার কারণ ইসলামে সেটা চরম উদারতা, সহনশীলতার বিষয়। খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পরাজিত জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন তখন তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন প্যাট্রিয়ার্ক সফ্রেনিয়াসের পাশাপাশি অশ্বারোহণ করে, নগরীর প্রাচীন নিদর্শনাদি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে। নামাজের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন চার্চ অব রিসারেকসনে কিন্তু সেখানে তিনি নামাজ আদায় করতে অস্বীকার করেন। নামাজ আদায় করেন তিনি চার্চ অব কনস্ট্যান্টের সিঁড়ির ওপর। তিনি প্যাট্রিয়ার্ককে বলেন; "আমি যদি কোনো গির্জায় নামাজ আদয় করি তাহলে ভবিষ্যতে মুসলিমগণ আমার উদাহরণ অনুকরণ করে সন্ধিভঙ্গ করতে পারে।' অর্থাৎ গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার মতো ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। তা-ই পরধর্মের প্রতি এমন সহনশীলতা ও সতর্কতা। অথচ খ্রিস্ট ক্রুসেডকারীরা যখন জেরুজালেম জয় করে তখন ছোট শিশুদের মাথা দেয়ালে আছড়ে ঘিলু বের করে দেয়। কচি শিশুদের নগরীর উঁচু দেয়াল থেকে নিচে নিক্ষেপ করে অকাতরে হত্যা করে। পরাজিত মানুষদেরকে আগুনে সিদ্ধ করে মারে। সোনা গিলে পেটে রেখেছে কি না, সেটা দেখার জন্য জীবিত মহিলাদের পেট চিরে ফেলে। ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে তাদের উপাসনালয় সিনাগগে ঢুকিয়ে হত্যা করে। প্রায় সত্তর হাজার লোক তথাকথিত বিজয়ী দলের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। এমনকি মান্যবর পোপের দূতকেও দেখা যায় এ বিজয়-পরবর্তী হত্যা-লুণ্ঠনে বীরদর্পে অংশগ্রহণ করতে। আর গাজী সালাহউদ্দিন যখন নগরী পুনরুদ্ধার করেন, তখন তিনি সকল খ্রিস্টানকে ছেড়ে দেন; তাদেরকে অর্থ ও খাদ্য দান করেন; তাদের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেন।

ইসলাম স্বীয় প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য তরবারি ধারণ করে। মানবতাকে মুক্তির জন্য মানবতার স্বার্থে যুদ্ধে যোগ দেয়; জুলুম-নিপীড়ন উচ্ছেদের জন্য জালেমের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার উচ্চারণ করে এটাই প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে ইসলামের মূল ধারণা। অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদ অস্ত্র ধারণ করে চিন্তার স্বাধীনতা আর বিশ্বাসের যুক্তিকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য; মানবতাকে রক্তাক্ত করা জন্য। অতীতে এ কথা যেমন সত্য, বর্তমানে সেটা

www.pathagar.com

আরও সত্যরূপে প্রতিভাত। বিশ্ব ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট, কারণ তারা পুরো রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

দশ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের মাত্র দুই বছর পর ৬২৪ সালে সংঘটিত ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর থেকে শুরু করে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোল বিজয় পর্যন্ত ছোট বড় শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুদ্ধ পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই যে, সেগুলোতে তদানীন্তন আমলের বৃহৎ শক্তির প্রায় সবগুলো জাতিই সম্পৃক্ত ছিল। যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল নবাগত মুসলিম শক্তি আর অন্য দিকে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শক্তি। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে ছিল তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী নানা জনগোষ্ঠী– আরব, বারবার, তুর্কি, ইরানি, হাবশি, কুর্দি, আফগানসহ অনেকেই। বিপক্ষে ছিল রোমান, পারসিক, ভিসিগোথ, পারশিক, ক্রুসেডার, মোঙ্গল ও রাজপুতেরা। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মুসলিম পক্ষ বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে, প্রমাণ করতে পেরেছে তাদের নৈতিক, আদর্শিক ও উপকরণগত উপযুক্ততা এবং বিজয়ও তারাই ছিনিয়ে এনেছে। প্রতিটি যুদ্ধের জন্যই এ কথা সমানভাবে সত্য।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা ছিলেন মরুভূমির সন্তান। ইসলাম তাদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা আর সাম্যের সহজাত অনুভূতি জাগ্রত করে। এবং সেই সহজাত প্রবণতাকে তীব্রতর ও বেগবান করে ঈমান, একতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর অনুপম চেতনা শক্তি।

পক্ষান্তরে মুসলিমগণ যে সমস্ত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেককেই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্তি ছিল। এক দিকে ছিল সুবিধাভোগীর দল আর অন্য দিকে নিপীড়িত নির্যাতিতগণ। সুবিধাভোগীদের দলে ছিল সামন্ত প্রভু এবং গির্জার সঙ্গে সংশি-ষ্টরা। অপর দিকে ভূমিদাসগণ। ধর্ম ও নৈতিকতার সাম্য ও মানবিকতায় ঐক্যবদ্ধ মুসলিমগণ যখন বিজয়ীর বেশে অবতীর্ণ হন তখন নির্যাতিত ও বঞ্চিতরা তাদেরকে গ্রহণ করে ত্রাণকর্তারূপে মুসলিমদের বিজয়ের মধ্যে দিয়েই তাদের মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিরোধী পক্ষের এই অনৈক্য মুসলিম শক্তি খুব ভালোভাবে কাজে লাগায় কারণ তাদের যুদ্ধের অন্যতম মুল কথাই হিলো : 'শোষণ- জুলুমের অবসান'।

এই আদর্শিক অগ্রসরতার জন্যই মুসলিম শক্তি সামরিক দিক দিয়ে এবং মনোবল আর সরঞ্জামের প্রাগ্রসরতার বিবেচনায় শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভক্ত-ভঙ্গুর শত্রু পক্ষকে সহজেই বিপর্যস্ত করত সক্ষম হয়। ফলে যখন মুসলিম বাহিনী যে এলাকতে গেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী মুক্তির দিশারিরূপে তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। তারা প্রমাণ পেয়েছিল যে, মুসলিমগণই তাদেরকে সামন্ত প্রভু এবং যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ ও উৎপীড়ন, অজ্ঞতা এবং অসহিষ্ণুতার কঠোর শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি দিতে সক্ষম ।

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে শত্রু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের ওপর আগাম নিয়ন্ত্রণ ও আস্থা অর্জনের বিষয়টি মুসলিমদের বিজয় লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অবস্থা যতদিন বজায় ছিল, মুসলিম বাহিনী ততদিন দুর্জয় ও অপরাজয়ের গতিতে এগিয়ে গেছে।

কিন্তু কালের বিবর্তনে গোটা পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করলো। মুসলিমরা যে শুধুমাত্র অপরের বন্ধন শৃঙ্খলকে উন্মোচন করতে বর্থ্য হলো তা-ই নয়, বরং তারা নিজেরাই শৃঙ্খলিত হয়ে গেল। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এককালে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদও শুরু হলো। তারা বিভক্ত হয়ে গেল আরব, আযম, উত্তর আরব, দক্ষিণ আরব, বারবার প্রভৃতি দল উপদলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কলহের ফলে স্বীয় মান মর্যাদা, স্বাধীনতা সংরক্ষণে তাদের সুউচ্চ চেতনাগত মনোভাবেরও তিরোধান ঘটলো। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অজেয় প্রতিরক্ষা শক্তি এবং এরই ভিত্তিতে বিস্ময়কর বিজয়ের পেছনে এমন কোনো পারলৌকিক ফর্মুলা ছিলো না, যা আবৃত্তি করায় ম্যাজিকের মতো ফল পাওয়া গেছে। বরং তখনকার মুসলিমদের মনে প্রতিরক্ষা চেতনা ছিলো খুবই প্রবল ও স্পষ্ট। এই প্রেরণাই তাদেরকে উন্নতমানের যোদ্ধা আর গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে অগ্রসর সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিল।

ইতিহাসের শিক্ষা থেকে জনা যায়, মুসলিমগণ প্রতিরক্ষা ধারণার মূল প্রেরণা থেকে সরে আসার মাধ্যমেই সূচিত হয় পরাজয়, বিপর্যয়, অধ:পতন। যে নিয়মপদ্ধতি বা কৌশল কর্মপন্থার বদৌলতে তারা সকলের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন, সেই সূত্রগুলোর পেছনের চেতনাগত বা আদর্শিক প্রণোদনা না-থাকায় অচিরেই সেগুলোই অকার্যকর প্রমাণিত হলো। শাসক মুসলিমগণ শাসিতে আর স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পরাধীনে পরিণত হলো। যে বিপর্যয়ের ধারা এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে।

মূলত এটাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং যুগ যুগ ধরে মানবেতিহাসে এই শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যা সতর্কবাণীরূপে আল কুরআন বারবার উল্লেখ করেছে এই বলে যে, যারা সবচেয়ে বেশি যোগ্য, তুলনামূলকভাবে যাদের উপযুক্ততা বেশি, আল্লাহ তাদের ওপরই পৃথিবীর নেতৃত্ব শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং যতদিন তারা আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে তাদের জন্য নির্দেশিত যোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে, কেবলমাত্র ততদিনই এই সুযোগ পাওয়া যাবে। প্রতিরক্ষার মতাদর্শিক ও ধারণাগত ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে এই অমোঘ সত্য মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আগ্রাসনমূলক বাস্তবতায় আমাদের স্বাধীন, আত্মসম্মানজনক ও নিরাপদ বেঁচে থাকার তাগিদেই। ■

www.pathagar.com

আদর্শ সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর ভূমিকা

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

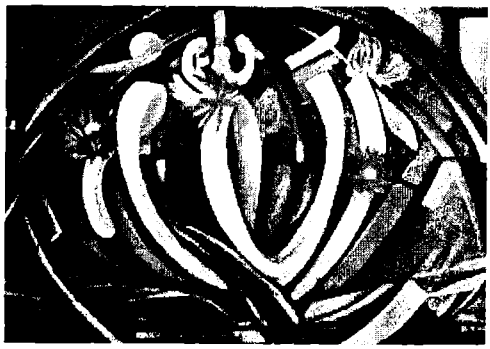

মহানবী [সা.]

মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর রাসূল [সূরা ফাত্হ ৪৮, আয়াত নং-২৯ ।] এবং শেষ নবী । [সূরা আহযাব ৩৩, আয়াত নং-৪০]

যিনি বিশ্ব জগতের প্রতি দয়া বা রহমতস্বরূপ প্রেরিত । [সূরা আম্বিয়া ২১, আয়াত নং-১০৭ ।] যিনি সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুস-ংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে প্রেরিত যদিও অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অসচেতন । [সূরা সাবা ৩৪, আয়াত নং-২৮ ।] যার প্রতি স্বয়ং আল্লাহপাক দরুদ পড়েন এবং ফিরিশতাগণও । আর যার প্রতি দরুদ পড়তে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সকল মু'মিনদের । [সূরা আহযাব ৩৩, আয়াত নং-৫৬ ।] নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর

www.pathagar.com

রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানকর আযাব [যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাদের অপমানকর পরিণতিই হয়েছে]। [সূরা আহযাব ৩৩, আয়াত নং-৫৭ ।]

রাসূল সা. একজন মানুষ

আল্লাহতায়ালা কুরআনে তাঁর রাসূলকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এভাবে -

"বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের সাথে আমার পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে , সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে [সূরা কাহাফ; ১৮:১১০] "।

আল্লাহ এভাবে গোটা মানব জাতির কাছে মুহাম্মদ (সা.) এর পরিচয় স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। আল্লাহ আরো বলছেন, -"বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল[১৭ঃ৯৩] । কোন অতিমানবীয় ধারণা থেকে আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে [সা.] মুক্ত রেখেছেন, যাতে করে নিতান্ত সাধারণ মানুষও তাঁকে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধা না হয়।

আল্লাহর কথাগুলো মানবজাতির কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে এবং নিজে তা নিষ্ঠার সাথে পালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, মুহাম্মদ [সঃ] কার্যতঃ আল্লাহর প্রকৃত আ'বদ-এর অনুসরণীয় প্রতীক হয়ে আছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তাই থাকবেন। আল্লাহর আইনের প্রতি তিনি ছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে অবিচলিত ও সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী। কখনই তিনি আল্লাহর আইনের উর্ধ্বে নিজকে মনে করেননি।

অসভ্য, খুনি, চোর, গুন্ডা, বদমাশ, সন্ত্রাসী, জঙ্গী, দুর্নীতিবাজ, নেশাখোর, মদখোর, ব্যভিচারী, কালোবাজারী, যুদ্ধবাজ, সূদখোর, ঘুষখোর - এসব মানবতার দুশমনকে মানবতার বন্ধু বানাবার জন্য যে পরশপাথর, ইসলামের সুমহান বাণী, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ [সঃ]-কৈ দিয়েছেন, তা ঐক্যবদ্ধভাবে অনুসরণ করে আল্লাহর রঙে রঙীন হয়ে এসব মানুষ মানবতার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

সূদখোর, মদখোর, নেশাখোর, ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, মজুদদার, কালোবাজারী, জুয়ারী, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী, মিথ্যাচারী, নারী-নির্যাতনকারী সব মিলিয়ে আজ বাংলাদেশ যে দুর্বিষহ সংকটে খাবি খাচ্ছে, তা থেকে মুক্তির জন্য ইতোমধ্যে অনেক প্রায়োগিক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতা উত্তর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, " সবাই পায় সোনার খনি , আমি পেয়েছি চোরের খনি "– এই চোরের খনির বৃত্ত থেকে এখনও বাংলাদেশ বের হতে পারেনি। বের হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ প্রায়োগিক পরীক্ষাগুলো ছিল কিছু ক্ষমতা উচ্চাভিলাসীদের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রণীত এবং আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন বিধান আল-

www.pathagar.com

কুরআন তথা আসমানী দিকনির্দেশনা বিবর্জিত। ফলে চোরের খনি সোনার খনিতে পরিণত হয়নি। সোনার খনিতে পরিণত করতে হলে অবশ্যই তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সাঃ] দেখানো পথেই করতে হবে। অন্য কোন পথে সময়, শ্রম, মেধা, অর্থ নষ্ট হবে মাত্র।

জীবনের মাত্রা ও মহানবী [সাঃ]

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, এ দ্বিমাত্রিক ধারণায় জীবনকে সাজিয়েছিলেন মহানবী [সাঃ]। জীবনের সকল পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক সফলতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় গ্রহণ-বর্জন করতে শিখিয়েছে ইসলাম। আর এই বিবেচনায় ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোন ভেদাভেদ ইসলাম করেনি। এতটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বিতীয় নজির পৃথিবীর বুকে আর নেই। ফলে জীবনের যে দ্বিমাত্রিক ধারণা ইসলাম দিয়েছে তা খুবই আন্তরিকভাবে কোন মানুষ গ্রহণ করলে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক প্রতীকে পরিণত হন। ভারতের অবিসংবাদিত নেতা, যিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যিনি মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত, মুহাম্মদ [সাঃ] সর্ম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা আর অনুরক্ততা তুলে ধরেছেন।

একমাত্র ইসলামই পারে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়ে গোটা মানবজাতির জন্য আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে। এটা জীবনের দ্বিমাত্রিক ধারণা, বিশ্বাস ও বাস্তবতার কারণেই সম্ভব হয়। প্রচলিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় দর্শনে ইহলৌকিক জীবনই চূড়ান্ত। এখানে পারলৌকিক জীবনের কোন ধারণা, বিশ্বাস ও বাস্তবতা নেই। ফলে বস্তুগত জীবনের সকল পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যে কোন উপায়ে অর্জন করাই এখানে একমাত্র সফলতার সংজ্ঞা। ফলে সংখ্যাগুরচ সম্প্রদায়ের সকল কর্মকান্ডই অসাম্প্রদায়িক হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনকি ভারতের গুজরাটের কসাই খ্যাত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নির্বিচারে অসহায় মুসলিম নারী-শিশু গণহত্যাও। খ্রীষ্টান মিশনারীকে গাড়ীতে পুড়িয়ে মারাও। কাশ্মীরে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী ভারতের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বরতা, আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের আবু-গারিব কারাগারে নির্যাতন, সভ্যতা বিধ্বংসী বোমা বর্ষণ ও গণহত্যা এসবই অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !!! একই চিত্র উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীনের এবং থাই মুসলিমদের প্রতি থাকসিন সরকারের।

পৃথিবীর যে কোন দেশের জন্যই এ কথা সত্য যে, জীবনের একমাত্রিক বা ইহলৌকিক ধারণা ও বিশ্বাসই মানুষকে অসাম্প্রদায়িকতার নামে সবচেয়ে বেশী সাম্প্রদায়িকতার, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সবচেয়ে বেশী অধার্মিকতার ও বর্বরতার পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতিই নয়, গোটা মানবতার বিরুদ্ধে। মানবতার

www.pathagar.com

বিরচদ্ধে অপরাধই একমাত্রিক জীবনবোধের অনিবার্য পরিণতি। তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বিশ্বকে দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে আর তাতে মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা পূর্ণতা পেয়েছে মানবতার বিরচদ্ধে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে। যার ফলে আজও কিছু মানুষ আণবিক বোমার অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

আদর্শের সার্বজনীনতা

আলী ইবনে আবু তালিব যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলতেন, তাতে তার প্রকাশভঙ্গি ছিল এরকম : শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, অতুলনীয় সত্যবাদী, সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। [সীরাতে ইবনে হিশাম, ইবনে হিশাম, অনুবাদ-আকরাম ফারুক, প্রকাশক-বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। পৃ-৫১] ব্যাক্তিগত ও দলীয় বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক গুনাবলী বিশ্লেষণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। মানুষের Maker & Owner আল্লাহপাক বলছেন, "ইন্নাকা লা 'আলা খুলুক্বিন আযীম-নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল-কালাম ৬৮, আয়াত নং-৪।] আল্লাহ আরো বলেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ..." [সূরা আল-আহ্যাব ৩৩, আয়াত নং-২১।] "হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আল-আহ্যাব ৩৩, আয়াত নং-৪৫-৪৬।] জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেতেই মানুষের জীবনে আদর্শের প্রয়োজন হয়। আর একটি সুবিচারপূর্ণ সমাজ নিমার্ণে আদর্শের কোন বিকল্প নেই। 'আলোকদীপ্ত প্রদীপ' বলতে মূলতঃ যে আলোয় মানুষ জীবন চলার আলোকিত পথ খুঁজে পায় এমন প্রদীপই বুঝায়। আল্লাহ এমন একজন মানুষকে মানবজাতির জন্য মনোনীত করলেন যিনি আলোকদীপ্ত প্রদীপ তথা আলোকিত আদর্শের প্রতীক। আল্লাহ আরো বলেন, "আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সূরা সাবা ৩৪, আয়াত নং-২৮।] আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহতায়ালা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া সহ সব মহাদেশের মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শণকারীরূপে মুহাম্মদ [সঃ]-কে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ভাষা, বর্ণ, গোত্র অথবা সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তা মূল্যায়ন করার পরিবর্তে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া সহ সব মহাদেশের মানুষের রাসূলের আদর্শের অনুসরণে অগ্রণী হওয়াই কুরআনের দাবী। অন্য যে কোন আদর্শের অনুসরণ মানবজাতির সংকটকে শুধু ঘণীভূতই করবে। মানুষের সুখ-শান্তি, দারিদ্রমুক্তি মুখের বুলি হয়েই থাকবে। সোনার হরিণ হয়েই

www.pathagar.com

থাকবে। আজকের ফ্রি সেক্সের ইউরোপ আমেরিকার দিকে চোখ ফেরালেই দেখতে পাবেন ব্যভিচার, ধর্ষণ, সমকামিতা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। শত শত নয়, হাজার হাজার সোনার সংসার ছারখার হচ্ছে। ফ্রি-সেক্স দর্শন, সংকটের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে বহু গুণে বহু রূপে কিন্তু সমাধান দিতে পারেনি। পারবেনা। পাশ্চাত্যে নারীদের মর্যাদা বলতে যে কোন দ্রব্য সামগ্রীর উপযোগিতাকে বুঝায়। আইনের ভাষায় নারী মর্যাদার বুলি, পাশ্চাত্য যত চিৎকার করে বলে, বাস্তবে সাধারণ নারীদেরকে মানবিক মর্যাদা নয়, যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করাই হয়। ক্ষমতায়নের নামে সাধারণ নারীদেরকে যে জীবন-ধারায় পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থা অভ্যস্ত করে তুলেছে, তার মাঝে মনুষ্যত্বের চেয়ে পশুত্বই প্রধান। আর কখনো কখনো তা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরের দৃষ্টান্তে সমুজ্জল। স্বাধীনতা-ক্ষমতায়ন-অধিকার ইত্যাদির মোড়কে পাশ্চাত্যের এসব পাশবিকতা যদি ভাল লাগে তবে বুঝতে হবে আমরা যর্থাথই বিকৃতির শিকার হয়েছি। পাশ্চাত্যের পুজিঁবাদী-সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনিবার্য ফল হচ্ছে সীমাহীন অভাব ও লোভের বল্গাহীনতা আর মানুষকে অর্থের দাসে পরিণত করা । মানবিক অনুভূতি, সহমর্মিতা সবই সেখানে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তথাকথিত করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি মূলতঃ সেবার মোড়কে আরো অধিক অর্থসঞ্চয়ের বা আয়ের একটি উপলক্ষ মাত্র। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এক মানবিক মরিচীকার যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। মানব সভ্যতায় মানবিক অবদান রাখার পরিবর্তে দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর পারমানবিক শক্তির ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া পাশ্চাত্যের কাছে দেবার কিছু আর ছিলনা। এখনও নেই। অথচ জাগতিক ও নৈতিক উভয়দিকে সবচেয়ে সফল মানুষ মুহাম্মদ [সঃ] এর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আমরা পাশ্চাত্যের মানবিক মরীচিকায় বার বার প্রতারিত হই।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দৃষ্টিতে মহানবী [সাঃ]-এর জীবন ও কর্ম গোটা মানবজাতির সম্পদ, শুধু মুসলিমদের নয়।

মাইকেল এইচ হার্ট, জর্জ বার্নার্ড 'শ কিংবা মহাত্মা গান্ধী মুহাম্মদ [সাঃ] এর সাথে কোন বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত নন কিংবা অন্য কোনভাবে প্রভাবিতও নন। আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া-আফ্রিকার এই তিন দিকপালের তিনটে উদ্বৃতিই এতটুকু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মানব জাতির জন্য ইসলাম এক অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ জীবনবিধান। এমন একটি শ্রেষ্ঠ জীবনবিধান এবং তার বাস্তবায়নকারী অনুপম চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মদ [সাঃ]-এর আদর্শ থাকতেও কিভাবে আমরা মরণোত্তর নেতৃত্ব ও আদর্শ অনুসরণের নামে রাসূল (সাঃ) কে এড়িয়ে চলি তা ভাবলে দুঃখ হয়।

আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, সতর্ক করেছেন একটি আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে। আল্লাহ বলছেন, "তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা

www.pathagar.com

এখন তোমার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি এবং যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম [তা হচ্ছে] দীন কায়েম কর এবং এতে [দীন কায়েম করার বিষয়ে] মতভেদ করোনা।" [সূরা আশ্-শূরা ৪২, আয়াত নং-১৩।]

আল্লাহ আরো বলেন, "তিনিই সে সত্তা [আল্লাহতা'য়ালা], যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য জীবনবিধানের দিশা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো অন্য সকল জীবনবিধানের উপর একে বিজয়ী করা হয়। আর মুশরিকদের জন্যে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।" [সূরা আস-সাফ ৬১, আয়াত নং-০৯।]

আয়াত দুটো বিশ্লেষণ করলে যা দাড়ায় তা হল,

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুর্নগঠন ও প্রতিষ্ঠার কাজ মনোনীত নবী-রাসূলদের একটি মৌলিক কাজ।

দীন কায়েম বা আর্দশিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুর্নগঠন ও প্রতিষ্ঠার কাজে কোন মতভেদ যেন বাধা হয়ে না দাড়ায়।

শ্রেষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। আর এজন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআনেই দেয়া হয়েছে।

ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজের বিরোধিতাকারী সুনিশ্চিতভাবেই থাকবে এবং তাদের মোকাবেলা করেই প্রতিষ্ঠার কাজ করে যেতে হবে। ইসলাম শ্রেষ্ঠ, তাই এর কোন বিরোধিতাকারী না থাকার কল্পনা করা এক ধরণের আহাম্মকী।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তথাকথিত কোন ধর্মের নাম নয়, ইসলাম একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম। যে কোন রাষ্ট্রেরই রয়েছে একটি সার্বভৌমত্বের ধারণা। ইসলামে সকল ধরণের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা। [সূরা নূর ২৪, আয়াত নং-৪২। "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।"] রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর সন্তোষকে ঘিরে আবর্তিত হয়। যে রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান, মূলতঃ তার ভৌগলিক সীমার অভ্যন্তরের সকল ধর্মের, সকল রঙের মানুষের অভিভাবকরূপে প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন মাত্র। এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল কালের, সকল মানুষের কাংখিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুটি শর্ত

সেই কাংখিত আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুটো শর্ত আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ

www.pathagar.com

হবে তারা তো সত্যত্যাগী। [সূরা নূর ২৪, আয়াত নং-৫৫।]" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল। আজকেও যারা সে কাংখিত সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে এ দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্ত দুটো ঃ

এক. প্রকৃত ঈমানদার হওয়া;

দুই. সৎকর্ম করা।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি পার্থিব জীবনের জন্যই, আর আখিরাতের জন্যেতো রয়েছে ফিরদাওসের উদ্যান। [সূরা কাহ্‌ফ ১৮, আয়াত নং-১০৭। "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাওসের উদ্যান।"]

ঈমানদার দাবী করা সত্ত্বেও যারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় নেই, সংগত কারণেই বুঝতে হবে, সেই ঈমানের দাবীদার সমাজ শর্ত দুটো পূরণ করেনি বা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, " মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আনকাবূত ২৯, আয়াত নং-২-৩।] অর্থাৎ প্রকৃত ঈমান অজর্নের বিষয়টির সাথে পরীক্ষার শর্ত যুক্ত রয়েছে। পরীক্ষার এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর সব সাহাবীদের জীবনে বার বার এসেছে এবং তাতে তারা উত্তীর্ণও হয়েছেন। প্রকৃত ঈমানদার তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই হতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল; তেমনি আজকেও যারা কাংখিত ইসলামী সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকেও সে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এ শর্ত পালন প্রায় উপেক্ষিত হয়েই পড়ে আছে। উপেক্ষার এ ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলে কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্নবিলাস বাস্তব হয়েই ধরা দিবে। তা নাহলে মানুষের প্রকৃত মুক্তি হবে সুদূর পরাহত।

বাস্তবতার নিরিখে শর্ত দুটির পর্যালোচনা

এক. প্রকৃত ঈমানদার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা [রাঃ]-র পাল্টা প্রশ্ন ছিল, তোমরা কি কুরআন পড়নি? অর্থাৎ কুরআনে যে আদর্শিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রূপ তুলে ধরা হয়েছে, তার পুরোটাই প্রতিফলন ঘটেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। কুরআনের আলোকে একজন প্রকৃত ঈমানদারের ন্যূনতম কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, যা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক - আমরা কি তা অর্জন করে ফেলেছি? কুরআনের আলোকেই তার একটি আত্ম-পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

www.pathagar.com

০১. জিহাদান কাবীরা

আল্লাহ বলছেন, "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করোনা এবং কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে বৃহত্তর জিহাদ [জিহাদান কাবীরা] চালিয়ে যাও।" [সূরা আল-ফুরকান ২৫, আয়াত নং-৫২।] 'কাবীর' শব্দটির অর্থ 'বড়'। যেমন, গুনাহে কাবীরা বা বড় গুনাহ। অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে আল্লাহপাক সবচেয়ে বড় জিহাদ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। উদ্বৃত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হল যে, জিহাদের জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল কুরআনের জ্ঞান এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জ্ঞানের গভীরতা। যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান ও তার প্রয়োগ কৌশলের দৈন্যতা রয়েছে তার মূলতঃ জিহাদের যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে। তার পক্ষে সঠিকভাবে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া দূরহ। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কুরআনের জ্ঞানের কৌশলগত প্রয়োগ অনুল্লেখযোগ্য। এর তিনটে কারণ হতে পারে ঃ

এক. গতানুগতিক পরিবেশের প্রভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তার বিপর্যয়।

দুই. কৌশলগতভাবে কুরআনের জ্ঞান প্রয়োগে উদাসীনতা বা আন্তরিকতার অভাব।

তিন. কুরআনের জ্ঞানের বিষয়ে আত্মতৃপ্তির ভাব যা মানুষকে জ্ঞানের সৃজনশীল প্রয়োগে অক্ষম করে দেয়।

জিহাদ ব্যতীত প্রকৃত ঈমানের দাবী পূরণ হয় না, জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত সোনালী সমাজের স্বপ্ন বাস্তবে কখনই রূপ লাভ করবে না। আর কুরআনের জ্ঞান ও তার সৃজনশীল প্রয়োগ ছাড়া কখনই জিহাদান কাবীরা করা সম্ভব হবে না। কি দ্ব্যর্থহীনভাবেই না আল্লাহপাক বলছেন, " সুতরাং যারা তার [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রতি ঈমান আনে তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর [অর্থাৎ কুরআন] তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে [অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করে] তারাই সফলকাম।" [সূরা আরাফ ০৭, আয়াত নং-১৫৭।] তাই ঈমানের দাবীদারদের অবশ্যই কুরআনের জ্ঞান ও তার প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে।

দুই. সৎকর্ম করা

০১. সৎকর্মের গুরচত্ব

ইসলামে ঈমান ও সৎকর্ম মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মত। যেখানেই ঈমানের কথা আল্লাহপাক বলেছেন, সেখানেই কোন না কোনভাবে সৎকর্মের বিষয়টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য,

www.pathagar.com

তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।" [সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ আয়াত নং-১ ও ২।]

আল্লাহ আরো বলেন,"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাওসের উদ্যান।" [সূরা কাহ্‌ফ ১৮, আয়াত নং-১০৭।]

উদ্বৃত আয়াতগুলো হতে সৎকর্মের গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়েছে । কর্মের ফলাফলে সফলতা বা ব্যর্থতা, কি আসবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, যারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

০২. সৎকর্ম কি?

কিন্তু সৎকর্ম কি? আল্লাহপাক বলছেন, " ভালকাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভাল কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবসে, ফেরেশতাগণে, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে [আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে] সম্পদ প্রদান করে সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দীমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট ও দুর্দিনে ও যুদ্ধের সময়। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" [সূরা বাকারা ০২, আয়াত নং-১৭৭।] আল্লাহ আরো বলেন," অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে ..... এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে...।" [সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ আয়াত নং: ১-৮।]

আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দাড়ায়, ভালকাজ হল ঃ

ক. ঈমান আনা [আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ,কিতাবও নবীগণের প্রতি।]

খ. দান করা [সম্পত্তির প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দান করা।]

গ. সালাত কায়েম করা।

ঘ. যাকাত দেয়া।

ঙ. প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা বা অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা। [সতর্কতার সাথে ওয়াদা করা এবং ওয়াদা নিশ্চিত করার পর তা যে কোন মূল্যে পূরণ করা।]

চ. ধৈর্য ধারণ করা। [কষ্ট, দুর্দিন-দুঃসময় ও যুদ্ধের সময় ঈমানের উপর অটল থাকা।]

ছ. অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। [ফালতু কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।]

জ. আমানত রক্ষা করে। [কথা, অর্থ-সম্পদ ও দায়িত্বপালন সব ধরণের আমানত রক্ষা করা। অর্থাৎ বাচালতায় গোপন কথা ফাস করেনা, লোভের বশে সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ করেনা এবং দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হয়না।]

আর্দশ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সোনার মানুষ বানানোর এমন অব্যর্থ ফর্মূলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রশ্ন দাড়াচ্ছে এর প্রয়োগ নিয়ে। বাস্তবায়ন নিয়ে। যারা সোনালী সমাজ

www.pathagar.com

ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে সৎকর্মের এই ফর্মূলার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ক্ষতির আশংকায় যারা ধৈর্য ধারণের পরিবর্তে ওয়াদা ভংগ করেন, দায়িত্বপালনের নামে অন্যের অধিকার হরণকে আমানতের খেয়ানত মনে করেন না, আল্লাহ প্রেমে দান করার প্রবণতার চেয়ে দান গ্রহণে অত্যুৎসাহী; কখনো কখনো লোভী এবং যাকাতের খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক তৎপরতা চালাতে অক্ষম; এমন মানুষ দিয়েতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী সমাজ গড়া সম্ভব হবে না। বরং এরা নিজেরাই আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হয়ে দাড়ান। আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা সে কথা কেন বল, যা তোমরা নিজেরা করনা? তোমরা যা করনা তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষের কারণ।" [সূরা আস-সাফ ৬১, আয়াত নং- ২ ও ৩।] এসব চরিত্রের লোকদের সর্ম্পকে আল্লাহ কত সূক্ষ্মভাবেই না ওয়াকিবহাল! আল্লাহ বলেন, " কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও রয়েছে যারা একটি দীনারও [বা একটি টাকাও] আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, ইহা এ কারণে যে, তারা বলে,'নিরক্ষরদের প্রতি [অর্থাৎ সাধারণদের প্রতি] আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই,' এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩, আয়াত নং- ৭৫ ও ৭৬।] সার্বিক বিচারে আল্লাহর নির্দেশিত সৎকর্মের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েই রাসুলুল্লাহ [সা.] আদর্শিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন।

আদর্শ সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর ভূমিকা

মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের উৎস হচ্ছে সে সমাজের মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই উত্তম ব্যক্তি এবং আখিরাতেও উত্তম নৈতিক চরিত্র হবে পাল্লায় ভারী। আল্লাহ মানব জাতিকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই শুধু দেননি, একজন সর্বোত্তম নৈতিকতা সম্পন্ন অনুসরণীয় রাসূলও পাঠিয়েছেন। নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানই ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাসূল হিসেবে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ বলেন, "আমরা এ গ্রন্থে [কুরআনে] কোন কিছুই বাদ রাখিনি।" [সূরা আনআ'ম ঃ ০৬ : আয়াত নং-৩৮।]

আল্লাহ আরো বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে দীনকে [জীবন বিধান]-কে পূর্ণতা দান করলাম।" [সূরা মায়িদা ঃ ০৫ : আয়াত নং-০৩।]

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহান নৈতিক চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" [সূরা কালাম ঃ ৬৮ : আয়াত নং- ০৪।]

www.pathagar.com

একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন ভিত্তির উপর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে মহান আল্লাহতায়ালা কিছু ডিভাইন ফর্মুলা প্রদান করেছেন। যার উপর ভিত্তি করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সভ্যতায় এক অতুলনীয় আর্দশিক সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন। যা মানবসভ্যতাকে অজ্ঞতা ও পাশবিকতার অন্ধকার হতে উন্নত চরিত্র ও মানবিকতার আলোর মুখ দেখিয়েছে। সংক্ষেপে সে ভুমিকাগুলোই নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা ঃ বস্তুতঃ মানুষের মত মর্যাদাবান সত্তার ইবাদাত পাবার যোগ্যতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যদিও মানুষ আগুন, সূর্য, প্রাণী ও গাছ-পাথরের পূজাও করছে। এ ধরণের পূজা মানুষের মর্যাদার অবমাননা। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদার চেয়ে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদাই সমুন্নত। সুতরাং মানুষ তার চেয়ে কম মর্যাদার কোন সত্তার প্রতি মাথা নত করতে পারে না। যারা তা করে তাদের সেসব কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিকতার শামিল। এটা সেসব মানুষের এক ধরণের বিশ্বাসের বিকৃতি। মানুষকে এসব বিকৃতি হতে মুক্ত করে যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবন সাধনা করেছেন।

২. বাবা-মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা ঃ পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শন 'মা দিবস' ও 'বাবা দিবস' উপহার দিয়েছে। আর মা-বাবার সবচেয়ে নাজুক সময়, বৃদ্ধ বয়সের জন্য ওল্ড হোম সংস্কৃতির প্রচলন করেছে। বাবা-মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার, অবহেলা, তাচ্ছিল্য আর ১৮ বছর হলেই বাবা-মাকে আইন দেখানোর অধিকার অর্জন এবং নৈতিক বাধনকে ছুড়ে ফেলা, এগুলো হলো ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য উপহার। অন্যদিকে ইসলাম সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছে, বাবা-মায়ের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না। নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে। দুর্ব্যবহারতো দুরের কথা; বৃদ্ধ বয়সের অসংলগ্ন কথা ও আচরণের জন্য তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলা যাবে না এবং ওল্ডহোম নয় তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের কাছে রেখে সেবা করতে হবে। তাহলে কোন্ জীবনদর্শন মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যের নাকি ইসলামের? রাসূলুল্লাহ [সা.] বাবা-মায়ের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যে তা কল্পনাতীত। আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে বাবা-মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। রাসূল [সা.] তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সফলভাবেই।

৩. আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় করা ঃ পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শনে আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য কোন 'অধিকার' বলে কিছু নেই। সেখানে দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, তবে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল এবং তা ইসলামের বিধানের মত এত সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ বা ক্লাসিফাইড নয়। আর এ কারণেই পাশ্চাত্যে কুকুর-বিড়ালকেও উইল করে সম্পত্তি দেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে থাকলেও আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য কোন 'অধিকার বলে কিছু নেই বা

www.pathagar.com

দয়া-দাক্ষিণ্য আছে। আর ইসলামে আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের বিষয়টি শুধু বা দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, এটা আত্মীয় মিসকীন ও মুসাফিরের অধিকার। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে এ অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে। বিষয়টা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করতে হবে এবং এর অন্যথা হলে অবশ্যই জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। কতটা মানবিক ইসলামের জীবনবিধান! ইসলামের বিধানটি জ্ঞানভিত্তিক, কোন ব্যক্তির খেয়াল-খুশির বা মর্জির অধীন নয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিধানটি অন্ধ, একদেশদর্শী এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির খেয়াল-খুশির অধীন। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের চেতনায় কাউকে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই মর্মে শেখানো হয় আর সেভাবেই মানুষের মধ্যে জবাবদিহির চেতনাহীন ভাবধারা গড়ে উঠে। অন্যদিকে ইসলামে জবাবদিহির চেতনা তাকে অন্যের অধিকার আদায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সব মানুষকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তার কাজের জন্য জবাবদিহিও করতে হবে। জবাবদিহিমূলকভাবে জীবন গড়াই মানবজাতির প্রতি ইসলামের এপ্রোচ। যাতে করে প্রকৃত জবাবদিহির দিন তা সহজ হয়। পৃথিবীতেও মানুষ সুখী হয়। জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির - জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে।

৪. দুর্ব্যবহার নয়, নম্র ব্যবহার করা ঃ মানুষ মাত্রই আত্মমর্যাদাবোধ দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহ বলেন, "আমিতো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।" [সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৭০] মানুষের এই মৌলিক প্রকৃতিকে পারস্পরিকভাবে সম্মান করতে শিখিয়েছেন রাসূল সা.। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ অভাবী হলে, কোন মানুষ মিসকীন কিংবা মুসাফির হলে, এমনকি সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে ফিরিয়ে দিতে হলে নম্র ভাষায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই দুর্ব্যবহার বা কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে কারো আত্মমর্যাদায় আঘাত না করা। তার প্রতি অসম্মানজনক আচরণ না করা। এই সার্বজনীনতা ও আর্ন্তজাতিকতা ইসলামের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবনদর্শনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে এতটা সম্মানের চোখে বিবেচনা করেনি। এভাবে মানুষের অধিকার স্বেচ্ছায় প্রদান করা হলে পুরো পৃথিবীতে অশান্তি বিরল অনুভূতিতে পরিণত হবে।

৫. সম্পদ ও সময়ের অপচয় রোধ করা ঃ অপব্যয় বা অপচয় উভয়টিই ব্যক্তির ব্যক্তিগত খেয়াল বা মর্জির উপর নির্ভরশীল। যে কোন বিচারে লোভ ও অহংকারই অপব্যয় বা অপচয়ের নেপথ্য প্রেরণাদায়ক শক্তি। তাই অপচয় বা অপব্যয়ের জন্য তিনটি শর্ত প্রযোজ্য : ০১. অহংকার ০২. লোভ ০৩. সম্পদের প্রাচুর্য। উক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্যতা উল্লেখ করা হলেও সীমিত সম্পদেও অপব্যয় বা অপচয় করা সম্ভব। সম্পদ সীমিত হোক বা প্রাচুর্যতা থাকুক অহংকার ও লোভ, মানুষকে সম্পদের অপচয় বা অপব্যয়ে অলক্ষ্যে পরিচালিত করে। অপব্যয় বা অপচয় ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতর অবস্থানে উপনীত করে প্রাকৃতিক নিয়মেই। এছাড়া

www.pathagar.com

অপব্যয় বা অপচয় সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে কমাতে সাহায্য করে না বরং বাড়িয়ে দেয়। কোনো ব্যক্তি বা জাতিই অপচয়কারী হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাড়িয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই। সম্পদ ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের সব উল্লেখযোগ্য সভ্যতা। আল্লাহ মাথা উঁচু করে দাড়াঁনোর সূত্রই মানবজাতিকে জানিয়ে দিলেন আর সর্তক করলেন অহংকারী শয়তানের ধ্বংসের পথ, দারিদ্রতার পথ, ও পতনের পথকে এড়িয়ে চলতে।

৬. সম্পদ ব্যয়ে মধ্যপন্থী হওয়া ঃ ধন-সম্পদের ব্যাপারে মানুষের দুর্বলতার একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে সূরা তাকাসুর-এ। আল্লাহতায়ালা বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।" [সূরা তাকাসুর ১০২ ঃ আয়াত নং-১,২। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার মাঝে লুকিয়ে আছে কৃপনতা এবং উপর্যুপরি সম্পদ বৃদ্ধির মানসিকতা। মানসিকতাটি এতই তীব্র যে, কবরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত মানুষের এই প্রবণতার স্থায়ীত্ব। এই প্রবণতায় সম্পদ খরচের চেয়ে জমা করা বা পুঞ্জিভূত করা বা কৃপণতা করাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। এতে সম্পদ কিছু লোকের মাঝে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে কুফরির দিকে ধাবিত হতে পারে। "দারিদ্র কখনো কখনো কুফরি বা সত্য প্রত্যাখ্যানে পরিণত হতে পারে।" [আস-সূয়ুতি, 'আল-জামী আস-সগীর।'] কিংবা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন গুজরান করতে পারে। যা ইসলামের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের প্রতিকূল। ইসলাম সে ব্যক্তিকে মুমিন বলে স্বীকার করেনি, যার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে আর নিজে পেট পুরে খায়। "সে ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তার প্রতিবেশী যখন তার নিকটেই ক্ষুধার্ত রয়েছে, তখন সে পেট পুরে খায়।" [আল বাইহাকী, ইবনে আব্বাস বর্ণিত।] তাই সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহতায়ালা মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখোনা এবং তা সর্ম্পূণ প্রসারিতও করোনা, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।" [সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-২৯।]

মুসাআব ইবনে সা'দ র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলূল্লাহ! আমাকে অনুমতি তিন আমার যেখানে ইচ্ছা আমার যাবতীয় সম্পদ বন্টন করে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করলেন। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক বন্টন করে দেই? কিন্তু তাতেও তিনি রাজী হলেন না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ বন্টন করি? এবার তিনি নীরব রইলেন। এরপর এক-তৃতীয়াংশ [ওসিয়াত করা] জায়েয হয়ে গেলো।" [সহীহ মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীস নং-৬২৩৮/৪৩।] এই ছিলো রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজের সম্পদ ব্যয়ে মধ্যপন্থী হবার দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

৭. দারিদ্রের আশংকায় সন্তান হত্যা রোধ করা ঃ আল্লাহ খেলাচ্ছলে বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। বিশ্ব সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ বলেন, "আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।" [সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত নং-১৬।] আল্লাহ আরো বলেন, "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব আমরা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা সেগুলি সৃষ্টি করেছি সঠিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বোঝে না।" [সূরা দুখান ৪৪ ঃ আয়াত নং-৩৮, ৩৯।]

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি এক মহান উদ্দেশ্যে। যারা দারিদ্রের আশংকায় সন্তান হত্যার মত অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা একদিকে নিজেদের দায়িত্ব অবহেলার দায় প্রকারান্তরে সন্তানের উপর চাপায়, অন্যদিকে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ বলেন, "তারা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।" [সূরা বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং-৫৭।] তাদের দৃষ্টিতে সন্তান সম্পদ নয়, আপদ। অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ মাত্রই সম্পদ। মানুষ জন্ম থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। মানুষকে সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের এই সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা সন্তান হত্যায় লিপ্ত হই। অভাব বা অস্বচ্ছলতার আশংকায় বা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবকে কেন্দ্র করে যারা এ ধরণের হত্যায় লিপ্ত তাদের অধিকাংশই সম্পদের বিচারে অভাবী নন। তবে মানুষকে সম্পদে পরিণত করার এই কাজটুকু নিঃসন্দেহে ব্যক্তির একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতায় তা কেবল সম্ভব হতে পারে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "বিশ্বাসীরা একে অন্যের নিকট একটা ইমারত [এর অংশ] স্বরূপ, প্রত্যেক অংশ অপর অংশগুলোকে দৃঢ় করে।" [সহীহ আল বুখারী, আবু মূসা বর্ণিত।] সুতরাং সন্তান হত্যার মত পাপকর্ম হতে বেঁচে থাকতে ব্যক্তির ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকাও। রাসূল সা. যেমন সন্তান হত্যার মত এই খুনি মানসিকতাকে মানবিকতায় উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র তার নাগরিকদের যথাযথ দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল।

৮. ব্যভিচার ও ধর্ষণমুক্ত সমাজ নির্মাণ ঃ একজন মুসলিমকে আল্লাহতায়ালা ব্যভিচারের কাছে যেতেই নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আর ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" [সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৩২।] সেই সাথে এও আদেশ করেছেন, "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" [সূরা নূর ২৪ ঃ আয়াত নং-৩০।] ব্যভিচারের প্রতি এতটা সুস্পষ্ট নৈতিক অবস্থান পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নারীর মর্যাদার এই গ্যারান্টি, এই সুরক্ষা আর কে দিয়েছে ইসলাম ছাড়া? বর্তমানে নারীরা

www.pathagar.com

সমাজে প্রগতির দোহাই এবং অচলায়তন ভাঙ্গার উছিলায় যেভাবে নিজেদের খোলামেলা উপস্থাপন করছে তাতে একজন পুরুষের এবং একজন নারীর চোখের দৃষ্টি থেকে মস্তিস্কের নির্দেশে ডোপামিন নরএপিনেফ্রিন, ফিনাইল-ইথাল এমাইন এবং অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসরণ করে ক্রমাগত। দৃষ্টি ও দর্শন যত বাড়বে হরমোনের নিঃসরণ ততই বাড়বে আর এই হরমোনগুলো নারী-পুরচষের ভেতরে জৈবিক প্রয়োজন সৃষ্টি করবে। এটি সৃষ্টিগতভাবেই এমন। আল্লাহ যেভাবে তৈরি করেছেন তাকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। আর তাই পাশ্চাত্য জগতে নারীকে যতই দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করতে উন্মুক্ত হতে বলা হচ্ছে, ধর্ষণের মাত্রা ততই বাড়ছে। আর ব্যভিচারের মাত্রাতো কল্পনাতীত সংখ্যক। ফ্রি সেক্সের গোটা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর দিকে নজর দিলেই এর প্রমাণ মিলবে। গোটা পাশ্চাত্য আজ ব্যভিচারে সয়লাব। মুসলিম হিসেবে নিজেদের দর্শন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং পৌরানিক ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের প্রভাবে হীনমন্যতা রোগে আক্রান্ত বেশকিছু আদমশুমারী ভিত্তিক মুসলিম প্রধান দেশ ব্যাপকভাবে ব্যভিচার ও ধর্ষণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কেউ কেউ ধর্ষণের সেঞ্চুরীও উদযাপন করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারী মানুষ যেমন ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য-অখাদ্য বিবেচনাবোধ হারিয়ে ইতর প্রাণীর সাথে খাদ্য অন্বেষণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তেমনি স্খলিত কিছু নারী-পুরুষ যৌন দুর্ভিক্ষে এতটাই আক্রান্ত হয়েছে যে তা বর্ণনার অতীত। ব্যভিচার ও ধর্ষণ দিয়ে কোনো মানবিক ও উচ্চ নৈতিকতার সমাজ গঠন হয় না। প্রাইভেট পড়তে যাওয়া মেয়েদেরকে ব্ল্যাকমেইল করে শিক্ষক কর্তৃক ব্যাভিচার বা ধর্ষণ করার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সমাজ কি আদর্শ সমাজ? মেয়েটি, তার পিতামাতা, পরিবারের সকল সদস্যসহ সমাজের সকল বিবেকবান মানুষের কাছে এ ঘটনার যন্ত্রণার বোঝা হত্যার চেয়েও দুর্বহ। রাসূল [সা.]-এর আর্দশ সমাজে এসব সামাজিক অনাচারের কোনো স্থান ছিলনা।

৯] অনুনমোদিত হত্যাকা- বন্ধ করা ঃ হত্যার বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, "যে কোন লোক কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সে চিরকালই সেখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রতি অভিশাপ করেন এবং তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" [সূরা নিসা; ০৪ ঃ আয়াত নং-৯৩।] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আল্লাহতায়ালার কাছে অধিকতর সহজ।" [আত তিরমিযী, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং-১৩৯৫; ইবনে মাজাহ, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং- ২৬১৯।] হত্যা প্রধানতঃ তিনভাবে হতে পারে। এক. ইচ্ছাকৃত হত্যা; দুই. ভুলবশতঃ হত্যা; তিন. কারণবশতঃ হত্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ইচ্ছাকৃত হত্যাতেই কেবল মৃত্যুদ-প্রযোজ্য হবে।" [দারাকুতনী, আস-সুনান, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং-৪৫।] হত্যাকা- কতটা ভয়ানক ক্রোধ ও শাস্তির কারণ তা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট। আত্মহত্যা করাকেও আল্লাহতায়ালা হারাম করে দিয়েছেন। "শুধু পাচঁটি ক্ষেত্রে আল্লাহ হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। এক. ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে কিসাসের দ- হিসেবে হত্যা করা। দুই. যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমনকে হত্যা করা। তিন. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎপাটনের চেষ্টাকারীকে দ-স্বরূপ হত্যা করা। চার. বিবাহিত নারী-পুরুষকে, যারা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যভিচার করেছে; তার দ-স্বরূপ রজম করা। পাঁচ. মুরতাদকে দ-স্বরূপ হত্যা করা। তবে কোন ব্যক্তি বা দল নিজেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী নয়। এজন্য ইসলামী আদালতের রায় প্রয়োজন হবে।" [এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *দারসুল কুরআন সংকলন*-২, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা:৩৭-৩৮।] সার্বিক বিচারে একজন মুসলিম বেপোরোয়া জীবন-যাপন করতে পারে না। একজন মুসলিমকে এতটা সর্তক থাকতে হবে যে তাকে দিয়ে যেন কোন ইচ্ছাকৃততো দূরে থাক, কোনো ভুলবশতঃ হত্যাকা-ও যেন না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শুধু রাজনৈতিক মতপার্থক্যকের কারণে অন্যায় হত্যাকা- মামুলী ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

১০. এতিমের রক্ষক ঃ এতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ মানবিক সমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। মৃত্যু ও জীবনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, পরীক্ষা করে দেখতে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ বলেন, "মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?" [সূরা মুল্ক ৬৭ ঃ আয়াত নং-১ ও ২] মৃত্যুর কারণে অভিভাবকহীন সন্তানই এতিম। আর মৃত্যু আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে সন্তান অসহায় ও এতিম হলো আল্লাহতায়ালা তার দায়িত্ব নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে মানবিক সমাজ গঠনে সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় কী তা বলে দিলেন। সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে এতিমের অভিভাকত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে এতিমের সম্পদের রক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এতিমের রক্ষক, ভক্ষক নয়; এমনি একটি মানবিক সমাজ গড়েছিলেন রাসূল সা.।

১১. ওয়াদা পালনকারী নাগরিক তৈরী ঃ প্রতিশ্রুতি পালন যে শান্তিতে জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য উপাদান সচেতন যে কোন নাগরিককে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। নবী সা. যে গতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তা ওয়াদা পালনের মতো মহৎ গুণটির কারণেই। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যখন ওয়াদা পালনকারীকে বোকা এবং ওয়াদা খেলাপকারীকে বাহাদুর মনে করার মত সামাজিক প্রবণতা কোন সমাজে দেখা যায়, তখন বোধগম্য কারণেই সমাজে ওয়াদা খেলাপকারী, ঋণখেলাপকারী ইত্যাদি নানা খেলাপকারীর জ্যামিতিক হারে পয়দা হতে থাকে। আর এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না যে, সে সমাজে শান্তি সোনার হরিণে পরিণত হয় এবং সে সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সমাজকে এতটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে খাবি খেতে দিতে ইসলাম মোটেই পছন্দ করেনি। সমাজের

www.pathagar.com

শান্তি বিনষ্টকারী এই কুঅভ্যাসকে ইসলাম কঠোর জবাবদিহির বিষয় বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ওয়াদাপালনকারী নাগরিক তৈরীতে সক্ষম হয়েছিলেন রাসূল [সা.]।

১২. পূর্ণমাপে প্রদানের সংরক্ষক ঃ মাপে কম না দেয়া বা পূর্ণ মাপে দেয়ার বিষয়টি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। মাপের বিষয়টি শুধু ব্যবসা সংশ্লিষ্ট নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, আন্তর্জাতিক, ব্যবসায়িক জীবনের সব ক্ষেত্রেই রয়েছে লেনদেন। আর লেনদেন মানেই পরিমাপ। হয় কম বা বেশী। ইসলাম সকল প্রকার লেনদেনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে পূর্ণমাপে তার প্রাপ্য প্রদানের কথা বলেছে। যদি বাস্তবিকই তা আমরা করতে সক্ষম হই তবে পৃথিবীতে সুবিচার এতটা দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠবে না; যতটা এখন আমরা পাই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে পূর্ণমাপে লেনদেন করার বিষয়টি যদি ধরে নেয়া হয় যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে তবে পৃথিবীতে শান্তির দুলর্ভতা দূর হয়ে যেত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছি। মিথ্যাচার করা প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের মাপে কম দেয়া, মানুষকে ঠকানো। রাসূল সা. তাঁর গড়া সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্র হতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে পরিমাপে কম দিয়ে ঠকানোর অনৈতিক অমার্জনীয় অমানবিক গুরচতর অপরাধকে অংকুরেই মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৩. যাচাইকৃত তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণকারী ঃ তথ্যকে যাচাই না করেই ঘটনার প্রতিকারে লেগে যাওয়া কিংবা তথ্যকে যাচাই না করেই কারো বিরুদ্ধে বা কোনো সম্প্রদায়ের বিরচদ্ধে বা কোনো জাতির বিরচদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় দিয়ে যাচাই করে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে বিবেকসম্মত উপযুক্ত মতামত বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এতে অন্যের সম্মান ও মর্যাদায় অবাঁচীনের মত অহেতুক আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকা যায়। বিনা কারণে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অভদ্রতা ও ইতর সদৃশ আচরণ থেকে দূরে থাকা যায়। একইভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সা. ও নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে না জেনে কোন মন্তব্য করা, চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় থাকা সত্বেও এক ধরণের অন্ধত্ব। ইসলাম জ্ঞানভিত্তিক আচরণ বা চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় দিয়ে যাচাই করা পরিশীলিত আচরণ করতেই মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছে। রাসূল সা. তার প্রতিষ্ঠিত সমাজে এ ধরণের যাচাইভিত্তিক আচরণের প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই সে সমাজ সোনালী সমাজে পরিণত হয়েছিল।

১৪] দাম্ভিকতা নয় বিনয়ী ঃ যত বিশাল পরাশক্তির কর্ণধার হউন না কেন, এককভাবে কোন মানুষতো নয়ই; পৃথিবীর সব মানুষের পদভারেও পৃথিবী বিদীর্ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবমাত্র। [সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৭০।] সুতরাং দম্ভভরে চলার কোন যুক্তিসংগত কারণ মানুষের নেই। তারপরও মানুষ

www.pathagar.com

অহেতুক গর্ব অহংকারে মত্ত হই। আর এই অহংকারই পৃথিবীতে সকল ধরণের বৈষম্য সৃষ্টির উৎস। সকল ধরণের অনৈক্যের ও অশান্তির কারণ। বিশ্বের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের কারণও এটি - তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর অহংকার। দুই বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছিল। এ সবই পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় দর্শনের অসামান্য উপহার। অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে আহ্বান করেছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের দিকে। তিনিই সব মানুষের রব বা প্রতিপালক, মালিক এবং সৃষ্টিকর্তা। অহংকার করার অধিকার শুধু আল্লাহর। অহংকার মানুষের জন্য শোভনীয় নয়, বিনয়ী হওয়াই মানুষের সাজে। রাসূল সা. মানুষকে বিনয়ী হতেই শিক্ষা দিয়েছেন। বিনয়ী মানুষ দিয়ে তিনি তৈরী করেছিলেন এক অতুলনীয় মানবিক সমাজ।

এক অসামান্য মানবিকতায় পূর্ণ সমাজ আজও গড়ে তোলা সম্ভব যদি রাসূল [সা.] অনুসৃত উপরোল্লেখিত নীতিমালাসমূহকে আমরা বাস্তবে রূপদানে সক্ষম হই। সোনালী সমাজ গড়তে চাইলে, চোরের খনিকে সোনার খনিতে পরিণত করতে চাইলে, কুরআনে বর্ণিত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুসৃত এসব আসমানী দিকনির্দেশনাগুলোই একমাত্র নিয়ামক।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সেই কাংখিত আদর্শিক সমাজ গড়ে তুলতে অবদান রাখার সাহস দিন, শক্তি যোগান, অবিচল ঈমান দিন। আমীন। ■

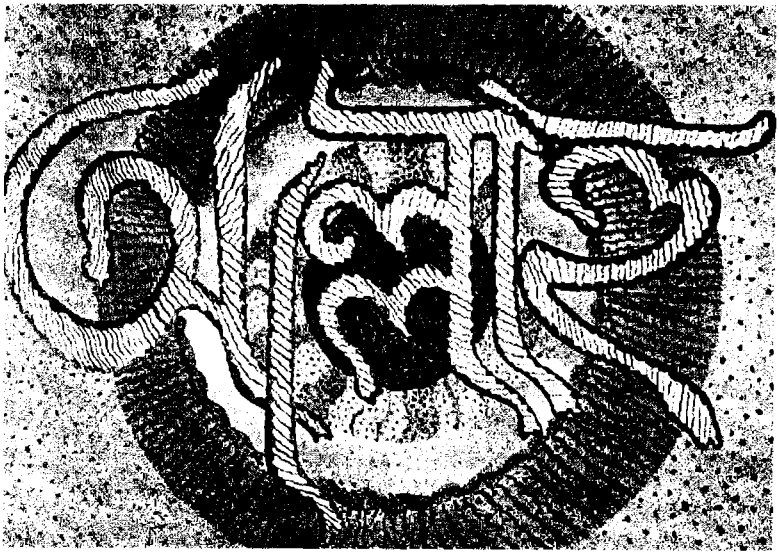

www.pathagar.com

আজও প্রয়োজন রাসূলের [সা] অনুসরণ

সাদী রায়হান

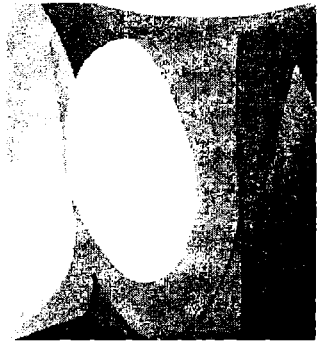

মহামহিম আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রাসূল [সা]-কে নির্বাচিত করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাত– উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ আল্লাহর প্রিয় হাবিবের [সা] বিশুদ্ধ অনুসরণ। আজকের এই আধুনিকতার উৎকর্ষের মধ্যেও আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, আল্লাহর রাসূল [সা] তাঁর ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি যে বিপ্লবী কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই অনুসৃত দিকগুলো বর্তমানের আধুনিকতার চেয়েও অত্যাধুনিক ছিল। সোনালি সুদিন উপহার দিয়েছিলেন তিনি। বলতে গেলে খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর বুকে এমন একটি কালজয়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন, এমন একটি বিশ্বায়নের রূপরেখা নির্মাণ করলেন যে সেই সময় পৃথিবীর অন্য আর কোথাও দ্বিতীয়টি তার নজির ছিল না। আজও নেই। রাসূল [সা] ছাড়া এমন আর কোনো দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়কের নাম পাওয়া যাবে না যিনি সার্বিক বিচারে সকল ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রে সফলতার দাবি করতে পারেন।

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ এবং তাঁর মহান আদর্শ ও তত্ত্বাবধানে এমন একটি সাহাবী-কাফেলা গড়ে উঠলো– যারা ঈমান, আমল, আখলাক এবং সার্বিক যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যে কারণে রাসূল-পরবর্তী সময়েও এই সত্যের মুজাহিদরা [রা] রাসূল-নির্দেশিত আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। বাহুবলের চেয়েও তাঁদের ছিল আদর্শ ও সত্য-ন্যায়ের তীব্র-তীক্ষ্ণ অস্ত্র। যার সম্মুখে অপরাপর কায়েমী শক্তিও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

এ কথা ইতিহাস স্বীকৃত যে, রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও কল্যাণ-রাষ্ট্র আজও পৃথিবীর বুকে মাইল ফলক হয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। হবেও না কখনো। রাসূলের [সা] যে মহান আদর্শিক বিপ-বের কারণে তৎকালীন একটি বর্বর ও অসভ্য সমাজ সোনায় পরিণত হয়েছিল, আজও যদি তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই বর্তমানের দাবানলসম এই অশান্ত পৃথিবীর বুকে প্রশান্তির প্রবাহ বইয়ে দেয়া সম্ভব্।

পৃথিবীকে আলোকময় ও অর্থবহ করে তোলার জন্য আজও প্রয়োজন রাসূলের [সা] অনুসরণ। প্রয়োজন আল কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার। আল্লাহ মনোনীত এবং রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত সত্য, সুন্দর, শাশ্বত দীনকে মানুষের সামনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুগোপযোগী করে তুলে ধরতে পারলে এবং মানুষের মন-মগজ থেকে বস্তুতান্ত্রিক ও জাগতিক দুর্ভার দূর করতে পারলে এখনও সার্বিক সফলতা আসা সম্ভব। এবং খুবই সম্ভব রাসূল [সা] নির্দেশিত সেই আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা।

কোনো সীমিত পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কিছু দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিবকে প্রেরণ করেননি। রাসূলকে [সা] প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বজাহানের যাবতীয় কল্যাণের জন্য। সুতরাং তাঁর কাজ ও কর্তব্যের পরিধিও ব্যাপক-বিশাল। সসীম জীবনে তিনি অসীম ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আমাদেরকে ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহকেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের [সা] জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" [সূরা আহযাব : ২১] সুতরাং রাসূলুল্লাহর [সা] কাঙ্ক্ষিত সেই আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ়। ■

www.pathagar.com

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়য়াতুর রিদওয়ান

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

হিজরতের পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে মক্কার পৌত্তলিকেরা সব ধরনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা তাদের প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারেনি। মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়ও মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু তাদের বিরোধিতা ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারেনি। উপরন্ত মক্কার কুরাইশরা, পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলো এবং ইহুদিদের সমন্বয়ে সম্মিলিত শিক্ত পঞ্চম হিজরিতে/৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে তাদের মনোবল অনেকাংশে ভেঙে পড়ে। তারা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিল, ইসলাম পৃথিবীর বুকে স্থায়ী হতে এসেছে এবং মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অপর দিকে মুসলমানেরা পরিখার যুদ্ধের পরে কাবাগৃহ দর্শনে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় মহানবী [সা] ষষ্ঠ হিজরিতে/৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে চৌদ্দ শত মতান্তরে-পনেরো শত

www.pathagar.com

মুহাজির ও আনসার সাহাবি নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা ইহ্?রাম বাঁধা অবস্থায় ৭০টি কোরবানির উট সাথে নিয়ে তাঁদের যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তাঁরা কেবলমাত্র খাপবন্ধ তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র সাথে নেননি। মক্কাবাসী তাঁদের এই আগমন সংবাদ পেয়ে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠায়। মুসলমানেরা অন্য রাস্তা ধরে মক্কার অনতি দূরে হুদাইবিদা নামক স্থানে উপনীত হন। মহানবী [সা] দূত মারফত জানতে পারেন, মক্কাবাসী কোনোক্রমেই তাঁদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দেবে না। কাজেই তিনি তাঁর সহচরদের ওই স্থানে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। উভয় পক্ষে দূত বিনিময়ের ফলে শেষে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে এটি হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। দূত হিসাবে খুজায়া গোত্রের বুদাইল ও হজরত উসমান [রা] মুসলমানদের পক্ষে এবং উরওয়া ও সুহাইল বিন আমর মক্কাবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, হজরত উসমানের দূতিয়ালির সময় গুজব ওঠে, মক্কাবাসী হজরত উসমানকে হত্যা করেছে। এই সংবাদ পৌঁছামাত্র মুসলমানেরা একটি গাছের নিচে মহানবী [সা]-এর কাছে শপথগ্রহণ করেন যে, হজরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে তাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন না। ইতোমধ্যে হজরত উসমান হত্যার খবর মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বায়য়াত বা শপথকে বায়য়াত উর রিদওয়ান বা স্থানষ্টির শপথ হিসাবে পরিচিত। এই সন্ধিপত্রের লেখক ছিলেন হজরত আলী [রা]। সন্ধির প্রধান ধারাগুলো নিম্নে দেয়া হলো–

এক. কোনো উমরা বা হজ পালন না করে এই বছর মুসলমানদেরকে ফিরে যেতে হবে।

দুই. পরবর্তী বছর হজ পালনের উদ্দেশ্যে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন এবং এই তিন দিনের জন্য মক্কাবাসী তাদের জন্য শহরের বাড়ি ঘর খালি করে দেবে।

তিন. আত্মরক্ষার জন্য খাপবদ্ধ তরবারি ব্যতীত তাঁরা কোনো যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে না।

চার. যদি মক্কায় কোনো মুসলমান থেকে যায় তাহলে তারা তাদের সাথে নিয়ে পেতে পারবে না। অপর পক্ষে তাদের মধ্য থেকে কোনো মুসলমান মক্কায় থাকতে চাইলে তারা তাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

পাঁচ. যদি কোনো মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের কাছে চলে যায় তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মদিনাবাসী কোনো মুসলমান মক্কায় চলে এলে তাকে মদিনায় ফেরত দেয়া হবে না।

ছয়. প্রতিবেশী বেদুইন গোত্রগুলো তাদের ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো পক্ষের মুসলমান অথবা মক্কাবাসীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। কেউ তাদের কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

সাত. এই সন্ধি দশ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এই সময়কালে যুদ্ধ ও সামরিক উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

www.pathagar.com

সন্ধির প্রতিক্রিয়া : বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে হয়েছিল। কাজেই তাঁরা এই সন্ধি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেননি। হজরত উমর [রা] প্রকাশ্যে সন্ধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহানবী [সা] এই সন্ধির সুদূরপ্রসারী ফল অনুধাবন করে তাতে রাজি হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও সন্ধি সম্পাদনের অল্পক্ষণ পরে এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল। মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সুহাইল বিন আমরের ছেলে আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীর অসহনীয় অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মহানবী [সা]–এর নিকট উপস্থিত হন। সন্ধির শর্তানুযায়ী মহানবী [সা] তার কষ্ট অনুভব করা সত্ত্বেও তাকে মক্কাবাসীর কাছে ফেরত দেন। মুসলমানেরা সন্ধি শেষে ওই স্থানে কোরবানি করে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতমধ্যে এই সন্ধিকে নিরঙ্কুশ বিজয় হিসাবে অভিহত করে আল্লাহ মহানবী [সা]–এর কাছে ওহি পাঠান। এতে হজরত উমরসহ সবাই সন্তুষ্ট হন।

সন্ধির ফলাফল ও তাৎপর্য : প্রথমত, এই সন্ধি প্রমাণ করেছিল, মক্কার পৌত্তলিকেরা মুসলমানদের শক্তিসমকক্ষ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই সন্ধি বেদুইন গোত্রগুলোকে মহানবী [সা]–এর সাথে সম্পর্ক ও মিত্রতা স্থাপন করার প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে খুজায়া গোত্র মুসলমানদের সাথে এবং বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল।

দ্বিতীয়ত, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে মহানবী [সা] নির্বিঘ্নে চর্তুদিকে ইসলাম প্রচার করার মহাসুযোগ গ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে মদিনার বাইরের বিভিন্ন গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, এই সন্ধির শর্তানুযায়ী মক্কা থেকে আগত নবদীক্ষিত মুসলমানদের মহানবী [সা] মক্কাবাসীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবু জান্দাল ও উতবা প্রমুখ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। এসব ব্যক্তি যেকোনো প্রকারে প্রহরীদের কাবু করে মক্কা যাওয়ার পরিবর্তে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ইস' নামক এক জঙ্গলে আত্মগোপন করতে লাগলেন এবং সেখানে তারা বসতি স্থাপন করলেন। তারা তাদের জীবন-জীবিকা পরিচালনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হতে প্রত্যাগত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার ওপর আক্রমণ করে দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করতেন। এটি মক্কাবাসীর জন্য বিপজ্জনক হযেয় দাঁড়ায়। এতে তারা এই ধারাটি বাদ দেয়ার জন্য মহানবী [সা] কে অনুরোধ জানায়। সন্ধির এই ধারাটি বাদ দেয়ার ফলে নবদীক্ষিত মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পায়।

শেষমেশ, এই সন্ধির অপর একটি ধারা অনুযায়ী বনু বকর কুরাইশদের সাথে এবং বনু খুজায়া মুসলমানদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল। মক্কার কুরাইশেরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার পর থেকে ইসলামের প্রসার দেখে চুপ থাকতে পারেনি। তারা যেকোনো অজুহাতে এই সন্ধি ভঙ্গ করার পথ খুঁজেছিল। এই দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই তাদের প্ররোচনায় বনু বকরের লোকেরা অতর্কিতে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে মহানবী [সা]–এর মিত্রগোত্রের বনু খোজায়ার

www.pathagar.com

নরনারীকে হত্যা করে এবং তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। মহানবী [সা] কুরাইশদের কাছে এ ঘটনার জন্য তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। সেগুলো হলো বনু বকর গোত্রকে খুজায়া গোত্রের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে কুরাইশদের মিত্রতা হতে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরকে মহানবী [সা]-এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এই দু'টি প্রস্তাবের একটিও মেনে না নিলে শেষ বিকল্প হিসাবে এই সন্ধিচুক্তি [হুদাইবিয়ার] বাতিল বলে গণ্য হবে।

কুরাইশরা শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। মহানবী [সা] তাঁর মিত্রগোত্র বনু খুজায়ার ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবিধান মক্কাবাসীর ঔদ্ধত্যের জবাব দেয়ার প্রয়াসে অষ্টম হিজরি/৬০০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কাবাসী বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে। বিনা রক্তপাতে এই মহাবিজয় সাধিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির বিরল। কাজেই দেখা যায়, দু'বছর আগে অবতীর্ণ ওহি যে নিরঙ্কুশ বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল তা হুদায়বিয়া সন্ধির বিশেষ ফল হিসাবে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মক্কা বিজয়ের পটভূমি হিসাবে অভিহিত করা যায়। ■

www.pathagar.com

অধীনস্তদের সম্পর্কে প্রিয় নবী [সা]

মাওলানা হাবীবুর রহমান খান

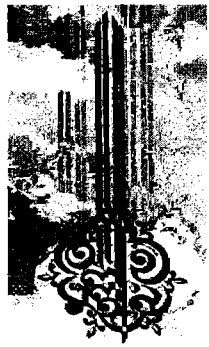

আল্লাহ তায়ালা সব মানুষকে সমান আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ জন্যই তো চাকর-চাকরানী সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে কাজ করতে আসে। কিন্তু ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নিয়োগকারীর ওপর তাদের অধিকারও শরিয়ত নির্ধারিত করেছে। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীতে কোনো মানুষ তার পুরো কাজ একা আঞ্জাম দিতে পারে না, বিশেষত এ জটিল শিল্পায়নের যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বিভিন্ন স্বরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সব দায়িত্বশীল ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম-অত্যাচার না করে। আজকের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা নেই সত্য, তবে অধীনস্থদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার অহরহ চালু আছে। ইসলাম চাকর-চাকরানীদের প্রতি সুন্দর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে ওদের মর্যাদা দিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী [সা] এরশাদ করেন, 'তোমাদের চাকর, নকর বা দাস-দাসী প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে অধীনস্ত করে দিয়েছেন তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। তাকে এমন কর্মভার দেবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার ওপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তার ওপর সাহায্যের হাত প্রসারিত করা হয়।' [বুখারি, মুসলিম]

দু:খের সাথে বলতে হয়, আমাদের সমাজে অনেক লোককেই দেখা যায় তারা তাদের চাকর-চাকরানীর সাথে অশ-ীল কথা বলে, অথচ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রতিটি মানুষকে জীবনের সাফল্য অর্জন করতে হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই চাকর-চাকরানীর সাথে অশ্লীল কথা বলা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'যাদের জীবনসাধনা সার্থক, সুন্দর, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে।' [সুরায়ে মুমিনুন]

তাই প্রকৃত মুসলিম কখনোই জীবনের মূল্যবান সময় অশ্লীল কথা ও বেহুদা কর্মে বিনষ্ট করে না। প্রিয় নবী [সা] তার অধীনস্তদের সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী [সা]-এর খাদমে হজরত আনাস [রা]-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর প্রিয় নবী [সা]-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো 'উহ' শব্দটি বলেননি এবং কোনো দিন বলেননি এটা করোনি কেন? ওটা করোনি কেন? আমার অনেক কাজ তিনি নিজে করে দিতেন [মিশকাত]।

প্রিয় নবী [সা]-এর অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, হজরত জায়েদ [রা] সারা জীবন প্রিয় নবীর কাছে ছিলেন। মনে হতো যেন সে প্রিয় নবীর পুত্র। জায়েদ প্রিয় নবীর পুত্রের মতো আদরযত্নে বড় হয়েছেন। প্রাণঢালা স্নেহ পেয়েছেন প্রিয় নবীর। বড় হলে প্রিয় নবী [সা] আপন চাচাতো বোন জয়নবের সাথে বিয়ে দিলেন জায়েদের। পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করে নিলেন জায়েদকে। জায়েদ ক্রীতদাস হিসাবে এসেছিলেন প্রিয় নবী [সা]-এর সংসারে। কিন্তু একবারও মনে করলেন না সে কথা। প্রিয় নবী [সা] জায়েদের ছেলে উসামাকে খুব আদর করতেন। মনে হতো নাতি ইমাম হাসান ও হোসাইনের মতোই আপন। আমাদের সমাজের অনেক মালিককে দেখা যায়, তারা তাদের অধীনস্ত চাকর-চাকরানীদের সাথে খারাপ ব্যবহার তো করেই সাথে সাথে তাদের বিভিন্নভাবে প্রহার করে, যা আদিম যুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়ে দেয়। অথচ হাদিসে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। চাকর-চাকরানীর প্রতি জুলুমকারীকে কিয়ামতের দিবসে তার পরিণাম দেয়া হবে। হজরত আবু হোরায়রা [রা] বলেন, প্রিয় নবী [সা] ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে স্বীয় চাকর-চাকরানীকে প্রহার করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার পরিণাম দেয়া হবে [বায়হাকি, শোয়াবুল ঈমান]। হজরত কাব ইবনে উজরা [রা] বলেন, প্রিয় নবী [সা] ইরশাদ করেন, 'তোমাদের থালা-বাটি চাকর-চাকরানীর হাতে ভেঙে গেলে তাদের মারধর করবে না। কেননা তোমাদের আয়ুষ্কাল যেমন নির্ধারিত, থালা-বাটিরও তদ্রূপ।' [দায়লামি]

www.pathagar.com

প্রিয় নবী [সা]-এর হাদিস থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষের আয়ুষ্কাল শেষ হলে যেমন সে মরে যাবে, তদ্রূপ থালা-বাটিও ভেঙে যায়। এ জন্য চাকর-চাকরানীদের মারধর করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, তবে আদব শিক্ষার্থে মারধর করাতে দোষণীয় বলতে কিছু নেই। চাকর-চাকরানী সম্পর্কে প্রিয় নবী [সা]-এর শেষ অসিয়ত ছিল তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে। হজরত জাবের [রা] বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী [সা] বলেছেন, যার মাঝে তিনটি গুণের সমাবেশ হবে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।' গুণ তিনটি হচ্ছে- ১. দুর্বলের সাথে বিনয় ব্যবহার; ২. মাতা-পিতার সাথে ভালোবাসা; ৩. স্বীয় চাকর-চাকরানীর সাথে সদাচরণ।

ওপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক মানুষেরই উচিত ইসলামী আদর্শে চাকর-চাকরানীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। আর প্রত্যেক মনিবেরই মনে করা উচিত চাকর-চাকরানীও সব মানুষের মতোই একজন মানুষ। পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের সমাজ থেকে যদি চাকর-চাকরানীর ভেদরেখা মুছে যেত তাহলে প্রতিটি পরিবারই প্রিয় নবী [সা]-এর পরিবারের মতো সুন্দর, সুখী ও আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে উঠত আর দেশের ও সমাজের অনেক অমঙ্গলই কেটে যেয়ে প্রতিটি পরিবারে শানি- নেমে আসত। ■

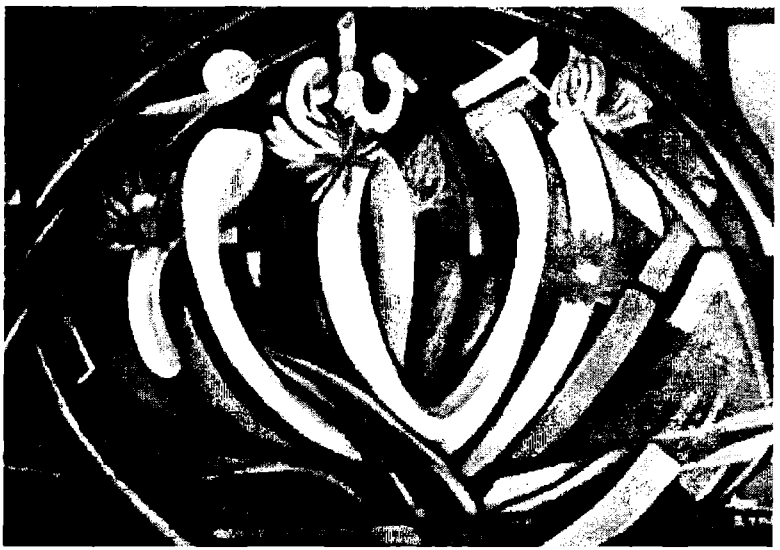

www.pathagar.com

রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ [সা]

মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী

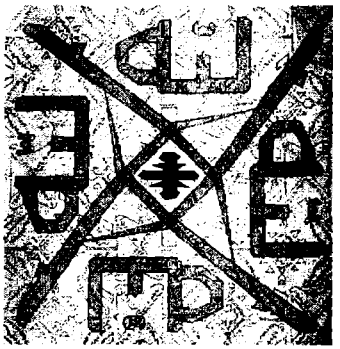

ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পন্ন ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। মুহাম্মদ [সা] ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য সর্বযুগের সর্বক্ষেত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন সবার জন্য 'উসওয়াতুন হাসানাহ' তথা অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও মানবজাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, মুক্তির দিশারী এবং বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের সুমহান সেনাপতি। এক কথায়, গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য তিনি ছিলেন এক অনুকরণীয় মডেল বা আদর্শের দর্পণ।

আদর্শ রাষ্ট্রগঠন : ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবসহ সমকালীন বিশ্ব ছিল তমসাচ্ছন্ন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। বিশেষত আরবে সুসংগঠিত কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক গোত্রপিত ছিল নিজ গোত্রের শাসনকর্তা। কোনো গোত্রই অপর গোত্রের কর্তৃত্ব ও অধীনতা মেনে নিত না। ফলে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এ অবস্থায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ [সা] সমগ্র বিশ্বের আদর্শরূপে খোদায়ী বিধানের আলোকে মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

গোড়াপত্তন করেন, যা মানবতা হিসাবে সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। ঘোষণা করেন মানবাধিকারের সার্বজনীন দলিল। বর্ণ, বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নয়, সৎকর্ম ও মহান স্রষ্টার প্রতি নিষ্ঠার মানদণ্ডে মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হয়। নারী জাতির ন্যায্য ও যথার্থ অধিকার বাস্তবায়িত হয়। বস্তুত হজরত মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত মদিনার এ রাষ্ট্রব্যবস্থাই ছিল গোটা বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক ইসলামি রাষ্ট্র।

সর্বাত্মক ঐক্য প্রতিষ্ঠা : হজরত মহানবী [সা] মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তিশালী করে বিশ্বশান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা জরুরি মনে করেন এবং একটি লিখিত সংবিধান রচনা করেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক অর্থে সংবিধান। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে হজরত মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রই এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সে ইসলামি রাষ্ট্রের সফল ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন হজরত মহানবী [সা]।

মহানবী [সা]-এর শাসননীতির মূল ভিত্তি : হজরত মহানবী [সা]-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য ছিল একটি মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো। ছিল একটি শক্তিশালী সচিবালয়। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দেশ শাসনের মূলনীতি ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আঘাত। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আধিপত্য বিস্তার ও রাজ্য দখল তাঁর নীতি ছিল না। দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জনগণকে অত্যাচার, নির্যাতন থেকে বাঁচানোই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তাই মহানবী [সা] অন্যায়ের প্রতিরোধে ন্যায়ের অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন।

সম্প্রীতি স্থাপন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা : সামপ্রদায়িক সমপ্রীতি স্থাপনে খাতিমুন্নাবিয়ীন হজরত মুহাম্মদ [সা] যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের একজনের জন্য অন্যজনের জান-মাল, ইজ্জত হরণ করা সম্পূর্ণ হারাম।' তিনি আরো ঘোষণা করেন, 'জেনে রেখ বর্ণ-বংশ ও অঞ্চল নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত।' তিনি সবাইকে 'মদিনাবাসী' আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রে ঐক্য-সমপ্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। সমপ্রীতি স্থাপনে বাধার দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস এ জন্য হয়েছিল যে, তাদের অভিজাত শ্রেণী চুরি করলে ছেড়ে দেয়া হতো এবং দুর্বল তথা অনভিজাত শ্রেণী চুরি করলে শাস্তি দেয়া হতো। আল্লাহর কসম, আমার শাসনামলে যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করে তবু তার হাত কেটে দেয়া হবে। হজরত মহানবী [সা]-এর ইনসাফপূর্ণ প্রশাসনিক নীতিমালার ওপর বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে, যা নিম্নের ছোট একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ঘটনাটি হলো : খুনের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎকালীন অন্ধকার যুগরে নীতি ছিল, খুনের প্রতিশোধের দাবি বংশানুক্রমে তত দিন পর্যন্ত চলবে যত দিন পর্যন্ত তা উসুল করা না হবে। অথচ এ নীতিটি ছিল সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

ভ্রান্ত। তাই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সাথে সাথে এ ভ্রান্ত নীতি বাতিল করে প্রিয়নবী [সা] ঘোষণা করলেন যে, আমার নিকটতম আত্মীয় রাবিয়া নামক ব্যক্তির খুনের প্রতিশোধ আমার কাছে জমা রয়েছে। আজ ন্যায় প্রতিষ্ঠার সূচনাতে আমার সেই আপনজনের প্রতিশোধ গ্রহণে বিগত অন্যায় নীতিকে সর্বাগ্রে বাতিল ঘোষণা করলাম।

রাসূল [সা]-এর পররাষ্ট্রনীতি : রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রের মহানবী [সা]-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত বিরল রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। তিনি প্রথমেই মদিনাকে বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। হজরত মহানবী [সা] সব সময় চেষ্টা করতেন বহির্বিশ্বের সাথে তাঁর সম্পর্ক যেন ভালো থাকে। বিশেষ করে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে ইসলামের সুনাম ও বিসৃতি বাড়িয়ে দেন। হজরত মহানবী [সা] পরাশক্তিগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বরদাশত করতেন না। তিনি কখনো নতজানু ও দুর্বল তোষামোদী পররাষ্ট্রনীতিকে প্রশ্রয় দেননি।

বিচারকার্যের মূল বৈশিষ্ট্য : হজরত মহানবী [সা]-এর বিচারকার্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার করার সময় বাদি-বিবাদি উভয়পক্ষের কথাবার্তা যথাযথ শুনে এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে ফয়সালা করা। অর্থাৎ তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সংশয়মুক্ত।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হজরত রাসূলুল্লাহ [সা] মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা [সা] সর্বপ্রথম মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ঘোষণা করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার-অবিচার, নির্যাতন নেমে এসেছিল, এতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল। কাফের-মুশরিকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাহমাতুল্লিল আলামিন মদিনায় হিজরত করেছিলেন। এত অত্যাচার সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের পর হজরত নবীজী [সা] সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ইসলামে মানসম্মান বা ইজ্জত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পরস্পরের জানমাল ও ইজ্জত, সম্ভ্রমের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক নিরন্ন বাস্তহারা বঞ্চিতদেরও অধিকার ইসলামি মানবাধিকারে সংরক্ষিত। তাই ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার হক যার যার কাছে পৌঁছে দেয়ার বিধান ইসলামি রাষ্ট্রেই রয়েছে।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় হজরত মহানবী [সা] ইসলামই সর্বপ্রথম নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। জাহেলেয়াতের যুগে যখন কন্যাশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো, তখন মহানবী [সা] ঘোষণা করলেন, তোমরা কন্যাশিশুকে হত্যা করো না, ইসলাম নারীকে পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দান করেছে। অথচ এর আগে কোনো ধর্মেই সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেয়া হয়নি। সুতরাং নারীরা ইসলামি বিধান ও হজরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ দ্বারা অনেক বেশি সুরক্ষিত ও সম্মানিত হয়েছে, এটা অকাট্য সত্য।

www.pathagar.com

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সত্য ও ন্যায়নীতির সংগ্রাম : হজরত মহানবী [সা] যুদ্ধ-জিহাদ চাইতেন না। কিন্তু মজলুমকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি তাঁর ২৩ বছরের নবুয়াতি জিন্দিগেতে অনেক যুদ্ধ-জিহাদ করেছেন। ২৭টি যুদ্ধে তিনি সরাসরি সেনা নায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তাঁর যুদ্ধনীতি ছিল একমাত্র মানবতার কল্যাণ ও শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেছেন, 'কখনো আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না, নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর শরণাপন্ন হও। জেনে রেখো! শান্তি যখন বিপর্যস্ত হবে, তখন তরবারির ছায়ার নিচে জান্নাত।'

শেষ কথা : মুসলিম উম্মাহ আজ রাজনৈতিকভাবে বহুধা বিভক্ত। বেশির ভাগ মুসলিম রাষ্ট্রই আজ রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট। ফলে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি সব কিছুই পশ্চিমা ব্যবস্থায় প্রভাবিত। মুসলিম বিশ্বের পররাষ্ট্রনীতি আজ আধিপত্যবাদী পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদি-খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে মুসলিম দেশগুলোতে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

বর্তমানে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন না থাকায় রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতাসহ সব ক্ষেত্রের অধপতন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে গুম-হত্যা, অপহরণ, হানাহানি-সন্ত্রাস, শোষণ-দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, অরাজকতা, পাপাচার জুলুম-অত্যাচার, মিথ্যা, সুদ-ঘুষ ও চরম নৈতিক অবক্ষয়ের জোয়ার সুসভ্য জাতিকে নামিয়ে এনেছে পশুত্বের স্তরে। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মানবতার মুক্তির দূত হজরত মহানবী [সা]-এর আদর্শের অনুসরণে খেলাফত পদ্ধতির সরকারের বিকল্প নেই। একমাত্র ইসলাম ও বিশ্বনবী [সা]-এর আদর্শের অনুসরণ এবং বাস্তবায়নই শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কুরআন-সুন্নাহকে ধারণ করতে হবে। ■

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] এর যৌবনকাল

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

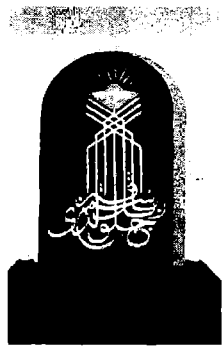

এই জগতে অনেক মহামানব অবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এক-এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ত লাভ করেছেন। কিন্তু মহত্তের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করছেন কেবলমাত্র একজন। তিনি আমাদের প্রিয়নবী মানবতারবন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ [সা]-এ জন্য ফরাসী লেখক আলফ্রেড দে-লামার্টিন তাঁর তুর্কীও ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন- "দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম-প্রচারক, যোদ্ধা, আইন-রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম-পদ্ধতির সংস্থাপক, মুহাম্মদকে [সা] মানুষের মহত্তের যতগুলি মাপকাটি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে মহৎ হতে পারবে না" এই জন্য তাঁকে বলা হয় অতি মহামানব- "খাইরুল বাশার"। মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি শুধু মুসলমানদেরই স্বীকৃত কোন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র

www.pathagar.com

পথ প্রদর্শক। স্থান-কাল-বর্ণ-গোত্র কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন এটা শুধুমাত্র তাকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। এই মহামানব আরবের এক বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারে, নির্মল স্বভাব বিশিষ্ট এক ব্যতিক্রমী শিশু পিতৃহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এক জনৈকা দরিদ্য ও সুশীলা ধাত্রীর দুধ খেয়ে গ্রামের সুস্থ ও অকৃত্রিম পরিবেশে প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হয়ে বেড়ে ওঠে। সে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মরুভূমিতে ছুটাছুটি করতে করতে জীবনের কর্মক্ষেত্রে কঠিন বিপদ মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ছাগল ভেড়া চরিয়ে চরিয়ে এক বিশ্বজোড়া জাতির নেতৃত্ব দেয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। শৈশবের পুরো সময়টা অতিবাহিত কারার আগেই এই ব্যতিক্রমী শিশু মায়ের স্নেহময় ছায়া থেকেও বঞ্চিত হয়। দাদার ব্যক্তিত্ব পিতামাতার এই শূন্যতা খানিকটা পূরণ করতে পারলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই এই আশ্রয়ও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে চাচা হন অভিভাবক। এ যেন কোন পার্থিব আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী না হয়ে একমাত্র আসল মনিবের আশ্রয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি পর্ব।

যৌবনে পদার্পন

এখানে দাড়িয়ে এই মহামানব নিজেকে ঘুচিয়ে নেন এক কঠিন সংগ্রামের জন্য। যাকে বিশ্বমানবতার জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হলো, তিনি যেন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের দু:খ কষ্ঠ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন মাবুদ যেন সেই আয়োজনই করলেন তার প্রিয় মানুষটির জন্য। এখানে ও রয়েছে এক অজানা আনন্দ আর পরিস্থিতি মোকাবেলার যাবতীয় প্রস্তুতি। জীবনের সকাল বেলায় যেন সারা দিনের আয়োজন শেষ। যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এ ব্যতিক্রমধর্মী কিশোরকে অন্যান্য ছেলেদের মত দুষ্ট ও বখাটে হয়ে নয়, বরং প্রবীণদের মত ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। যখন সে যৌবন পদার্পণ করে, তখন চরম নোংরা পরিবেশে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের যৌবনকে লিষ্কলংক রাখতে সক্ষম হয়। স সমাজে প্রেম, কু-দৃষ্টি বিনিময় ও ব্যভিচার যুবকদেও জন্য গর্বেও ব্যাপার, সেই সমাজে এই অসাদারণ যুবক নিজের দৃষ্টিকে পর্যন্ত কলুষিত হতে দেয়না। সে সমাজে প্রত্যেক অলিগলিতে মদ তৈরীর কারখানা এবং ঘরে ঘরে পানশালা, সে সমাজে প্রত্যেক মজলিশে পরনারীর প্রতি প্রকাশ্য প্রেম নিবেদন ও মদ্যপানের বিষয়ে কবিতা পাঠের জজমাট আসর বসে, সেখানে এই নবীন যুবক একটি ফোঁটা মদও মুখে নেয়না। সেখানে জুয়া জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল, সেকানে আপাদমস্তক পবিত্রতায় মন্ডিত এই যুবক জুয়ার স্পর্শ পর্যন্ত করেনা। রূপকথার গল্পবলা ও গানবাজনা সেখানে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে ভিন্ন এক জগতের এই অভিবাসী এই সব অপসংস্কতির ধারের কাছেও ঘেষেনা। দু'একবার যদিও এ ধরনের বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ তার হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া মাত্রই তার এমন ঘুম পায় যে, সেখানকার কোন অনুষ্ঠানই তার আর দেখা ও শোনার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

সচ্চরিত্র ও সত্যাশ্রয়ী যুবক

যে বয়সে ছেলেরা সাধারণত বিপথগামী হয়ে থাকে, ঠিক সেই বয়সেই যে গরীব ও নিপীড়িত মানুষদেও সহায়তা এবং অত্যাচারীদেও যুলুম উচ্ছেদের লক্ষ্যে 'হালফুল ফুযুল' নামে একটা সংস্কারকামী সমিতিকে যোযদান করে। এতে যোগদানকারীরা তাদেও উদ্দেশ্যে বাস্তাবায়নের অংগীকার করে। তিনি ধর্ম প্রবর্তক হলেন তাতে মিস্ময়ের কোনও কথা ছিল না। কিন্তু যিনি এক আজন্ম অনাথ নিরক্ষর সহায়-সম্পদবিহীন দারিদ্র, তিনি বিরূপে অতি মহামানব হলেন, সেটা কি পরম আশ্চার্যেও বিষয় নয়? টমাস কারলাইল বিস্মিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন: "এই আরবের মানুষ মুহাম্মদ, আর সেই একটি শতাব্দী–এ কি এমনটি নয় যে, কোনও স্ফুলিঙ্গ, একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীর উপর পড়লো, এমন পৃথিবীর উপর, যাকে মনে হয়েছিল সামান্য বালিমাত্র। কিন্তু দেখ তো, সেই বালি হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারে বারুদ; আকাশ-প্রমাণ হয়ে জ্বলে উঠেছে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত"। নবুয়ত লাভের পর রাসূল [সা.] ঐ সমিতির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন : 'ঐ অংগীকারের পরিবর্তে কেউ যদি আমাকে লাল রং এর উটও দিত, তবু আমি তা থেকে ফির আসতামনা। আজও কেউ যদি আমাকে ঐ রকমের কোন চুক্তি সম্পাদন করতে ডাকে, তবে আমি সে জন্র প্রস্তুত।'

এই তরুন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথানোয়ায়নি

এই মানুষটির শুরুই যেন বলে দিচ্ছে তাঁর শেষটা কেমন হবে। দেব-দেবী আর মূর্তিপূজা যে সমাজের আভিজাত্যের অংশ সে সমাজে সবকিছুকে কার ইশারায় প্রত্যাখান করেছে? যে সমাজে দেবমূর্তিও সামনে সিজদা করা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হযরত ইবরাহীমের বংশধর এই পবিত্র মেজাজধারী তরুন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথাও নোয়ায়না এবং কোন মোশরেক সুলভ ধ্যানধারণাও পোষণ করেন না। এমনকি একবার যখন তাকে দেব মূর্তিও সামনে বলি দেয়া জন্তুও রান্না করা গোশত খেতে দেয়া হয়, তখন সে তা খেতে অস্বীকার করে। হযরত ইবরাহীমের বংশধরেরা যেখানে ইবরাহীমী আদর্শকে বেদায়াত চালু করে, সেখানে এই লাজুক যুবক এক মুহূর্তেও জন্যও এই বিদয়াতকে গ্রহণ করেনা।

জীবন সংগিনী নির্বাচন

এ যুবক জীবন সংগিনী নির্বাচন করার সময় মক্কার উঠতি যৌবনা চপলা চঞ্চলা মেয়েদেও দিকে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত না করে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করে যার সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সতী সাধ্বী ও সচ্চরিত্র মহিলা। তার এ নির্বাচন তার মানসিকতা ও স্বভাব চরিত্রের গভীরতাকেই ফুটিয়ে তোলে। বিয়ের প্রস্তাব হযরত খাদীজাই পাঠান, যিনি এই যুবকও এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে।

বন্ধুবান্ধব ও সহচর নির্বাচন

কোন ব্যক্তির চরিত্র ও মানসিকতাকে যদি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহচরদেরকে দেখে যাচাই

www.pathagar.com

করতে হয়, তাহলে আসুন দেখা যাক কেমন লোকেরা এ যুবকের বন্ধু ছিল?

সম্ভবত হযরত আবু বকরের সাথেই ছিল তাঁর সবচেয়ে গভীর বন্ধুত্ব ও সবচেয়ে অকৃত্রিম সম্পর্ক। একে তো সমবয়সী, তদুপরি সমমনা। তার অপর এক বন্ধু ছিল হযরত খাদীজার সম্পর্ক। একে তো সমবয়সী, তদুপরি সমমনা। তার অপর এক বন্ধু ছিল হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই হাকীম বিন হিযাম। এই ব্যক্তির হারাম শরীফের একজন খাদেম ছিলেন। দেমাদ বিন সা'লাবা আযদী নানম একজন চিকিৎসকও ছিল তার অন্যতম বন্ধু। কই, এ যুবকের বন্ধু মহলে একজনও তো নীচ, হীন, বদ অভ্যাস, যুলুমবাজ ও পাপাচারী লোক দেকা যায়না।

তাজের আমীন' বা 'সৎ ব্যবসায়ী' উপাধিতে ভূষিত

এই যুবক যখন অর্থোপার্জনের ময়দানে পদার্পন করলো, তখন বাণিজ্যেও ন্যায় পবিত্র ও সম্মানজনক পেশা বেছে নিল। দেশের বড় বড় পুঁজিপতি এই যুবককে তাদের পুঁজিগ্রহণ ও বাণিজ্য করার জন্য মনোনীত করে। এ যুবকের মধ্যে এমন গুণ নিশ্চয়ই ছিল যে জন্য তারা তাদের মনোনীত করেছিল। সায়েব, কায়েস বিন সায়েব, হযরত খাদীজা এবং আরো কয়েক ব্যক্তি একে একে এই যুবকের অনুপম সততার বাস্তব অঝিজ্ঞতা লাভ করে এবং তারা সবাই তাকে এক বাক্যে 'তাজের আমীন' বা 'সৎ ব্যবসায়ী' উপাধিতে ভূষিত করে। আব্দুল্লাহ বিন আবিল হামসার সাক্ষ্য আজও সংরক্ষিত রয়েছে যে, নবুয়তের পূর্বে একবার এই তরুন সৎ ব্যবসায়ীর সাথে তার কথা হয় যে, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি আসছি। কিন্তু পরে সে ভুলে যায়। তিনি দিন পর ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ। ঐ জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায়, ঐ সৎ ব্যবসায়ী আপন প্রতিশ্রুতির শেকলে আবদ্ধ হয়ে সেই জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আব্দুল্লাহকে বললো, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তিন দিন ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'-আবু দাউদ

হাজারে আসওয়াদ পুন:স্থাপন:-

মুহাম্মদ [সা] কেমন সংস্কারক ছিলেন তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা কতখানি, তা এ ঘটনা থেকেই বুঝা যায় সে কা'বা শরীফ সংস্কারের সময় হাজারে আসওয়াদ পুরস্থাপন নিজে কোয়ায়েশদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এটা এতদূর গড়ায় যে, তলোয়ার পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে এবং সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই গোলযোগ মিটমাট করার সুযোগটা এই যুবকই লাভ করে। চরম উত্তেজনার মধ্যে শান্তির পতাকাবাহী এই বিচারক একটা চাদর বিছিয়ে দেয় এবং চাদরের ওপর রেখে দেয় হাজারে আসওয়াদ নামক সেই পাথর। তারপর সে কোরায়েশ গোত্রের সকল শাখার প্রতিনিধিদেরকে চাদর উত্তোলনের আহ্বান জানায়। পাথর সমেত চাদর উত্তোলিত হয় যখন। যথাস্থানে উপনীত হলো, তখন এই যুকব পাথরটা তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলো। গোলযোগ থেমে গেল এবং সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও উৎফুলণ হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

হেরা গুহায় নিভৃত প্রকোষ্ঠে এক আল্লাহর ইবাদত

তিনি সাংসারিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে যখনই কিছু সময় অবসর পেয়েছে, তখন তা আমোদ ফূর্তি ও বিনোদনে কাটায়নি। যত্রতত্র ঘোরাঘোরি করে, আড্ডা দিয়ে, অথবা অলসভাবে ঘুমিয়ে কাটায়নি। বরং সমস্ত হৈ হাঙ্গামা থেকে দূরে সরে ও সমস্ত কর্মব্যবস্ততা পরিহার করে নিজের নির্মল ও নিষ্কলুষ সহজাত চেতনা ও বিবেকের নির্দেশক্রমে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করতো হেরা গুহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গিয়ে। বিশ্বজগতের প্রচ্ছন্ন মহাসত্যকে হৃদয়ংগম করা ও মানব জীবনের অদৃশ্য রহস্যগুলোকে জানার জন্য আপন সত্তায় ও বিশ্ব প্রকৃতির অতলান্তে চিন্তা গবেষণা চালাতো। সে ভাবতো, কিভাবে আপনা দেশবাসী ও গোটা মানবজাতিকে নৈতিক হনিতা ও নীচতা থেকে টেনে তুলে ফেরেশতার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। যে যুবকের যৌবনের অবসর সময় ব্যয় হলো এরূপ একান্ত চিন্তু গবেষণা কার্যে, তাঁর উঁচু ও পবিত্র স্বভাব সম্পর্কে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও অন্তদৃষ্টি-কি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনা?

এক অসাধারণ মহামানব

দৈনন্দিন জীবনের এ জাতীয় ঘটনাবলী নিয়ে ভবিষ্যতের বিশ্বনবী কোরায়েশদের চোখের সামনেই মক্কী সমাজের কোলে লালিত পালিত হতে থাকে, ক্রমে যৌবনে পদার্পন করে এবং পরিপক্কতা লাভ করে। জীবনের এই চিত্র কি বলে দিচ্ছিলনা যে, এ যুবক এক অসাধারণ মহামানব? এভাবে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি কোনভাবে এমন ধারণা পোষণ করা চলে যে, ইনি কোন মিথ্যাচারী মানুষ হতে পারে? কিংবা হতে পারেন কোন পদলোভী, স্বার্থপর কিংবা ধর্মকে পুঁজি কর ব্যবসায় ফেঁদে বসা কোন ধর্মব্যবসায়ী? কক্ষনো নয়। খোদ কোরায়েশরাই তাঁকে সাদেক [সত্যবাদী] আমীন [বিশ্বাসী ও সৎ] জ্ঞানীগুণী, পবিত্রাত্মী, ও মহৎ চরিত্রধারী মানুষ বলে স্বীকার করেছে এবং বারংবার করেছে। তাঁর শত্রুরাও তাঁর মনীষা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং কঠিনতম দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও দিয়েছে। সত্যের এই মহান আহ্বায়কের জীবন চিত্রকে কুরআন নিজেও সাক্ষী হিসেবে পেশ করে তাঁকে বলছে বলেছে : 'আমি তো এর আগেও তোমাদের মাঝেই জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমাদের বুঝে আসেনা?' [ইউনুস, '১৬০]

মুহাম্মদ [সা] ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মদ [সা] এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যার অভাবে অশ্রুপাত করছে সে অভাব কেবলমাত্র মুহাম্মদী সাম্যনীতির মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীগত পার্থক্যকে চূর্ণ করে একমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

শান্তির দূত মুহাম্মদ [সা]

যে সমাজ কে বলা হয় আইয়্যামে জাহেলিয়াত। সেখানে শান্তি , মানবতাবোধ,শৃংঙ্খলা শুধুই কল্পনা। যে দেশে যুদ্ধ একটা খেলা এবং রক্তপাত, একটা তামাশায় পরিণত হয়েছিল, সেখানে মানবতার সম্মানের পতাকা বাহী এই যুবক এক ফোঁটাও কারো রক্তপাত করেনি। তারুণ্যে এউ যুবক 'হারবুল ফুজ্জার' নামক বিরাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কোরায়েশ গোত্রের এই যুদ্ধেও অংশগ্রহণ ন্যায়সংগত ছিল বলে সে এই যুদ্ধে যোগদান করলেও কোন মানুষকে নিজে কোন আঘাত করেনি।

সত্যের বাণী প্রচার-ই সব পাল্টে গেল

কিন্তু জাতির এই উজ্জ্বল রত্নটি যখন নবুয়তের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সত্যের বাণী পেশ করলো, তখন তাদের মনোভাব সহসাই পাল্টে গেল। তাঁর সততা, সভ্যবাদিতা, ভদ্রতা, মহত্ব ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব সব কিছুরই মূল্য কমে গেল। কাল পর্যন্ত যে ব্যক্তি জাতির চোখের মনি ছিল, আজ সে দুশমন, বিদ্রোহী ও জাতির কলংক খেতাব পেল। কাল পর্যন্ত যাকে প্রতিটি শিশু পর্যন্ত সম্মান করতো, আজ সে সকলের ক্রোধভাজন। দীর্ঘ চল্লিশোর্ধ বছর ধরে যে ব্যক্তি নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করেছেন, তিনি আজ আল্লাহর একত্ববাদ, সত্য ও ন্যায়ের বাণী শোনানো মাত্রই কোরায়েশদের চোখে খারাপ হয়ে গেছেন। আসলে তিনি খারাপ ছিলেন না। বরং কোরায়েশের মূল্যায়নকারীদের চোখেই ছিল বক্রতা এবং তাদের মানদণ্ডই ছিল ভ্রান্ত।

কিন্তু সত্যই কি কোরায়েশদের চোখ এত অন্ধ ছিল যে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ এমন আলোকময় একটা চাঁকে তারা দেখতে পায়নি? চরিত্রহীনদের সমাবেশে সৎ চরিত্রবাদ একজন নেতাকে দেখে কি তারা চিনতে পারেনি? আস্তাকুড়ে পড়ে থাকা মুক্তার একটা মালা কি তাদের নজর কাড়তে পারেনি? অসভ্য ইতর মানুষদের সমাজে এই আপাদমস্ত ক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারে মন্ডিত ব্যক্তি কি নিজের যথোচিত আদর ও কদর আদায় করতো পারেন নি? না, তা নয়। কোরায়েশরা ভালোভাবেই জানতো মুহাম্মদ কেমন মানুষ। "মহানবী মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল একটি প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে অবমানবতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা চোখের নিমিষে পুড়ে ছারখার করে দিল।"

"যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোন নায়কের শাসনাধীনে আনীত হতো, তা একমাত্র মুহাম্মদই [সা] সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।"

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : 'তাদের চোখ আচে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেকতে পায়না।' চোখ থাকতে যারা অন্ধ হয় তাদের দ্বারা হেন বিপদ নেই যা ঘটতে পারেনা

www.pathagar.com

এবং হেন বিপর্যয় নেই যা দেখা দিতে পারেনা। হযরত মুহাম্মদ [সা] আমাদের সকলেরই আদর্শ। স্বামী দেখতে পাবে তার মধ্যে স্ত্রী-অনুরাগী আদর্শ স্বামী। পুত্র দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে পিতৃ-মাতৃভক্ত আদর্শ পুত্র। পিতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে মমতাশীল কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ পিতা। গৃহী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে স্বহস্তে গৃহে কর্মরত আদর্শ গৃহী। যোগী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে ধ্যান-নিরত আদর্শ যোগী। প্রজা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে সদা হাস্যবদন আদর্শ প্রভু। ভৃত্য দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী আদর্শ ভৃত্য। বণিক দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে একজন সৎ, আদর্শ বণিককে। সেনাপতি দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে রণকুশল স্থির-মস্তিস্ক সেনাপতি। নেতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে হিতৈষী জনসেবক আদর্শ নেতা। বিচারকর্তা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শ বিচারক। আর তাইতো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসানা" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ও রাসূলের [সা] মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ আছে। আসুন আমরা সুন্দও সমাজ বিনির্মাণে মুহাম্মদ [সা] কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শের মডেল হিসেবে গ্রহণ করি। বিশেষ করে যুবসমাজই হচ্ছে সমাজ বিনির্মানের আসল কারিগর বা মুল শক্তি। তাদের মেধা ও নৈতিক শক্তির উপর বির্নিমিত জাতির মেরুদণ্ড। আর এই শক্তির উৎস যদি হয় মুহাম্মদ [সা] যৌবনকাল, তাহলে আজকের পথহারা যুব সমাজ পাবে পথের দিশা। জাতি পাবে তার কাংঙ্খিত নেতৃত্ব। ■

www.pathagar.com

মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ [সা]

জাফর আহমাদ

রাসুল [সা] কর্তৃক যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিলেন সামগ্রীক বিবেচনায় তার নাম আমরা 'আলহেরা বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে পারি। যার চ্যান্সেলর ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং এর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মদ [সা]। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ছিল মাত্র দু'খানা, এক, আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী গ্রন্থ 'আল কুরআন' ও দুই, রাসুল [সা] এর 'হাদীস'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন ছিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর [রা], ফারুকে আযম হযরত ওমর [রা], জিননুরাইন হযরত ওসমান [রা], আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী [রা], বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রাসহ [রা] আরো অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম [রা]। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছিল যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। সেই দুটি হলো, এক, প্রশাসক, মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসুল

www.pathagar.com

[সা] দুই, কার্যকরী সিলেবাস, আল কুরআন ও হাদীস। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারাই বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আকাশের নক্ষত্র সমতূল্য। তাদের স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ছিল দুনিয়াজোড়া।

এই মহান শিক্ষকের আন্তরিক শিক্ষাদানে এবং অত্যন্ত ফলপ্রসু সিলেবাসের দু'টিমাত্র বিষয় পড়ে চলুন দেখি কেমন দুনিয়াজোড়া ছাত্র তৈরী হয়েছিল। অসংখ্য মহান ছাত্রদের মাঝে একজন হলেন, রাসুল [সা] পরবর্তী ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রথম আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক [রা]। তিনি ছিলেন রাসুলের [সা] সংগ্রামমূখর জীবনের সুখ-দু:খের প্রাত্যহিক ও নিত্যদিনের সার্বক্ষণিক সাথী। সারা পৃথিবী যখন অপ্রাকৃতিকসূলভ মিরাজকে অসম্ভব বলে কোন পাত্তাই দিচ্ছিল না, তখন তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুধু সম্ভব বলেই স্বীকৃতি দেননি, সাথে সাথে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসও স্থাপন করেছিলেন। যার ফলে তাঁকেই একমাত্র সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি দেয়া হয় 'ছিদ্দিকে আকবর'। অর্থাৎ বড় ধরনের প্রত্যায়ন কারী বা বিশ্বাসী।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান শিক্ষক মুহাম্মদের [সা] পাঠ্যকৃত দু'টি সাবজেক্ট পড়ে দ্বিতীয় যেই মহান ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিলেন, তিনি হলেন, অর্ধেকটা পৃথিবীর ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক ফারুকে আযম হযরত ওমর [রা]। তিনি মহাকালের মহান সফল রাষ্ট্রনায়ক। বর্তমান যুগের ইসলামী বা অনৈসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যেই কৌশল ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অবকাঠামো দেখতে পাওয়া যায়, তা হযরত ওমর [রা:] কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত। তিনি ছিলেন অন্ধকার যুগের বাতিলের ধারক বাহকদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু রাসুলের [সা] তত্বাবধান ও আল কুরআনের বদৌলতে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ছোট্ট ইসলামী দলটি যখন সন্ত্রাসের ত্রাসে ঘোর অমানিশায় দিশেহারা অবস্থায় ছিল তখন তিনি প্রকাশ্যে বাতিল শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। যার ফলে একমাত্র তাঁকে সবোর্চ্চ সম্মানিত উপাধি "ফারুকে আযম'-এ ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ হক-বাতিলের পার্থ্যকারী। আল কুরআনের এই ছাত্রটির মাত্র তিনটি ঘটনা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করতে চাই। তাহলে আশা করা যায় সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাসুলের [সা] শিক্ষানীতি ও আল কুরআনের কার্যকারিতা বুঝতে সক্ষম হবে।

হযরত আনাস [রা] বলেন, 'একদিন আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক [রা] লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য গভীর রাত্রিতে একাকি ঘুরা-ফেরা করছিলেন। পথিমধ্যে একটি মুসাফির কাফেলার নিকটবর্তি হলেন। তাঁর আশংখা হলো, রাত্রিতে তাদের মাল-সামান চুরি না হয়ে যায়। এমন সময় আব্দুর রহমান আউফ [রা] সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি বললেন 'হে আমীরুল মুমিনীন! এত রাত্রিতে আপনি এখানে? তিনি বললেন, আমি এই কাফেলার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। আশংকা হলো, এরা রাত্রিতে ঘুমিয়ে যাবে, এ সুযোগে তাদের মাল-সম্পদ চুরি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই চলো, আমরা তাদের মাল-সামান পাহারা দেই। অতপর কাফেলার নিকটবর্তি একটি স্থানে বসে উভয়ে তাদের মাল-সামান হিফাজতের জন্য সারারাত্রি

www.pathagar.com

পাহারা দিলেন। ফজরের সময় হযরত ওমর [রা] আওয়াজ দিলেন, হে কাফেলার লোকজন! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তোমরা উঠো। যখন তিনি দেখলেন তারা জাগ্রত হচ্ছে, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।'

হযরত আলী [রা] বলেন, একদিন আমি হযরত ওমর ফারুক রা কে দেখি, উটে আরোহণ করে সকাল সকাল 'আব্তাহ' অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন। কারণ জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বললেন, 'বাইতুল মালের একটি উট হারিয়ে গেছে, তা তালাশ করছি।' আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এভাবে কষ্ট করে পরবর্তি খলীফাদের দায়িত্ব কঠিনতর করে দিয়ে যাচ্ছেন।' হযরত ওমর [রা] বললেন,'হে আবুল হাসান! [হযরত আলী [রা] মুহাম্মদকে স:নবুয়ত প্রদানকারী আল্লাহর কসম, সাধারণ একটি বকরীর বাচ্চাও যদি ফুরাত নদীর তীরে হারিয়ে যায়, আর আমি সেটার হেফাজত না করি, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে।' অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলমান প্রজাসাধারণের হিফাজত করে না যে শাসক, যারা প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানে গাফেল, তাদের কোন মূল্য নেই, কিছুতেই তাদের স্বীকৃতি দেয়া যায় না।

একদা হযরত ওমর [রা] একজন বিধর্মী প্রজাকে দেখলেন, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। হযরত ওমর [রা] লোকটিকে বললেন, আমি তোমার প্রতি ইনসাফে ও ন্যায় ব্যবহারে ত্রুটি করছি। যখন তুমি যুবক ছিলে তখন তোমার কাছ থেকে কর ওসল করেছি, আর এখন তোমার প্রতি লক্ষ্য নিচ্ছি না। এই কথা বলে, তার জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় মহান ছাত্র হযরত ওসমান [রা]। তিনিও ইসলামী সাম্রাজ্যের মহান রাষ্ট্রপতি। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে খুশি হয়ে মহানবী [সা] তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম মেয়ে ইন্তেকাল হলে রাসুল [সা] তাঁর অন্য মেয়েকে বিয়ে দেন। এ জন্য তাঁকে জিননুরাইন বলা হয়। অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর বিলাস বহুল জীবন ঐশর্য্য পরিত্যাগ করেন। অন্য ছাত্র হলেন হযরত আলী [রা]। তাঁর শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল [সা] এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। যুবকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলীর [রা] শৌর্যবীর্যের জন্য তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর বাঘ নামে অভিহিত করেন।

এমনিভাবে রাসুলের [সা] নিবির তত্বাবধানে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন লক্ষ্য লক্ষ্য ছাত্র বেরিয়ে আসেন, যারা যে কোন দিক থেকে ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানব। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত, রাসুল [সা] প্রদর্শিত সিলেবাস বাদ দিয়ে বস্তা বস্তা বই পড়িয়ে উল্লেখিত একজন ছাত্রের মত একজন ছাত্র গড়ে তোলা দুনিয়ার তাবত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? কখনো নয়। কুরআন ও হাদীস ছাড়া সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মিলে সিলেবাসের হাজার হাজার বিষয় পড়িয়েও তাঁদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার মতো একজনমাত্র ব্যক্তি গড়ে তোলা কখনোই সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

একজন পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই রাসুলের [সা] শিক্ষানীতির অনুসরণ করতে হবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর শিক্ষক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"[হে নবী] আমি তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা তুমি জানতে না এবং তোমার পূর্বপুরুষরাও জানতো না।"[আন'আম:৯২] রাসুল [সা] নিজেই বলেছেন, "আমি বিশ্ববাসীর শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" বর্তমান বিশ্বের শিক্ষানীতি আমাদের সামনে সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, রাসুলের শিক্ষানীতি তথা আল কুরআনকে বাদ দিয়ে যেই শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যেই শিক্ষিত লোক বেরিয়ে আসছে, তারাই আজ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে আসীন আর তারাই সুদ, ঘোষ ও দূর্নীতিসহ সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

কেন আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই দুরাবস্থা? কেন সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নেই? লেখাপাড়া শিক্ষার পরিবর্তে কেন আজ মারামারি, কাটাকাটি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি ও ভর্তিবাণিজ্যের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত হচ্ছে। এই এতগুলো কেন-এর উত্তর এক বাক্যে দেয়া সম্ভব, তাহলো এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈতিক শিক্ষা তথা রাসুল [সা] বা আল কুরআনের শিক্ষা অনুপস্থিত। ছাত্র অবস্থায় যারা এ ধরণের কাজে লিপ্ত হয়, আপনার কাছে প্রশ্ন, এই ছাত্র শিক্ষা জীবন শেষ করে কার্যক্ষেত্রে এসে কি করবে? এদের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অবস্থা কেমন হবে? এগুলোর উত্তর আপনার কাছে রেখে আমি বলতে চাই সুস্থ্য শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে কুরআনকে মৌলিক ও বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পাঠ্য করতে হবে। হতে পারে তা মানবিক শাখা বা বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ। এই সবগুলো বিভাগে আল কুরআনকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। বমনে রাখতে হবে শুধুমাত্র আল কুরআনের জন্য আলাদা একটি বিভাগ খুলে দিলেই এই হক কখনো আদায় হবে না।

সারা দুনিয়ায় দুর্নীতি আজ আলোচিত বিষয়। বেশিরভাগ দুর্নীতি শিক্ষিত লোকদের দ্বারাই হচ্ছে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তা বস্তা বই পড়েছে বটে কিন্তু তার সাথে নৈতিক শিক্ষার কোন সমন্বয় ছিল না। ফলে আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন মানসে মলিনতা, শোষণ এবং জৈবিক ও পাশবিক পংকিলতাসমূহ প্রক্ষালন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করার মতো শিক্ষা সে পায়নি। যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন, তার শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে তা তিনি তার জন্য নির্ধারণ করবেন না, তা হতে পারে না। অবশ্যই তিনি তার জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। আর তাহলো, রাসুল [সা] কর্তৃক প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এটি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা মানুষের হাত, পা ও মাথাকে নত করার আগে মানুষের মনের ব্যকুলতার প্রয়োজনীয়তাকে জাগিয়ে তুলে। শারীরিক বশ্যতার আগে আত্মার আনুগত্যশীলতাকে উজ্জীবিত করে। মনে রাখতে হবে স্রষ্টার ভয় যার মনকে বিচলিত করে না, মানুষের ভয় তাকে কিভাবে বিচলিত করবে। শুধু দূর্নীতি নয় জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে এ শিক্ষার প্রভাব এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেমনিভাবে কোন কারণে মানুষের শরীরে শিহরন জেগে উঠে। যেখানে সে যাবে সেখানেই এই

www.pathagar.com

শিক্ষা তাকে সঠিক-বেঠিক পথের পার্থক্য নিরূপণ করে দিবে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কর্তব্যবোধ কি হওয়া উচিত, তা আপনিতেই জেগে উঠবে।

শিক্ষার প্রতি মহানবী [সা] অত্যন্ত অনুরাগী। তাই এর প্রচার ও প্রসারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেছেন, রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারারাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।" "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয।" পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আকাশের তারাকার ন্যায় যা পানি ও স্থলভাগকে আলোকিত করে। বদর যুদ্ধের বন্দীদের একাংশ ছিল শিক্ষিত। রাসুল [সা] তাদের মুক্তিপণ স্থির করলেন-দশটি ছেলেকে শিক্ষাদান করা। তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেখাপাড়া শেখাবে। এরপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে।

রাসুলের [সা] এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন আলো জ্বালায়, যেই আলোয় তৎকালীন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত জাযিরাতুল আরবের মূর্খ ও বর্বর মানুষগুলো জেগে উঠে একরাশ আলোর প্রত্যাশায়। ফলে তাঁদের পরিচালিত সমাজ প্রবেশ করে সর্বশ্রেষ্ট যুগে। যেই যুগ সম্পর্কে স্বয়ং রাসুল [সা] বলেছেন, "আমার যুগই সর্বশ্রেষ্ট যুগ।" তিনি নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল নৈতিকজ্ঞান সমৃদ্ধ নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে, যারা নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে সমস্যাগ্রস্থ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং যেখানেই তারা গিয়েছেন সেই এলাকা ও সেই দেশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সেখানকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসক শিক্ষা ব্যবস্থার সকলস্তরে স্থিতিশিলতা কায়েম হয়েছিল। যাদেরকে মানুষ আল্লাহর রহমত হিসাবে গ্রহন করেছিল। পরবর্তি প্রজন্ম তাদের অবদান আজো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

সুতরাং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য এবং সমৃদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মত যোগ্য নেতৃত্ব গড়ার জন্য রাসুলের [সা] শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য রাসুলের দেখানো শিক্ষানীতির পথ ধরেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ■

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর বাল্যজীবন

নাসির হেলাল

হযরত মুহাম্মদ [সা] হলেন মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে দুনিয়ায় রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সেই জন্য তাঁকে রাহমাতাল্লিল আলামীন বলা হয়। তিনি উসউয়াতুন হাসানা সকল মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁকে অনুসরণ করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই মহামানবের বাল্যজীবন আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে বাল্য জীবন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে তাঁর জন্ম ও শিশুকালের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেব।

মরুময় আরবের মক্কা নগরীর কোরাইশ বংশে ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার মুহাম্মদ [সা] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং মাতার নাম ছিল আমিনা। আমিনা ছিলেন কোরাইশ বংশের বনিযোহরা গোত্রের ওহাবের কন্যা। আর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কোরাইশন সর্দার। কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তাঁরই। মুহাম্মদ [সা]-এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল

www.pathagar.com

মুত্তালিবের দশজন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ। কিন্তু দু:খের কথা হলো আবদুল্লাহ তাঁর প্রিয় পুত্র, যে পুত্র মানব শ্রেষ্ঠ, নবীদের নবী তাঁকে দেখে যেতে পারেননি, তিনি মুহাম্মদ [সা] এর জন্মের ৬ মাস আগেই মৃত্যু বরণ করেন।

সদ্যজাত শিশু মুহাম্মদ [সা] কে প্রথম দুধ খাওয়ান ছোওয়ায়রা নামক একজন ক্রীতদাসী ধাত্রী। ইনিই রাসূল [সা]–এর প্রথম ধাত্রী ও দুধ মা। তিনি রাসূল [সা]-কে দুএকবার বা দুএকদিন দুধ খাওয়ায়েছিলেন। অথচ রাসূল [সা] সারাজীবন এই দুধ মার কথা স্মরণ করেছিলেন। জন্মের সাত দিনের দিন দাদা আবদুল মুত্তালিব আকিকা উৎসব করে শিশু নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। আরবে এধরনের নাম রাখা এই প্রথম। তাই অতিথি গোত্রের নেতাগণ প্রশ্ন করলেন, এমন অদ্ভুত নাম রাখার কারণ কি? উত্তরে আবদুল মুত্তালিব সংগে সংগে বলেছিলেন, আমি চাই, আমার এই পিতৃহীন পৌত্র যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত হোক পৃথিবীর সর্বত্র, জগতে তাঁর প্রশংসা চির অমলিন হয়ে থাক। হয়েছেও তাই।

আরব দেশের রেওয়াজ ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের শিশুদের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করা। এই ধাত্রীদের অধিকাংশই ছিল বেদুঈন বংশোদ্ভুত। তারা শিশুদেরকে কয়েক বছর নিজেদের কাছে রেখে লালন পালন করতো এবং এর বিনিময়ে কিছু রোজগার করতো। যে কারণে তারা নিজেরাই ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুর খোঁজ নিত। মুহাম্মদ [সা] এর জন্মের কিছুদিন পর এমন একদল ধাত্রী এলো মক্কা নগরীতে শিশুর খোঁজে। রোজগারের প্রশ্ন থাকায় সবাই ধনী পরিবারের শিশুদের নিতে আগ্রহী ছিল, ফলে এয়াতিম ও অসচ্ছল শিশু মুহাম্মদ [সা] কে নিতে কেউ এগিয়ে এলো না। ঘনাক্রমে কোরাইশ বংশের বনি সাআদ গোত্রের মেয়ে হালিম কোন শিশুকেই প্রতিপালনের জন্য পেলেন না। তখন তিনি ও তাঁর স্বামী চিন্তা করলেন খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এতিম শিশু মুহাম্মদ [সা] কে নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

এই হালিমার গৃহেই মুহাম্মদ [সা] প্রায় ৫ বছর লালিত পালিত হন। এই সময় হালিমার কন্যা শায়েমা শিশু মুহাম্মদকে কোলে নিয়ে আদর করে ছড়া কাটতেন। যেমন–

বেঁচে থাকুক মুহাম্মদ-সে দীর্ঘজীবী হোক
চির-তরুণ চির-কিশোর চির-মধুর হোক।
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান,
শত্রু তাহার ধ্বংস হউক-ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহাম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও,
চিরস্থায়ী গৌরব যা-তাই তাহারে দাও।

ধীরে ধীরে শিশু নবী বড় হতে লাগলেন, দুধ ভাই আবদুল্লাহর সাথে উন্মুক্ত মাঠে, প্রকৃতির কোলে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলেন। যদিও এটা তাঁর শিক্ষার বয়স কিন্তু তাঁর কোন শিক্ষক ছিল না, তাঁর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ এ বয়সেই তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল হয়ে ওঠেন। অন্যান্য খেলার সাথীদের থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা।

www.pathagar.com

এ সময়ে একদিন দুধ ভাই আবদুল্লাহর সাথে মেষ চরাতে মাঠে গেলে এক অদ্ভুত ঘানা ঘটে, যাকে বক্ষবিদারণা নামে আখ্যায়িত করা হয়। ঘানাটি হাদীসে এভাবে আনাস [রা] বর্ণনা করেছেন–

একদিন হযরত বালকফের সাথে খেলা করছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হলেন। জিব্রাইল হযরতকে একটু আড়ালে নিয়ে তাঁকে চিৎ করে শোয়ালেন, তারপর তাঁর বুক চিরে হৃৎপিন্ডটাকে একটা সোনার তলতরীতে রেখে জমজমের পবিত্র পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন; অত:পর সেটাকে জোড়া লাগিয়ে পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপন করলেন। বালকেরা দৌড়িয়ে গিয়ে হালিমাকে বলিল : 'দেখ গিয়ে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।' তখন সকলে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, মুহাম্মদ বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছেন। আনাস [রা] আরো বলেছেন, 'আমি হযরতের বুকে সেলাইয়ের দাস দেখেছি।'

এই ঘানার পরপরই নিশু নবীকে ধাত্রী হালিমা আর কাছে রাখা ঠিক মনে করেননি। তাঁদের ধারণা ছিল নবীকে জ্বীনে ধরেছে। তাই তারা যাঁর সন্তান সেই আমিনার কাছে ফেরত দিয়ে দিল। এসময় তাঁর বয়স পাঁচ বছর।

শিশুপুত্রকে কাছে পেয়েই আমিনা মদিনায় রওনা হলেন স্বামীর কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্য। মদিনায় পৌছেই তিনি মুহাম্মদ [সা] কে সাথে নিয়ে আবদুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন। শিশুপুত্রকে তাঁর পিতা সম্বন্ধে আগত করলেন। মুহাম্মদ [সা] বুঝতে পারলেন তিনি এতিম।

মদিনাতেই আমিনার বাপের বাড়ি ছিল। ফলে তিনি সেখানে এক মাস থেকে আবার মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনি অসুস্থ্য হয়ে ইন্তে কাল করলেন। এ সময় উম্মে-আইমান নাম্নী একজন পরিচারিকা তাঁর সাথে ছিলেন।

মুহাম্মদ [সা] যেহেতু ছিলেন বালক মাত্র তাই উম্মে আইমান আমিনার লাশ সেখানে নিজ দায়িত্বে দাফন করে মুহাম্মদ [সা] কে নিয়ে মক্কায় ফিরলেন।

এবার এতিম শিশুর দায়িত্বে এলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। দাদা, নাতি মুহাম্মদ [সা] কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মাথায় সেই মুহবতের ছায়াটুকুও বিদায় নিলেন। এমনিভাবে একের পর এক আপ জনেরা বিদায় নিলেন। বালক মুহাম্মদ [সা] হয়ে পড়লেন বিশ্ব এতিম। আসলে এ গুলো ছিলো আল্লাহরই পরিকল্পনা, তাঁকে যে নবী বানাবেন, বিশ্ব নেতা বানাবেন, সর্বোত্তম মানুষ বানাবেন তারই পদক্ষেপ।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর বালক মুহাম্মদ [সা] চলে এলেন চাচা আবূ তালিবের তত্তাবধানে। চাচা আর তালিব এতিম ভাতিজাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাই সর্বদা তাঁকে নিজের কাছে কাছে রাখতেন। বার বছর দু'মাস বয়সের–সময় আবূ তালিব ভাতিজা মুহাম্মদকে সংগে নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান। সেখানে বুহাইরা নামক এই ইহুদী পি তের সাথে তাঁদের দেখা হয়। তিনি বালক মুহাম্মদ [সা] কে দেখেই তাঁর হাত ধরে চলতে লাগলেন, "এই তো সেই বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক। এই তো সেই

www.pathagar.com

শিশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা। আল্লাহ ইহাকেই তো সকল জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠাইয়াছেন।"

পরে বুহাইরা আবূ তালিব কে মুহাম্মদ [সা] সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন যে, সিরিয়ার ইহুদীরা টের পেলে বালক মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতে পারে। অতএব সাবধনতা অবলম্বন করা দরকার।

আবূ তালিব বুহাইরার পরামর্শ মত দ্রুত ব্যবসায়িক কাজ সেরে ইহুদীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন।

বালক মুহাম্মদ [সা] সততা, সাহসিকতা, পবিত্রতা, উন্নত চরিত্র ভদ্রতা ইত্যাদি কারণে সেই জাহেলি যুগেও আরব বাসীর নিকট থেকে অলি আমীন উপাধিতে ভূষিত হন। আরব বাসীরা তাঁকে দেখলেই বয়ে উঠতেন, ঐ যে আমাদের আল আমীন আসছে।

মক্কাতে 'ও কাজ' মোলা নামে একটি মেলা বসতো এটাই ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় মেলা। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন গৌত্রের পক্ষে কবিরা একে অপরকে আক্রমণ করে কবিতা বলতো। এতে করে একবার ভয়ানক মারামারি হলো, এমনটি যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধ একাধারে পাঁচ বছর চলেছিল, ফলে বহু লোক এতে মারা যায়। এ ইতিহাসে এই যুদ্ধ হরবে ফোজ্জার নামে পরিচিত। যুদ্ধে বালক মুহাম্মদ [সা] চাচা আবূ তালিবের সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পক্ষের যোদ্ধাদের তারা কুড়িয়ে দিতেন।

যুদ্ধটা কাছ থেকে দেখার কারণে বালক মুহাম্মদ [সা] এর মধ্যে ভাষণ প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি সমবয়সীদের নিয়ে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য গঠন করণে হিলফ-উ-ফাযুল বা শান্তি সংঘ। তাঁরা আল্লাহর নামে শপথ করলেন–

১. নিঃস্ব অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করবো।

২. অত্যাচারীকে যথাসাধ্য বাধা দেবো।

৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করবো।

৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবো।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবো।

বাল্যকালে হযরত মুহাম্মদ [সা] আর একটি রক্তক্ষণ সংঘর্ষ থেকে কোরাইশ সর্দার গনকে রক্ষা করে ঘটনাটি হল 'হজের আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ পাথর স্থাপন কেন্দ্র করে। কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় হজের আসর তার মূল জায়গায় কে স্থাপন করবেন তা নিয়ে গো বাধে। সকল কোরাইশ গ্রোত্র প্রধান এই সম্মানিত পাথর যথাস্থানে স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। এমনকি কেউই তার দাবী ছাড়তে রাজি ছিল না, ফলে কথা কাটাকাটি থেকে ক্রমে তা যুদ্ধের দিকে মোড় নিল। সকল গোত্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তখন বয়োবৃদ্ধ ও সকলের সম্মানিত আবূ উমাইয়া বললেন, "ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোন। সামান্য কারণে কেন রক্তপাত করবে? ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব যে ব্যক্তি, আজ সর্বপ্রথম কাবা-মন্দিরে প্রবেশ করবে তার উপরেই বিবাদের ফয়সালার ভার অর্পণ

www.pathagar.com

করা হোক। সে যে সিদ্ধান্ত করে, তাইই আমরা মেনে নেব। এ প্রস্তাবে তোমরা রাজি আছ?"

আবূ উমাইয়ার প্রস্তাবে সবাই রাজি হল। সে মোতাবেক সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো আগন্তুক প্রথম ব্যক্তির জন্য। হঠাৎ সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, "এই যে আমাদের আল আমীন আসছে। আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে নেব।"

বালক মুহাম্মদ [সা] উপস্থিত হয়ে ঘটনা শুনে বললেন "বেশ, ভাল কথা। যে-সকল গোত্র কৃষ্ণ পাথর তোলার জন্য দাবি করছেন, তাঁদের প্রত্যেককের নিজেদের মধ্য থেকে এক একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন।'

তাই করা হলো। এবার মুহাম্মদ [সা] বললেন, আপনারা প্রত্যেকেই চাদরের কোণা ধরে যেখানে ওটা স্থাপন করতে হবে সেখানে চলুন।'

গন্তব্য স্থানে পৌঁছালে কৃষ্ণ পাথরটি নিজ হাতে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। সবাই খুশী হল এবং সব গোল মিটে গেল।

একবার সময়টা ছেলেদের সাথে মেষ চরাচ্ছিলেন বালক মুহাম্মদ [সা]। কিন্তু প্রচন্ড রোদ থাকার কারণে অন্যান্য রাখাল বালকসহ তিনি একটু দূরে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় একদল ডাকাত এসে মেষগুলোকে জড়ো করতে লাগলো–অবস্থা দেখে সব রাখাল বালক ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু সাহসী বালক মুহাম্মদ [সা] এগিয়ে গিয়ে ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা এগুলো জমা করছেন কেন? ডাকাত দল তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, রে বালক তোর সাহস তো কম নয়! বুছতে পারছো না কেন এগুলো জমা করছি? তিনি বললেন, মেষগুলো জমা করবেন না, এগুলোকে ছেড়ে দিন, ওরা চরে খাক। আজ আপনারা সবাই আমাদের বাড়িতে মেহমান হন। আগামী দিন আমি আপনাদের সাথে গিয়ে মেষগুলো আপনাদের বাড়িতে দিয়ে আসবো।

এ কথা শুনে ডাকাত দল আরো হাসতে লাগলো। এরই মধ্যে মহল্লার লোক জন খবর পেয়ে লাঠিসোটা সহ এগিয়ে এলো এবং ডাকাত দলকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু মুহাম্মদ [সা] মহল্লা বাসীকে বললেন, এদেরকে মেরো না, ওরা আমার মেহমান। আল আমীনের কথায় লাঠি সোটা সবই তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিল। বালক মুহাম্মদ [সা] এর ব্যবহার দেখে ডাকাতরা মুগ্ধ হয়ে গেল, তারা বলল, হে বালক, আজ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ, আমরা আর কোনদিন ডাকাতি করবো না।

এমনিভাবে বালক মুহাম্মদ [সা] অনেক আদর্শ স্থাপন করেছেন, যা আমাদের অনুকরণীয়। আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান হাবীবকে বাল্যকাল থেকে নবুওয়াতের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর তাই তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল উজ্জ্বল আদর্শ। ■

www.pathagar.com

আর্দশ মানব হযরত মুহাম্মদ [সা]

মো. জিয়াউল হক

ভূমিকা : আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম সত্তা হলেন হয়রত মুহাম্মাদ [সা]। তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য সুন্দরতম নমুনা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি শারীরিক গঠন কাঠামোর দিক দিয়েও ছিলেন নজিরবিহীন। তাঁর মতো অঙ্গ সৌষ্ঠবের অধিকারী এত সুন্দর আর কেউ ছিল না; কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন: "নিসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল কালাম-৪] কল্পনাবিলাসী কবিরাও তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'খোদার পরে তুমিই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে মোরা এই তো জানি'।

তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয় তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" এই আদর্শ অবলম্বনেই রয়েছে ইহকালীন সফলতা এবং পরকালীন মুক্তি। আর বিশ্বনবী [সা] বলেছেন: 'আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসাবে।' মহানবী [সা] শুধু মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ ও আদর্শমানব ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।" তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের এক মাত্র পথ প্রদর্শক। স্থান, কাল, পাত্র, গোত্র, বর্ণ কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন; এটা শুধু তাঁকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। তাঁর সম্পর্কে বিশ্বের স্কলাররা যে মন্তব্য করেছেন তা আরও বিস্ময়কর। আমেরিকার খ্রিস্টান পণ্ডিত। ১৯৭৮ সালে তার রচিত বইতে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে। তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এতে তার অনেক ভক্তবৃন্দ হয়ে তাকে পাগল বলেন। তখন তিনি তাদের প্রতি উত্তরে বলেন 'প্রিয় বন্ধুরা আমি পাগল হইনি; যার নাম সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তার জন্য পাগল হয়েছে।"

বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, রাহাজানি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যে হারে বিস্তার লাভ করছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হলো তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা। তাঁর এই মহান অনুপম পূর্ণাঙ্গ সত্তার সান্নির্ধে এসেই গোত্রে-গোত্রে, বর্ণে- বর্ণে, জাতিতে- জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত পৃথিবী এককালে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধান পেয়েছিল। কায়েম হয়েছিল প্রেম প্রীতিময়, সাম্য-সৌহার্দ্যের এক অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমানেও শান্তির সন্ধান করতে হলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন এবং রান্নাঘর থেকে সর্বোচ্চ অদালত পর্যন্ত সবকিছুতেই তার অদর্শের সন্ধান করতে হবে।

আদর্শ মানব হিসাবে হযরত মুহাম্মদ [সা] : মহানবী [সা] এর সুরভিত জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। বিশেষ করে তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ, কথাবার্তা, হুকুম আহকাম। এগুলো অনুসরণ করলে শুধু সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে তা নয়। বরং আল্লাহর কাছে সঞ্চিত তার উত্তম প্রতিদানে ধন্য হওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [সূরা- আহযাব ২১] প্রকৃতপক্ষে তিনিই মানুষকে সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তার সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন : "আপনি তো অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেন"। [সূরা আশ-শূরা- ৫২] আবার আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল [সা] এর ইত্তেবা করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : "হে রাসূল [সা.]! আপনি তাদের বলে দিন তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"। [সূরা আলে ইমরান- ৩১] তাই প্রকৃত অর্থে রাসূল [সা] সকলের জন্য আদর্শ মানুষ ও পথ প্রদর্শক।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] আদর্শ মানুষ তা-বুঝার সুবিধার্থে এবং প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য তার জীবন চরিত্র্যকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হলো।

১. ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ
২. পারিবারিক জীবনে আদর্শ
৩. সামাজিক জীবনে আদর্শ
৪. অর্থনৈতিক জীবনে আদর্শ
৫. শিক্ষা জীবনে আদর্শ
৬ .বিচার ব্যবস্থায় আদর্শ
৭. জিহাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ
৮. আন্তর্জাতিকে ত্র আদর্শ

১. ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ: রাসূল [সা] এর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। সকল মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর এই গুণের কারণে অসভ্য বর্বর আবর জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সম হয়েছিলেন, যার ফলে তিনিই প্রথম 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেন। অথচ তখনও তিনি নবী হননি। অতি সাধারণ মানুষ বেশেই সকল মানুষের হৃদয়ের মণি কোঠায় বিশুদ্ধতা ও আস্থার পূর্ণস্থান দখল করে নিয়েছেন। চরম শত্রুও তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখত সংকোচহীনভাবে। তিনি সেগুলো হেফাজত করতেন পূর্ণ আস্থার সাথে। এ কথা সত্য যে, তিনি যদি নবী নাও হতেন তাহলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানুষ হতেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এত মা পরায়ণ, কষ্ট সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল ছিলেন যে সর্বদা অন্যের কল্যাণে নিজের কষ্ট স্বীকার করতেন। যাদের কল্যাণে তিনি কষ্ট স্বীকার করতেন তারাই তাকে গালাগাল করত, রাস্তায় কাঁটা দিত, তার উপর পাথর মেরে খুন ঝরাত, তাঁকে সৃহহারা ও দেশত্যাগে বাধ্য করত। তারপরেও তিনি তাদের জন্য বদ দোয়া করতেন না এবং তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছিলেন। যা মানুষের জন্য খুবই অনুসরণীয় আদর্শ। যেমন তিনি বলেন, 'দশটি কাজ স্বভাব ধর্মের অর্ন্তগতঃ গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মস্ওিয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙগুলের গ্রন্থি ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম মু ন করা এবং পানি কম খরচ করা। তিনি মানুষকে এমন অতি সূক্ষ্ম আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যা পৃথিবীতে অন্য কেউ দিতে পারেন নাই।

২. পারিবারিক জীবনে আদর্শ : পরিবার রাষ্ট্রের দ্রুততম একক। আর আদর্শ পরিবার সুন্দর-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। এই পারিবারিক জীবনে রাসূল [সা] অনুপম আদর্শের প্রতীক। পারিবারিক জীবনে তিনি পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ, ছোট-বড় সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এমনকি পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের অধিকারও নিশ্চিত করেছেন এবং পারিবারিক কাজে

www.pathagar.com

স্ত্রীদের সহযোগিতা করেছেন। এমনকি চাঁদনী রাতে মা আয়েশা [রা] সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। তিনি আয়েশা [রা] কে বলেন তোমরা দিনের আলোতে এবং রাতের আঁধারে আমার মধ্যে যা দেখ তা মানুষের নিকট প্রকাশ কর। মা আয়েশা [রা] কে রাসূল [সা] এর জীবন চরিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলেন : আল-কুরআন হলো তাঁর জীবন চরিত। পারিবারিক জীবনে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা সকলের জন্য অনুসরণীয়।

৩. সামাজিক জীবনে আদর্শ : পৃথিবীর আদি মানুষ হযরত আদম [আ] হতে সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। অত:পর প্রাথমিক যুগ থেকে মানবসমাজের ক্রমবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটে। নানা ধরনের জাগতিক মোহ ও শয়তানের কু-মন্ত্রণায়, গোত্র, সম্প্রদায় ভেদে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরস্পর শত্রুতা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "মানবজাতি একই সমাজভুক্ত ছিল, অত:পর তাঁরা বিভেদ সৃষ্টি করল"। [সূরা- ইউনুস : ১৯] আর রাসূল [সা] এর আগমনের প্রাক্কালে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিপর্যয় ও ঝুঁবিপূর্ণ। সামাজিক অনাচার পাপ পঙ্কিলতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে তারা সব সময় মদ, যুদ্ধ আর নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমনকি তারা পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। এমন বিপর্যয় পূর্ণ অবস্থায় ওহীবিহীন জিন্দেগির ৪০টি বছর সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্মসূচির উদ্যোগ নিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে নৈতিকতার চরম বিপর্যয়ের সে যুগেও উদভ্রান্ত মানুষগুলোর ইস্পাত কঠিন হৃদয়কে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সামাজিক সকল অনৈক্য ভুলে একই সূত্রে আবদ্ধ হতে নিদের্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওনা।" [সূরা আলে ইমরান-১০৩] শুধু তাই নয় আল কুরআনে এবং আল হাদিসে মুসলমানদের পরস্পর ভাই ভাই বলে ঘোষণা করেছেন। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহা নবী [সা] বলেছেন: 'সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয় যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' তিনি আরও ঘোষণা করেছেন: 'যে ব্যক্তির বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না সে আমার দলভুক্ত নয়'। [সুনানু আবু দাউদ] তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন: 'প্রত্যেক মুসলমানের ধন সম্পদ, জান ও ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র আমানত হিসাবে জানবে'। তিনি আরবের সেই জাহেলি সমাজকে সোনালী সমাজে পরিণত করেছিলেন কাউকে আহ্বান করে, কাউকে সতর্ক করে, আবার কাউকে ভালোবেসে কাছে টেনে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুণভাবে উপেতি। মানুষের রচিত মনগড়া মতবাদের যাঁতাকলে মানবতা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এ থেকে বাঁচতে হলে রাসূল [সা] এর অনবদ্য জীবনের এক বিশাল সমুদ্রে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে। কারণ একদা এখান থেকেই পৃথিবীর পথহারা, অচেতন, অর্ধচেতন, তৃষ্ণার্ত মানুষগুলো পেয়েছিল পথের দিশা।

www.pathagar.com

৪. অর্থনৈতিক জীবনে আদর্শ : ইসলাম পূর্ব আরববাসীরা অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করত। তারা লুণ্ঠন, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করত। সুদ ছিল অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আর রাসূল [সা] এগুলো সবকিছু হারাম ঘোষণা করে দেন। তিনি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেন। তিনি সম্পদের মালিকানাকে সুরার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্পদ যাতে কথাও কুক্ষিগত না হয় সে লক্ষ্যে অর্থলগ্নীকে উৎসাহিত করেছেন। সম্পদ অপচয় ও অপব্যয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন যদিও তা নিজের হয়। তিনি সুদ এবং মজুতদারীকে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছুলোকের হাতে কুক্ষিগত না হয়। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন: "যাতে সম্পদ তোমাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।' [সূরা আল হাশর : ৭] মহানবী [সা] বলেছেন: 'সাদাকা হলো দলিল'। তিনি গ্রাম ও শহরের যাকাত দাতাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে; প্রথমে গ্রামের গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা করতেন। রাসূল [সা] এর প্রণীত অর্থনীতির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছিল। ফলে খলিফা হযরত ওমর [রা] খলিফাতের সময় যাকাত দেয়ার জন্য পথে-পথে ঘুরেও যাকাত গ্রহণ করার মত কোনো লোক পাওয়া যেত না। তাই এ কথা বলতেই হয় অর্থনৈতিক মুক্তিতে রাসূল [সা] এক মাত্র পথপ্রদর্শক।

৫. শিক্ষা জীবনে আদর্শ : শিক্ষা ক্ষেত্রের রাসূল [সা] যে পথ দেখেছিলেন ইতিহাসের পাতায় তা বিরল। বিশেষ করে জ্ঞান- বিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দ্বার্থহীন কণ্ঠে বলেছেন জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরজ'। [বায়হাকী] আবার এ জ্ঞানার্জনের জন্য উত্তম প্রতিদানের কথাও বলেছেন। তাঁর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছিল তাও ছিল "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। [সূরা আল আ'লাক : ১] তিনি ছিলেন জ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি বলেছেন 'আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরি'। অপর দিকে পবিত্র কুরআন মজিদে ইলম তথা জ্ঞান শব্দটি এসেছে ৬২৪ বার। রাসূল [সা] এমন সব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতিকে অব্যাহত রাখার গ্যারান্টি প্রদান করেছে। কারণ এতে সকলের অধিকার রয়েছে, ইহা কারো জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত নয়। এর ব্যাপকতার জন্য রাসূল [সা] বদর যুদ্ধের বন্দিদের শিক্ষার বিনিময় মুক্ত করে দেন। তাঁর জামানায় রাষ্ট্রীয়ভাবে লেখার কাজে ৫০ জন লেখক নিয়োজিত ছিল। মহানবী [সা] এর হিজরতের পর মসজিদে নববী কেন্দ্রীক "সুফফা" প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পৃথিবীর ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছেন।

৬. বিচার ব্যবস্থায় আদর্শ : -এ বিশ্বাসের সমাজে বিচারব্যবস্থা বলতে কোনো কিছুই ছিল না। সে সময় রাসূল [সা] ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আমাদের ন্যায় বিচারের পথ দেখেয়িছেন। তাঁর বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বাদ-বিসম্বাদকারীদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করা। যেমন

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "মানুষের মাঝে যখন বিচার করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে।" [সূরা আন নিসা : ৫৮] মদিনা নামক মডেল রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ [সা]। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা বিধান মতে তাদের মধ্যে বিচার করুন"। [সূরা আল মায়িদাহ : ৪৮] তাঁর বিচারব্যবস্থায় ছিল না কোন দলীয়করণ, আত্মীয়প্রীতি, স্বজনপ্রীতি। তিনি ছিলেন সকল মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে। একদা এক মহিলাকে চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দিলে, মহিলার বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে কিছু সাহাবী হাত না কাটার সুপারিশ করেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা জেনে রাখ আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি আজ চুরি করত তাহলে তার হাতও কেটে ফেলতাম।' তিনি অন্যান্য ধর্মালম্বীদের প্রতিও ছিলেন ন্যায় বিচারক। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মালম্বী নাগরিকদের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতেন। শুধু তাই নয় তাদের দেব-দেবিদের গালি দিতে বা কটাক্ষ করতেও নিষেধ করেছেন।

৭. জিহাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ : ইসলামে জিহাদ ফরজ বলে ঘোষণা করেছে। তবে তা আক্রামণাত্মক নয় বরং আত্মরক্ষামূলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে আল্লাহর পথে তাদের সাথে তোমরা লড়াই কর তবে সীমা লঙ্ঘন করো না।" [সূরা বাকারাহ : ১৯০] মহানবী [সা] এর ২৪ বছরের নবুয়তী জিন্দেগিতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেছেন। সরাসরি ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর এ সকল যুদ্ধ ছিল মানবতার মুক্তির জন্য। তায়েফের ময়দানসহ শত শত ঘটনা তাঁর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্ত হলো যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সেখানেও তিনি ছিলেন মানবতার কল্যাণে মগ্ন। হিংসা বিদ্বেষ কোনো কিছুই তাঁকে উত্তেজিত করতে পারেনি। আধিপত্য বিস্তার, রাজ্য দখল তাঁর মূলনীতি ছিল না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার মুক্তি ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সেনাবাহিনীর প্রতি তার নির্দেশ ছিল, যে "কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না। গণিমতের মাল আত্মসাৎ করবে না।" মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নির্দেশ দেন, আহত ব্যক্তির উপর হামলা চালাবে না। পলায়নরত ব্যক্তির পিছু ছুটবে না, যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলবে না।" তিনি আরও বলেন "সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিবে না এবং তাদের উপাসনালয় ভাঙবে না, ফলের বাগান, গাছ ও ফসল নষ্ট করবে না। বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সবকটি যুদ্ধে তাঁর মোকাবিলায় ১৫ হাজারের বেশি লোক আসে নাই। তারমধ্যেই ৭৫৯ জনের বেশি হতাহতও হয়নি। আরবের ন্যায় মরুভূমির বুকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে চরম উচ্ছৃঙ্খল, হিংসুটে, দাঙ্গাবাজ, মানু খেকো গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে একটি নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। 'কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের পর মুসলমানগণ যে পরিমাণে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা খ্রিস্টান জাতিসমূহকে লজ্জিত করে।' সুতারাং শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ [সা] ছিলেন অতুলনীয়।

৮. আন্তর্জাতিকে এক আদর্শ : মহানবী [সা] এর আন্তর্জাতিক নীতির মূল কথা ছিল বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বই সারা বিশ্বের মানুষকে একই সুতায় গ্রোথিত করতে

www.pathagar.com

সক্ষম। ভাষা, বর্ণ, পেশাগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তা মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ। সকল মানুষই এক সম্প্রদায় ভূক্ত। আদি পিতা হযরত আদম [আ] থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা অযৌক্তিক। কেননা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ঐক্যের এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী [সা] পারস্পরিক সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন: 'হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি। যেন তোমরা পৃথকভাবে পরিচিতি লাভ করতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তাকওয়ার দিক থেকে অধিক।" সুতরাং অনারবের উপর আরবের, কালোর উপর সাদার কোনো প্রাধান্য নেই। তিনি আরও বলেছেন: 'সমগ্র মানবজাতি এক আদমের সন্তান, আর আদমের প্রকৃত পরিচয় তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন থেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবি, রক্ত ও ধন-সম্পদের সকল দাবি এবং সকল প্রতিশোধ স্পৃহা আমার পায়ের নিচে পদদলিত হলো। এ হলো তাঁর আন্তর্জাতিক নীতি। এ নীতিই পারে আন্তর্জাতিক বিশ্বে শান্তি দিতে।

উপসংহার : আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা এ কথা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো মহা নবী [সা] মানুষের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করা। তাঁর অনুসারীরা তাঁর এ আদর্শকে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন করে একটি সোনালী সমাজের ভিত নির্মাণ করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়ার পরেও আজকের সমাজ ও সভ্যতা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা হযরত মুহাম্মদ [সা] এর অবদান। তাই আজকে প্রয়োজন তাঁকে আমাদের আদর্শ হিসাবে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া। পরিশেষে জর্জ বার্নাডশ এর গ্রন্থে লিখিত উক্তি দিয়ে প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোনো নায়কের শাসনাধীনে আনীত হত তা এক মাত্র হযরত মুহাম্মদ [সা] ই সুযোগ্য নতোরূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।' অতএব বিনা দিধায় আমরা বলতে পারি যে হযরত মুহাম্মদ [সা] আমাদের একমাত্র আদর্শ মানব। ■

www.pathagar.com

মহানবী [সা] এর শিক্ষাব্যবস্থা : প্রকরণ ও পদ্ধতি

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই গোটা জাতিসত্তার অবকাঠামো নির্মিত হয়। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামকই শিক্ষা। জ্ঞান বা শিক্ষাই মানুষকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে; অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন ও জীবনের সকল ক্ষেত্র এবং বিভাগে নেতৃত্ব দানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণই শিক্ষা। ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তিও ইসলামী শিক্ষা। জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের বিস্তারে মুসলমানদের রয়েছে এক সোনালি অতীত। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনা মুসলমানদের হাতেই হয়েছিল। অথচ মুসলিম

www.pathagar.com

অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তার যথাযথ ভূমিকা পালনে অনেকাংশে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি বিশ্বাসের এ ধারাকে একেবারে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃতি ও বিকাশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার নির্দেশ প্রদানে আল্লাহর বাণী ও মহানবীর [সা] প্রতিক্রিয়া

"পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পাঠ কর তোমার পালনকর্তা মহাদয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না;" বস্তুত সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দ্বারাই মহানবী [সা] এর শিক্ষাব্যবস্থার যাত্রা সূচিত হয়। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের আরও অনেক আয়াত এবং হাদিস শরীফে আল্লাহর সৃষ্টি বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি জিনিসের গুণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা-গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রী ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য; যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [আল কুরআন, ৩:১৯০-১৯১]।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। তিনি আদমকে [আ] সকল সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন। পরে ফেরেস্তাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং বললেন- তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, যেসব জিনিস দেখছো, তন্মধ্যে কার কী নাম, কার কী গুণ? তখন ফেরেস্তাগণ জবাব দিলেন, হে মাবুদ! তুমি দয়া করে যেটুকু আমাদের শিক্ষা দিয়েছো তার বেশি আমরা জানি না। তখন আল্লাহ আদম [আ] কে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে বলেন, আদম [আ] সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হলেন [সংক্ষিপ্ত]। [আল কুরআন, ২:৩১-৩৩]

আল্লাহ মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে আরও বলেন, নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দিবা-রাত্রির বিবর্তনের মধ্যে আর সমুদ্রে মানুষের উপকারার্থে নৌযান চলাচলের মধ্যে এবং আল্লাহ তায়ালা যে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন যা দ্বারা মৃত জমিন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং সব রকম জীবজন্তু ছড়িয়ে পড়ে, আর আবহাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে আসমান ও জমিনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে সমঝদার ও জ্ঞানী লোকদের জন্য উত্তম নিদর্শন রয়েছে। [আল কুরআন, ২:১৬৪] আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, হে রাসূল আপনি বলুন যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে? সেই লোকেরাই অসিয়ত গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান। [আল কুরআন, ৩৯:৯]

মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মহানবী [সা] জ্ঞানচর্চাকে ফরজ হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি বলেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর

www.pathagar.com

পথে রয়েছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করে। [তিরমিজি ও দারেম, মেশকাত শরীফ] তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষা দাও, এটি মানুষকে আল্লাহ ভীতি শিক্ষা দেয়, যে জ্ঞানার্জন করে, সে আল্লাহকে সম্মান করে, যে তা দান করে সে যেন শিক্ষা দেয়, এ জ্ঞান যে ধারণ করে সে সম্মানযোগ্য ও শ্রদ্ধেয়। কারণ বিজ্ঞান মানুষকে ভুল ও পাপ থেকে রক্ষা করে এবং বেহেস্তের পথ আলোকিত করে। হযরত আয়েশা [রা] বলেন, আমি রাসূল [সা] কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট অহি পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম তলবের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়েছি তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব। ইবাদত অধিক হওয়া অপেক্ষা ইলম অধিক হওয়া উত্তম। দীনের তথা ইলম ও আমলের আসল হচ্ছে শোবা-সন্দেহের জিনিস হতে বেঁচে থাকা [বায়হাকী শো' আবুল ঈমান]। হযরত আবু হুরাইরা [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যার সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে তা হচ্ছে ইলম, নেক সন্তান এবং সদকায়ে যারিয়াহ্। [মেশকাত শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রা] বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ [সা] তার মসজিদে [সাহাবীদের] দু'টি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন [এক মজলিস দু'আর এবং অপর মজলিস ইল্‌মের]। তখন রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে আছে, তবে এক মজলিস অপর মজলিস হতে উত্তম; যারা দু'আর মজলিসে আছে তারা অবশ্য আল্লাহকে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তাদের তা বারণও রাখতে পারেন। কিন্তু অপর দলটি যারা ফিকহ্ বা ইলম শিক্ষা করছে এবং যারা জানে না তাদের শিক্ষা দিচ্ছে; এরাই উত্তম। আর আমিও মু'আল্লিম বা শিক্ষাদাতা রূপেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ [সা] এ দলের সাথেই বসে গেলেন। সহীহ-আল বুখারী শরীফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে সে প্রচুর লাভ করে, আর যে ব্যক্তি কোন পথচলাকালে জ্ঞান লাভ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' আল কুরআনে এ ধরনের অসংখ্য আয়াত ও মহানবী [সা] এর অগণিত হাদিস মুসলিম নর-নারীকে যে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে মূলত তারই বাস্তবায়ন মহানবীর শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষা সম্প্রসারণে মহানবীর [সা] প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

রিসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হবার পর মহানবীর [সা] ওপর দ্বীন প্রচারের অংশ হিসেবে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং পৃষ্ঠপোষকতাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। ফলে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হিজরত পরবর্তী জীবনে মহানবী [সা] মসজিদকে মূল শিক্ষায়তন হিসেবে গ্রহণ করে সকল মুসলমানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যকীয় করে দিলেও মূলত মক্কায় অবস্থানকালেই নওমুসলিম কিংবা যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন

www.pathagar.com

এমন অমুসলিমদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সাফা পাহাড়ের পাদদেশে বিশিষ্ট সাহাবী আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেন। সে হিসেবে দারুল আরকামই ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রাসূলুল্লাহ [সা] স্বয়ং এখানে শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা], হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব [রা], হযরত ওসমান ইবনে আফফান [রা], হযরত আলী ইবনে আবি তালিবসহ [রা] প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ এখানকার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন। মদিনায় হিজরতের পূর্বে আকাবার শপথের মাধ্যমে যারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাদের প্রশিক্ষিত করতে তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমাইরকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী [সা] এর হিজরতের সময় দারুল আরকামে শিক্ষাদানের জন্য হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম ও মাসআব বিন উমাইরের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হিজরতের পর মক্কায় অবশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে দারুল আরকামের মাধ্যমেই দাওয়াতে ইসলামের কর্মকাণ্ড জারি রাখা হয়।

নবুওয়তের প্রথমদিকে বিশেষত মাক্কী জীবনে ইসলামের বুনিয়াদি জ্ঞান ও ইবাদতের নিয়মকানুন শিক্ষাগ্রহণই পাঠ্যভুক্ত ছিল। এ সময়কার পাঠ্যসূচিতে আল কুরআনকেই প্রধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তা ছাড়া কিছুসংখ্যক সাহাবীকে তিনি পবিত্র কুরআনের লিপিকার হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার জন্য তাদেরকে হস্তলিপিবিশারদ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। হজরত উমর [রা] ইসলাম গ্রহণকালে তার বোন ফাতিমার নিকট সূরা ত্ব-হার লিখিত হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছিল।

হিজরত উত্তরকালে মহানবী [সা] মসজিদে নববীতে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দান করতেন; যা ইতিহাসে 'মাদ্‌রাসাতুস সুফফা' নামে অভিহিত ছিল। দূরদূরান্ত থেকে মুসলমানগণ এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে গিয়ে স্বগোত্রের লোকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর হওয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদকে [রা] মসজিদে নববীর প্রথম শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উবাদা ইবনে সামিত [রা] শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের 'প্রতিজন যুদ্ধবন্দীর মুক্তির জন্য ১০ জন মুসলমানকে শিক্ষা দেয়ার শর্তে মুক্তি' দিয়ে তাদেরকেও শিক্ষক হিসেবে কাজে লাগান। তারা মূলত অক্ষর জ্ঞান তথা ভাষাজ্ঞান তৈরিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতো। প্রথম দিকে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশজন। পরবর্তীতে এ সংখ্যা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহানবীর [সা] যুগের যে কয়জন ক্বারী, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, ফকিহর সন্ধান পাওয়া যায় তারা এ শিক্ষায়তনেরই ছাত্র ছিলেন।

মাদ্‌রাসাতুস সুফফার সঠিক নিয়মে পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের জন্য মহানবী [সা] একজন আরিফ বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আবু বকর [রা] এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময়ে তার অনুপস্থিতিতে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আশফা [রা] ও মুয়াজ ইবনে জাবালকে [রা] এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের খাওয়া-পরার জন্য শহরের সচ্ছল ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব

www.pathagar.com

দেয়া হতো। তবে সেখানকার শিক্ষার্থীরা অনেকেই অন্যের সাহায্য নিতে পছন্দ করতেন না। তারা কাঠ কেটে, পানি সরবরাহ করে এবং ছোটখাটো ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে লেখাপড়া করতেন। এমনকি তারা অন্যজনের খরচ নির্বাহের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতেন।

মসজিদে নববী ছাড়াও সেই সময় মদিনায় কয়েকটি স্থানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে ইসলামের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মসজিদ-ই-বনি যুরায়েখ, মোকামে কুবা মসজিদ, নকিমুল খাজামাত এবং মককা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানের গামীমের তালিমি মাদ্‌রাসা। মহানবী [সা] স্বয়ং এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতেন। মসজিদে কুবায় তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গমন করতেন।

শিক্ষার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পাঠ্যসূচির প্রয়োজন। এ দিক বিবেচনায় মহানবী [সা] একটি সমন্বিত সিলেবাস নির্ধারণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে আকাইদ ও ইবাদতের নিয়ম-কানুন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি, জীববিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র আকাশ বাতাস প্রভৃতির সমন্বয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ক নানা ধরনের শিক্ষা প্রদান করতেন। সাহাবীগণ শিক্ষাকে অত্যাবশ্যকীয় বা ফরজ ইবাদত জ্ঞান করে এর প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দিতেন। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনা এবং মধুর সম্পর্ক বিরাজ করতো। তারা অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, উত্তরাধিকারী আইন, চিকিৎসা বিদ্যা, ফিকহ, তাজবিদ, দর্শনসহ সময়োপযোগী পণ্য বিপণনপ্রক্রিয়াও রপ্ত করতে পারতো। যুদ্ধবিদ্যা ও সমরাস্ত্র তৈরিতেও তারা পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিশেষকরে হযরত যায়িদ বিন সাবিত [রা] ফারায়িজ শাস্ত্র বা উত্তরাধিকারী আইন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] তাফসির শাস্ত্র, হযরত হাসসান বিন সাবিত [রা] সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। গ্রিক, কিবতি, ফারসি, হিব্রু, ইথিওপীয় প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও মহানবী [সা] ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

নারী শিক্ষাকে মহানবী [সা] সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন। পুরুষদের মতো মহিলাদেরও জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছেন। হিজরতের পরে তিনি সপ্তাহে একদিন শুধুমাত্র মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সময় দিতেন। মহিলাদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নানা প্রশ্নের জবাবও দিতেন তিনি। উম্মুল মুমিনীন আয়শা [রা], হাফসা [রা], উম্মে সালমাসহ [রা] অনেক মহিলা সাহাবীকে তিনি উঁচুমানের শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। তারা পবিত্র কুরআন হিফযসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহানবীর [সা] ওফাতের পরেও তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন।

www.pathagar.com

পরিশেষে বলা যায়, মহানবী [সা] এর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একটি মৌলিক রেখাচিত্র। সেই চিত্রের সীমারেখা ছুঁয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে তা আরো সময়োপযোগী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] এর অনুকরণে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করেন। আল কুরআনের বিশুদ্ধ চর্চার জন্য তিনি পাথর, কাপড়, কাঠ, চামড়া ও গাছের পাতায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ আল কুরআনের পাণ্ডুলিপিসমূহকে যায়েদ বিন সাবিতের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করে একটি মাসহাফ তৈরির ব্যবস্থা করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর [রা] আল কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সহযোগী হিসেবে আরবি কবিতা পাঠের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আল কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি মক্কা ও মদিনা ছাড়াও বসরা, কুফা, দামেস্ক, ফুসতাত, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তার শাসনামলেই শিক্ষকগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদান করা হয়। হযরত ওসমান [রা] মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, আলেপ্পো, হিম্‌স প্রভৃতি স্থানে দার্‌স প্রদানের জন্য নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সাম্রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী [রা] মহানবী [সা] এর অহি লেখক, ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এবং একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। হযরত আলীর [রা] আমলেই বসরা ও কুফাতে ব্যাপকভাবে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। তখন মক্কা ও মদিনার দার্‌সগাহসমূহে কেবল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ [সা] এর শিক্ষাই দেয়া হতো। কিন্তু কুফা ও বসরাতে আবরি ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের চর্চাসহ হস্তলিপি, আবৃত্তি ও কাব্যচর্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাধারণ সাহাবী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী, এমনকি ইসলামী সাম্রাজ্যের খলিফা পর্যন্ত যখন যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার জন্য তারা রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতকালে আল কুরআন, হাদিস, আরবি কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ফিকহ, তাসাউফ, মানতিক, ভূগোল, রসায়ন, জোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রাণিতত্ত্ব, স্থাপত্য শিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং মহানবীর [সা] শিক্ষাপদ্ধতি ছিল যুগোপযুগী একটি মডেল। সময়ের সাথে সাথে তা বিকশিত হয়ে শুধু ইউরোপ নয় গোটা বিশ্বকেই আলোকিত করেছিল। কিন্তু আজ দুর্ভাগা মুসলিম জাতি সে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আধুনিকতার মোড়কে জাহিলিয়াতকেই বরণ করে নিচ্ছে। তাই আবারো আহ্বান, পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ■

www.pathagar.com

কোমলতা মহানবীর [সা] জীবনের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য

এ কে আজাদ

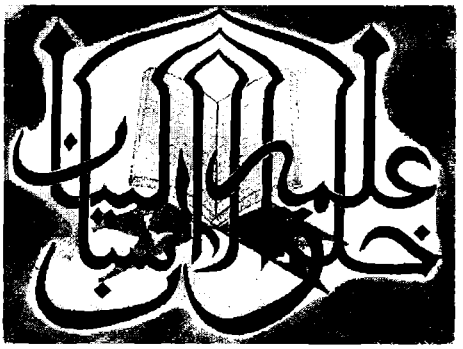

হযরত মুহাম্মদ [সা] হলেন পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ। বাস্তবিক কারণেই তাঁকে অতি উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মাত্র চার বছর বয়সেই হযরত জিবরাইল [আ] ও হযরত মিকাইল [আ] ফেরেস্তাদ্বয়ের মাধ্যমে তাঁর সিনা চাক করে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকে তাঁকে মুক্ত করা হয়। তাই তো তাঁর চরিত্রে নূন্যতম কালিমার চিহ্নটুকু পর্যন্তও ছিল না। বোধ করি, সেকারণেই মহানবী [সা] এর দ্বীপ্ত ঘোষণা- উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধণের নিমিত্তেই আমি প্রেরিত হয়েছি। [আহমদ, হাকিম ও রায়হাকী] রাসূল [সা] এর এই উত্তম চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- কোমলতা। কোমল আচরণের মাধ্যমেই তিনি জয় করেছেন গোটা বিশ্ব।

মহানবীর জীবনে কোমল আচরণ

মহানবী [সা] তাঁর কোমল আচরণের সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে সকল মানুষকে কাছে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কোমল

www.pathagar.com

আচরণে মানুষ যেমন বিমুগ্ধ হয়েছে, তেমনি পুলকিত হয়েছে। একটি ফুলের চার পাশে সবুজ পত্র পল্লব যেমন ঘিরে থাকে তেমনি মহানবী [সা] এর চারপাশেও গড়ে উঠেছে চির সবুজ মানুষদের ভীড়। তাঁর চরিত্রের কোমলতার কারণে? কেউই তাঁকে ছেড়ে যায়নি। তাঁর চরিত্রের অপূর্ব সম্মোহনী শক্তির বলয়ে জড়িয়ে গেছে সকলেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ঐশী বাণীর মাধ্যমে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। পবিত্র কুরআন শরীফের সুরা আল ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন: "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল দিল এবং সহৃদয় হয়েছেন। যদি বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে লোকেরা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতো।"

পবিত্র কুরআনের আলোকে নবী করিম [সা] ছিলেন কোমল চরিত্রের প্রতিভূ। তবে তাঁর সে কোমলতার মূল ভিত্তি ছিল ইমানের ভিত্তি। আর তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ, মানবতার কল্যাণ। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল [সা] বলেন "মুমিন হচ্ছে প্রেম ভালবাসার উজ্জ্বল প্রতীক। যে ব্যক্তি না কাউকে ভালবাসে আর না কেউ তাকে ভালবাসে, তার ভেতর কোন কল্যাণ নেই।" [আহমদ, বায়হাকী]

মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে রাসূল [সা] বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোমল স্বভাব থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।" তিনি আরও বলেন- "যারা মানুষের উপর রহম করে, আল্লাহও তাদের প্রতি রহম করে, তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি [কোমল হও] রহম কর, আসমানবাসীও তোমাদের প্রতি [কোমল হবেন] রহম করবেন।" [আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে উমার রা]

যারা মানুষের প্রতি কোমল ও সহৃদয় আচরণ করে না তাদের ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেন - "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি কোমল আচরণ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।" [তিরমিজি, ইবনে আকাস রা]

তবে যারা খোদাদ্রোহী, যাদের ভেতরে - ঈমানের লেশ মাত্র নেই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সাথে কোমল আচরণ না করে কঠিন আচরণ করার ব্যাপারে রয়েছে মহান আল্লাহ পাকের ইঙ্গিত। পবিত্র কুরআন শরীফের সুরা ফাতহ্ এর ২৯নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- "আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ [সা] এর তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি রহমশীল।" সূরা মায়েদার ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন- "তারা মুমিনদের প্রতি বিনয় - নম্র হবে।"

সূরা আরাফের ১৯৯নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে- "নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর।"

www.pathagar.com

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর চরিত্রের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- কোমলতা। তাঁর চরিত্রের অনুপম আদর্শ কোমল হৃদয় দিয়েই তিনি গড়েছিলেন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা হুজরাত এর ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে -"ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন" - মুমিনরা তো একে অপরের ভাই।" এই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য চাই কোমল হৃদয় এবং নম্র আচরণ। সে কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত রসূলের মধ্যে এমন কোমলতার বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন পরিপূর্ণরূপে। হযরত মুহাম্মদ [সা] যেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের নেতা হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ ছিল তাঁর চরিত্রের কোমলতা। তাঁর চরিত্রের এই মাধুর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমনকি তাঁর পরম শত্রু যে বুড়ি তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, সেই বুড়িও তাঁর কোমল আচরণে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রসূলের কোমল আচরণের বিস্ময়কর প্রভাব পড়েছিল মানব সমাজে যা আজও প্রকৃত মুসলমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ভ্রাতৃত্বের জন্য কোমনীয়তা যেমন প্রয়োজন, নেতৃত্বের জন্যও তেমন কোমলতার প্রয়োজন। মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো- কোমল আচরণ। দেশ ও জাতির কল্যাণেই সকলকে এই মানবিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা দরকার। মিশনারী জাতি হিসেবে প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত রসূল [সা] এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। ■

গ্রন্থ সহায়িকা

১। মহানবী [সা] এর জীবনচরিত- ড. মুহাম্মদ হোসাইন হারকল-
অনুবাদ - মাও আব্দুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২। ইসলামী আদব - ড. মারওয়ান ইবরাহীম আল কাইসি-
অনুবাদ- ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৩। ইসলাম [একমাত্র সহজ সরল সঠিক পথ] মুহাম্মদ শামসুজ্জামান- নভোনীল প্রকাশনা।
৪। ইসলামের সামাজিক বিধান- আল্লামা জমাল আল বাদাবী-
অনুবাদ- আবু খালদুন আল মাহমুদ ও শারমিন ইসলাম- [দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস]
৫। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক - খুররম জাহ্ মুরাদ
অনুবাদ- মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান - আই সি এস প্রকাশনী।
৬। চাই প্রিয় ব্যক্তি, চাই প্রিয় নেতৃত্ব - আব্দুল শহীদ নাসিম - আধুনিক প্রকাশনী।
৮। এন্তেখাবে হাদীস- আব্দুল গাফফার হাসান নাদভী।

www.pathagar.com

বিশ্ব নবীর [সা] ন্যায় বিচার

এম. মুহাম্মদ আবদুল গাফফার

মাহে রবিউল আউয়াল আবারো বছর ঘুরে বিশ্ব মানবতার দ্বারে ইনসাফ ও ন্যায্য অধিকারের বার্তাবাহক সাইয়্যেদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ইহলোকে আগমন এবং পরলোকে গমনের ঘোষণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মহানবী [সা]-এর এ পৃথিবীতে আগমন ছিল একটি অতুলনীয় বিপ-বের পরিপূর্ণ রূপদানের চূড়ান্ত পর্ব। বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রবক্তরা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মিথ্যা ধুয়া তুলে দুর্বল ও অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে। মানবাধিকারের এসব সোল এজেন্টরা তাদের পাশবিক শক্তির অশুভ পাঁয়তারার মাধ্যমে নিজেদের পশুবৃত্তিই যে চরতিথি করছে তাতে সন্দেহ নাই বললেই চলে। বর্তমান বিশ্বের মানবাধিকার, শিশু ও নারীর প্রতি আচরণ এবং বিচারব্যবস্থার সাথে মহানবী [সা]-এর ব্যবস্থা দিচ্ছিল পক্ষপাতহীন, আদল ইনসাফ তথা নির্ভেজাল তৌহিদী আদর্শপ্রসূত মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল [সা]-এর বিচারব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সবার প্রতি সমঅধিকারের ভিত্তিতে সর্বগ্রাহ্য উন্মুক্ত, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি ও ন্যায় ইনসাফের মানদ কে সর্বোচ্চ স্থাপনের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। আল্লাহর রাসূল [সা] যে বিচারব্যবস্থার মূলনীতি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে গেছেন, তার ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআনুল কারীমের অলঙ্ঘনীয় দিকনির্দেশনা। বিচার এবং সাক্ষী যে ব্যাপারই হোক না কেন সেখানে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, প্রতিহিংসা চরতির্থ, হীনস্বার্থ তথা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, এসবই হলো সম্পূর্ণ অবৈধ। এ মর্মে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন হে ঈমানদারগণ তোমরা ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরিব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহর এ অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখবে। অতএব, নিজেদের নফসের খাহেশের [প্রবৃত্তির কামনার] অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা হতে বিরত থেকো না। তোমরা যদি [কারোর] মন রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাকো তবে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত [সূরা নিসা, আয়াত নং-১৩৫]। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ ভাষণের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নই ছিল মহানবী [সা] এর তামাম কর্মজীবন। বিশ্বনবী [সা]–এর প্রতিষ্ঠিত এ তুলনাহীন ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, যা পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন গণের আমলেও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রের উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আমীর-ফকির, মুসলিম-অমুসলিম, আত্মীয় ও অনাত্মীয় কারোর প্রতি কোনোরূপ আনুকূল্য কিংবা বৈরিতা প্রদর্শনের সুযোগ দান মহানবী [সা] মোটেই বরদাশত করতেন না। কোনো এক সময় একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে শরীয়তের বিধান মোতাবেক তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে হাত কাটার আদেশ দেয়া হয়। এই মহিলা ছিল যেহেতু সমাজের খুবই প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান পরিবারের সন্তান। সেহেতু শাস্তি কিছুটা লাঘব করা যায় কি না এ প্রসঙ্গটি জনাব রাসূলে খোদা [সা]-এর দরবারে সাহাবীদের কেউ কেউ উত্থাপন করলে মহানবী [সা] তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও আজ এ অপরাধে অপরাধী হতো তাহলে আমি স্বয়ং স্বহস্তে আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী যে রায় হতো তা কার্যকর করতাম। এভাবে মহানবী [সা] ধনী, গরিব, আত্মীয়, অনাত্মীয়, প্রভাবশালী ও অপ্রভাবশালী, প্রতিপত্তিশালী এবং প্রতিপত্তিহীন সবার জন্য সমঅধিকার তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একদা একজন মুসলমান ও তাঁর প্রতিপক্ষ একজন অমুসলিম একটি শালিস নিয়ে বিশ্বনবী [সা]-এর দরবারে হাজির হলো। উভয়ের জবানবন্দি ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অমুসলিম ব্যক্তি নির্দোষ সাব্যস্ত হলে আল্লাহর রাসূল [সা] মুসলমান ব্যক্তিটির বিপক্ষে অমুসলিম লোকটির পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে মুসলমান

www.pathagar.com

লোকটি অসন্তুষ্ট হয় এবং এ আমলটি পুনরায় হযরত ওমর [রা]-এর কাছে উত্থাপন করে। হযরত ওমর [রা] বিষয়টির আদ্যোপান্ত অবহিত হয়ে উক্ত মুসলমান ব্যক্তিটিকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর থেকে হযরত ওমর [রা] "ফারুক" নামে অভিহিত হন, যার অর্থ সত্য ও মিথ্যা তথা ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়কারী।

মহানবী [সা] নারীর অধিকার তথা নারী জাতির যথাযথ মর্যাদাদানে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। জনৈক সাহাবী [রা] তাঁর পিতামাতার অধিকারের বিষয় জানতে চাইলে তিনি সর্বাগ্রে তাঁর মায়ের অধিকার আদায়ের তাগিদ প্রদান করেন। উক্ত সাহাবী আল্লাহর [সা]–কে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি ৩ বার তাঁর মায়ের অধিকার আদায়ের তাগিদ প্রদান করেন এবং চতুর্থবার তাঁর পিতার অধিকার আদায়ের তাগিদ প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম মহিলারা পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি তাদের রসদ সরবরাহ, চিকিৎসা ও সেবিকার দায়িত্ব পালন করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। উহুদ, খন্দক, হুনায়ন, খায়বর, কবিন মুস্তালিকসহ অসংখ্য যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে বিশ্ব ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন মুসলিম রমণীগণ। মহানবী যে কোনো সফরে বের হওয়ার সময় উম্মুল মুমিনীনদের কাউকে না কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। মক্কার মুশরিকদের সাথে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল মহানবী [সা] তাঁর অন্যতম স্ত্রী উম্মে সালমা [রা]–এর পরামর্শক্রমে স্বীয় কর্তব্য সর্বাগ্রে পালন করে সকল সাহাবীকে তাঁর অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রের মুসলিম মহিলাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা [রা] থেকে যত হাদিস বর্ণিত আছে একমাত্র হযরত আবু হুরায়রা [রা] ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী [রা] থেকে এত অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়নি। ইসলামী আইন শাস্ত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা] ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ। ইমাম জহুরী [রা] হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা] সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ঐ সময়ের সমস্ত পুরুষদের ইলম বা বিদ্যা যদি ওজনের এক পাল্লায় আর হযরত আয়শা সিদ্দিকা [রা]-এর ইলম অন্য পাল্লায় উঠানো হতো আয়েশা [রা] এর পাল্লাটাই সবচেয়ে ভারি হওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি ছিল।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রতিপক্ষ মহিলারা সক্রিয়ভবে অংশগ্রহণ করলেও আল্লাহর রাসূল [সা] স্বীয় সৈন্য দলকে তাদের ওপর আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে একটি হাদিস এভাবে বর্ণিত আছে আন ইবনে উমারা ক্বয়ালা ওজাদাত ইমরাতুম মাকতুলাতুন ফি বা আদি মাগাযি রাসূলিল্লাহি [সা] ফানাহা রাসূলুল্লাহ [সা] আন কাতলেন্নিসায়্যি ওয়াসছিবিয়আন অর্থাৎ ইবনে উমর [রা] বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কোনো একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন। সহীহ আল বুখারী [হাদিস নং-২৭৯৩]। এর পূর্ববর্তী একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল শুধু নিষেধই করেননি তিনি এ কাজকে ঘৃণাও করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে উহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার

www.pathagar.com

একটি রণক্ষেত্র। এ যুদ্ধে অভিজাত কুরাইশ রমণীগণও পুরুষ যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর অধিনায়ক আবু সুফিয়ানের স্ত্রী বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ সেনাপতি উতবার কন্যা হিন্দার নেতৃত্বে কুরাইশ মহিলা বাহিনী ঢোল বাজিয়ে মুশরিক বাহিনীর পতাকাবাহী বনু আবদুদ দারের লোকদের পিছু পিছু চলতে লাগলো এবং এই কবিতার ছন্দ আবৃত্তি করে তাদের উত্তেজিত করতে লাগলো :

"চমৎকার হে বনু আবদুদ দার,
চমৎকার [তোমাদের তৎপরতা] হে পশ্চাৎ দিকের রক্ষকগণ।
প্রতিটি ধারালো তরবারী দ্বারা আঘাত হানো।"
যদি ধাবমান থাক, আলিঙ্গন করবো এবং
নরম গদি বিছিয়ে দেবো
আর যদি পিছিয়ে যাও
আলাদা হয়ে যাবো,
আমাদের ভালোবাসা পাবে না তোমরা।"
[সিরাতে ইবনে হিশাম]।

উহুদ যুদ্ধে মহানবী [সা]-এর দেয়া তরবারী দিয়ে আবু দুজানা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে ছিলেন। তিনি হিন্দা বিনতে উতবার মাথার ওপর তরবারী উত্তোলন করেছেন কিন্তু [আল্লাহর রাসূল [সা] এর নিষেধের কথা মনে হতেই পরক্ষণেই তরবারী নামিয়ে নিলেন।" [সিরাতে ইবনে হিশাম]। যুদ্ধের ময়দানে কাফির বাহিনীকে উক্ত মহিলা এবং তার সহযোগীরা উত্তেজিত করতেছিল, আবু দুজানা তরবারী উত্তোলন করতেই সে আর্তচিৎকার করে উঠলো। আবু দুজানা [রা] তখন সে একজন মহিলা চিনতে পেরে তরবারী নামিয়ে নিলেন। এভাবে মহানবী [সা] নারীর অতুলনীয় অধিকার নিশ্চিত করে যে নীতি প্রণয়ন করেন তা বিশ্বের যেকোনো নারী অধিকারের চেয়ে অনেক গুণে শ্রেয়। শুধু নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। কোনো জটিল ও কঠিন সিদ্ধান্ত ও ক্ষেত্র বিশেষে কোনো নারী গ্রহণ করলে বিশ্বনবী [সা] তা অনুমোদন করে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছেন। এ ব্যাপারে হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনাকে উল্লেখ না করলেই নয়। মক্কা বিজয় প্রাক্কালে ইসলামের কিছু কট্টর দুশমনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদ াদেশ জারি ছিল। ইবনে হুবাইরা এ রকম এক ব্যক্তি ছিল। হযরত আলী [রা] ইবনে হুবাইরাকে গ্রেফতারের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছিলেন। ইবনে হুবাইরা উপায়ান্তর না দেখে হযরত আলী [রা] এর ভগ্নি উম্মেহানির সৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলো। হযরত উম্মেহানি জনাব রাসূলে খোদা [সা]-এর কাছে এসে সালাম করে যে কথা বললেন, তা এ রকম 'আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার আশ্রিতি অমুক ইবনে হুবাইরাকে আমার ভাই আলী [রা] হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাসূল [সা] বললেন হে উম্মহোনি

www.pathagar.com

তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছো, আমি [স্বয়ং] নিজেই তাকে যেন আশ্রয় দান করেছি [সহীহ আল বুখারী]।

এভাবে ইসলাম ও আল্লাহর নবী [সা] কট্টর দুশমন আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা ইবনে আবু জেহেল মক্কায় মুসলমানদের প্রবেশে বাধাদান করে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করে। ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম [রা] ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর স্বামী ইকরামার জন্য মহানবী [সা]-এর দরবারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে আল্লাহর রাসূল [সা] তা মঞ্জুর করেন। হাদিসে রাসূল [সা] ও সিরাত গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায়, মহানবী [সা] আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী নারী জাতির যে অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা যথাযথভাবে বর্তমানে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণেই বিশ্বে মহিলা সমাজ নিসৃহীত তথা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

অধুনা বিশ্বে এক শ্রেণীর উলঙ্গবাদী বিলাসপ্রিয় মানুষ নারী স্বাধীনতার ধুয়া আওরিয়ে নারী জাতিকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে তাদের আবরুবিহীন করে নারীকে ভোগ পিপাসুদের কামনা বাসনা চরতির্থের সামগ্রী বানিয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্বের প্রতিটি জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে পুরুষ ও নারী এ দু' শ্রেণীতে ভাগ করে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের শারীরিক গঠন, মানসিক বিকাশ, গতিবিধি, পারঙ্গম তাসহ অনেক ব্যাপারেই পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণেই সবার কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে সমাজ দেশ ও সভ্যতার জন্য কারোর গুরুত্বই কম নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার বিধান অনুযায়ী মহানবী [সা] নারী ও পুরুষকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের অবদান রাখার বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসূলের সে শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে নারীর সমঅধিকারের স্লোগান দিয়ে আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে মূলত নারী জাতিকেই অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অনুরূপ পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিক নির্দেশনা মোতাবেক বিশ্বনবী [সা] যে বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন, তার সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণেই আজ বিশ্ব সমাজে এত অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বিশ্বে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আল্লাহর রাসূল [সা]-এর আর্দশের ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। আল্লাহ আমাদের এ কাজ করার তাওফিক দান করুন [আমীন]। ■

www.pathagar.com

আল্লাহর দিকে আহবান : মহানবীর রিসালাতের প্রধান মিশন

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন

'তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহবান কর কৌশল আর সদুপদেশের মাধ্যমে। এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের যেমন জানেন, তেমনি সত্য পথের পথিকদের সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে অবহিত।' –[সূরা নাহ্‌ল : ১২৫]

মহানবীর রিসালাতের প্রথম ও প্রধান মিশন ছিল দাওয়াতের আমল বা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করা। দাওয়াত শব্দের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আহবান করা, আমন্ত্রণ জানানো। আর তাবলীগ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচার। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দাওয়াত ও তাবলীগ বলতে বুঝায় মানুষের কল্যাণ কামনায় ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যকে, এর কল্যাণকর জীবনাদর্শ ও মাহাত্মাকে সৎভাবে, শুভাকাঙ্ক্ষি ও বন্ধুত্বের মন নিয়ে বিভিন্ন সুন্দর কৌশলের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং প্রচার করা।

www.pathagar.com

দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ তথা ইসলামের দিকে, ইসলামী মূল্যবোধের দিকে মানুষকে আহবান ও এর প্রচার একটি ফরজি আমল। আল্লাহর দিকে আহবান বা দায়ী ইলাল্লাহর কাজ নামাজ রোজার মতই একটি ফরজ ও মৌলিক ইবাদত। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ও তার সাহাবায়েকেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন সহ উম্মতে মুসলিমার সকল যুগের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আল্লাহর দিকে আহবান বা দাওয়াতি কাজ মূলত একটি ইতিবাচক উদ্বুদ্ধকরণ [গড়ঃরাধঃরড়হ] প্রক্রিয়া এবং ইসলামে এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কারণ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তির কোন স্থান নেই। পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন: 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। হেদায়াতের পথ থেকে গোমরাহিকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে; এখন যে কেউ 'তাগুত'-কে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে এমন একটি মজবুত রজ্জু [অবলম্বন] ধারণ করেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।' –[সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৫৬]

বস্তুত: সমাজ পরিবর্তনের জন্য সবার আগে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত জাহেলী, খোদাবিমুখ, পৌত্তলিক ও ভোগবাদী সমাজের যে প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধে আছে তাকে ঘষে-মেজে পরিষ্কার-পরিশুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইসলামী মন-মানসিকতা তৈরি করতে হলে, মানুষের ভোগবাদী ও দুনিয়াপূজারী মনকে সংযমী ও আল্লাহমুখি করতে হলে ইসলামী আদর্শের, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাতে পয়গাম প্রচার এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তো আগে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। মানুষেরা যদি সত্যের আহবানকে না জানে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য যদি বুঝতে না পারে, তাহলে তারা জাহেলিয়াতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবে কীভাবে? একারণেই দায়ী ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে আহবান ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]সহ সমস্ত নবী-রাসূলদের জীবনের অন্যতম প্রধান মিশন। পবিত্র কোরআনে এবং মহানবীর হাদীসে এই মহান মিশন সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক আলোচনা।

আল্লাহর পথে আহবানের তাৎপর্য:

আল্লাহর পথে আহবান মূলত এটি একটি বিরাট ও ব্যাপক বিষয়। এ কাজটিকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বহুমুখী কর্মসূচী পালন করতে হয়েছিল। পবিত্র কোরআন মজিদ এবং মহানবীর সিরাতের আলোকে আল্লাহর পথে আহবান বলতে কয়েকটি বিষয়কে বুঝায়। এগুলো হল : ক. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়ার আহবান বা তাওহীদের ঘোষণা; খ. আল্লাহ'র কালাম আল কোরআনের দিকে আহবান বা কোরআন প্রচার এবং গ. খোদাভীতির দিকে আহবান বা পরকালে আল্লাহর আদালতে তাঁর কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কে মানুষকে

www.pathagar.com

সতর্ক ও সচেতন করে তোলা । এখন আমরা এ বিষয়গুলোকে আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা

যেদিন হেরা গুহায় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদের উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়, সেদিন থেকেই শুরু হয় একটি নতুন জীবনবোধের উদ্বোধন । নতুন অথচ চিরন্তন, শাশ্বত ও সনাতন । নতুন বলার একটি কারণ হল, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, সঠিক ধারণা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ পেতে থাকে সেদিন থেকেই । আর এ নতুন জীবনবোধের প্রথম পাঠই হল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা । সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের পর আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে গণসংযোগের প্রথম যে নির্দেশ দেন তা ছিল সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-এর প্রথম সাত আয়াত । তাতে বলা হয়–

'হে চাদর আবৃত্ত শয্যাগ্রহণকারী, ওঠো, সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর । আর নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ । মলিনতা অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক । আর অনুগ্রহ করো না বেশি পাওয়ার আশায় । এবং নিজের রবের জন্য ধৈর্য ধারণ কর ।'–[মুদ্দাস্‌সির : ১-৩]

আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নবুয়তী দায়িত্ব অর্পন করে সর্ব প্রথম যে নির্দেশ দিচ্ছেন তা হল গণসংযোগের নির্দেশ, মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করার নির্দেশ এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণার নির্দেশ । সাথে সাথে একজন দায়ী ইলাল্লাহর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কী কী গুণাবলী থাকতে হবে সে হেদায়াতও তিনি দিয়ে দিচ্ছেন । বস্তুত যে নতুনত্বের ইঙ্গিত সূরা আলাকে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বা তাওহীদের ঘোষণা হল সেই নতুন জীবন মিশনের প্রথম পদক্ষেপ । মূলত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য ইসলামী জীবনপদ্ধতির প্রাণস্পন্দন । এই বিশ্বলোকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য নাই – এ কথাটিই ইসলামের মূলমন্ত্র । ঠিক এ কারণেই ইসলামে 'আল্লাহু আকবার' কথাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । আযানের শুরুতেই আল্লাহু আকবার ঘোষণাটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে । মুসলমানরা নামাজও শুরু করে 'আল্লাহু আকবার' কথাটি উচ্চারণের মাধ্যমে । পশু যবেহ করতে হলেও বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলেই তা শুরু করতে হয় । বর্তমানেও তাকবির ধ্বনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত । এসবেরই কারণ হল ইসলামের নবী সর্ব শক্তিমান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের ঘোষণা প্রদানের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন ।

মনে রাখা প্রয়োজন, যে যুগ-প্রতিবেশে কোরআন নাযিল শুরু হয়, মক্কার সে সমাজের মানুষগুলো কিন্তু ধর্ম বিরোধী ছিল না । বরং তারা ছিল ধর্মনেতা । পবিত্র কাবা ঘরের খাদেম বা মোতওয়াল্লি হওয়ার কারণে সমগ্র আরবের মধ্যে কুরাইশরা ছিল নেতৃত্বের আসনে সমাসীন । সাধারণ জনগণও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, তারা প্রতি বছর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করতো । দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে

www.pathagar.com

পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় এসে মিলিত হত। মূলত এরা তো ছিল ক্বাবা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর। যার কারণে ধর্মের একটি নিশানা তখনও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মদীনার ইহুদীরাও ছিল ধর্মীয় নেতৃত্বের আসনে আসীন। তারা ছিল কিতাবধারী বা আহলে কিতাব। তাদের মধ্যে বড় বড় আলেম ও পীর বুযর্গের অভাব ছিল না। বরং ধর্মীয় কারণেই সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদের একটি প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। কাজেই বিষয়টি এমন ছিল না যে, আরবের লোকেরা ধর্ম-বিরোধী বা নাস্তিক হওয়ার কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে ধর্মপথে আনার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আসলে ধর্মভাবের কোন কমতি সে সময়েও ছিল না। বরং ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাক-জমকটা তখন একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। কোরাইশ আর ইহুদী নেতাদের মধ্যে লেবাস আর বুযুর্গীর প্রতিযোগিতা প্রকটভাবেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্মের বাহ্যিক আবরণ ও আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান থাকলেও ধর্মের মূল স্পিরিট বা প্রাণ স্পন্দন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বা তাওহীদি চেতনাই তাদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিয়েছিল। এ কারণেই পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন :

'তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, এই জমিন ও এর সকল অধিবাসী কার? যদি তোমরা জানো, তবে বল। তারা অবশ্যই বলবে, সবই আল্লাহর। জিজ্ঞেস কর, তাহলে তোমরা সতর্ক হওনা কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, অসংখ্য আকাশ ও মহান আরশের মালিক কে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, তাহলে তোমরা ভয় কর না কেন? তাদেরকে বল, তোমরা যদি জানো, তবে বল, সব জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব চলছে? আর কে আছে যিনি আশ্রয় দেন? তাঁর মোকাবেলায় আর কেউ কি আছে আশ্রয় দেয়ার? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এটা তো আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। বল, তাহলে তোমরা কেন ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছো? বরং প্রকৃত ব্যাপার হল, আমরা তোমাদের সামনে যা উপস্থাপন করেছি তাই সত্য। আর এই লোকেরা নিশ্চিত মিথ্যেবাদী।'–[আল মু'মিনুন : ৮৪-৯০]

'তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই জবাবে বলবে আল্লাহ। তাহলে কী করে তারা পিছনে ফিরে যাচ্ছে?–[আয যুখরুখ : ৮৭]

এখনকার মত তখনও আল্লাহর নামের জপ ও জিকির আজকার ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন কম ছিল না, কিন্তু আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে যথার্থ ধারণা মানুষের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিয়েছিল। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের স্থলে জায়গা করে নিয়েছিল শিরক ও পৌত্তলিকতা। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগ তখন মানুষের ছিল না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বহু মধ্যস্বত্বভোগী ধর্মীয় গোষ্ঠী। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব (পীর-আউলিয়া) ও আত্মীয়-স্বজনের দাবীদার (নাউযুবিল্লাহ) এসব

www.pathagar.com

ধর্মব্যবসায়ী মধ্যস্বত্তভোগীরাই মানুষের আসল খোদা ও ভাগ্য-বিধাতা সেজে বসেছিল। আর এই ভুল বিশ্বাস ও বিভ্রান্ত জীবনবোধের ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সে সময়ের জাহেলী সমাজ। এই বিভ্রান্ত ও ভ ধর্ম-ব্যবসায়ীদেরকে খোদায়ীর আসন থেকে সমূলে উৎখাত করা এবং জাহেলী সমাজকে সংশোধন করে নির্ভেজাল তাওহীদী চেতনার ভিত্তিতে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রাসূলের কাজ।

আর এ কাজের প্রথম পদক্ষেপ ছিল মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও অন্ধ আনুগত্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দেয়া এবং এর ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা-চেতনার পুনর্গঠন করা। এ লক্ষেই সূরা মুদ্দাস্সিরের উপরোক্ত ভাষণ নাযিল হয়। এরপর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে নাযিল হয় সূরা আল ফাতিহা। তাতে শিরক বা পৌত্তলিকতার মূল ভিত্তি পুরোহিততন্ত্র তথা ব্যক্তিপূজা ও দেবতাতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত করে করে ঘোষণা করা হয় –

'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের রব (মালিক, প্রতিপালক, অভিভাবক, শাসক, বিধানদাতা ও পরিচালক)। যিনি পরম দয়াময় ও অত্যন্ত মেহেরবান। এবং বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দাও। ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি পুরুস্কৃত করেছো। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

আসলে একটি সমাজে পৌত্তলিকতার উত্থান একদিনে হয় না। যে কাবাঘর ছিল তাওহীদের কেন্দ্রভূমি সেই কাবাঘরেই এক সময় মূর্তিপূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং তা একদিনে হয়নি। মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজা নিঃসন্দেহে শিরকের চূড়ান্ত রূপ; কিন্তু এর যাত্রা শুরু হয় ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তি বিশেষের উপর দেবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে। মূলত, কোন মানুষ বা ব্যক্তি বিশেষকে যখন অতিমানব মনে করা হয়, তখনই তার উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়। এর প্রকাশ দেখা যায় পুরোহিততন্ত্র, পীর পূজা, ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তি বিশেষের অন্ধভক্তি ও অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে ইহুদি ও খৃষ্টানরা তাদের পূর্বপূরুষ মনে করে। মক্কার কুরাইশরাও কিন্তু হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এরই বংশধর এবং পবিত্র কাবা ঘরের খাদেম বা সেবায়েত। আর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সারা জীবন তাওহীদের প্রচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ও তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাইল (আঃ) পবিত্র কাবাঘরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাওহীদের কেন্দ্র রূপেই। অথচ তাঁদেরই বংশধর মক্কার অধিবাসীরা পবিত্র কাবাঘরকে মূর্তিপূজার আখড়ায় পরিণত করেছিল। অন্যদিকে ইহুদিরা হযরত ওজাইরকে আর খৃষ্টানরা হযরত ঈশা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেছিল। এটি একদিনে হয়নি। আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিকে বড় করে তোলা তথা ব্যক্তিপূজার পথ ধরেই শত শত বছরের বিকৃতির এক পর্যায়ে পৌত্তলিকতার প্রকাশ্যরূপ মূর্তিপূজা আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

এভাবে ক্রমান্বয়ে আরো অসংখ্য আয়াত নাযিল হতে থাকে যাতে মানুষের সামনে আল্লাহর সঠিক পরিচয়, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী তুলে ধরা হয় এবং তাদেরকে সকল ধরনের অন্ধ আনুগত্য ও শিরকের পংকিলতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর গোলামী ও তাঁর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের আহবান জানানো হয়। যেমন :

'বল, তিনিই আল্লাহ, যিনি একক (অবিভাজ্য ও অদ্বিতীয়), আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন; তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' –[সূরা ইখলাস]

'বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর কোন সন্তান কিংবা সাম্রাজ্য পরিচালনায় কোন অংশীদার নেই। তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন না যে তাঁর কোন সাহায্যকারী প্রয়োজন হবে। সুতরাং তুমি তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকো।' –[বনী ইসরাইল : ১১১]

'তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে বাসস্থান করেছেন আর আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন আর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিজিক সরবরাহ করেছেন। সে আল্লাহই তোমাদের প্রভু। বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক এবং মহান মর্যাদা ও সমৃদ্ধির মালিক। তিনি চিরঞ্জীব। কার্যত তিনি ছাড়া আর কেউ যথার্থ হুকুমকর্তা ও বিধানদাতা নেই। সুতরাং দ্বীনকে (আনুগত্য বা জীবন-ব্যবস্থাকে) একান্তভাবে তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট করে তোমরা কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকো। সকল প্রশংসা কেবলমাত্র সেই আল্লাহ রাব্বুল] আ'লামীনের জন্যই।' – [আল মুমিন : ৬৪-৬৫]

'বল, নভমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার মালিক কে? বলে দাও, সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি অনুগ্রহ প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্ব বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে সবই তাঁর। তিনি সর্বশ্রোতা, সবজান্তা।' –[আনআম : ১২-১৩]

'কোন কিছু তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।' –[আশ শূরা : ১১]

'আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন তবে তিনি ছাড়া তা অপসারণকারী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন (তবে তা সম্ভব, কেননা) তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।' [আল আনআম : ১৭-১৮]

'জিজ্ঞেস কর, সবচেয়ে বড় সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দাও – আল্লাহ। তিনি তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছুবে সবাইকে সাবধান করি। তোমরা কি সাক্ষ দাও যে আল্লাহর সাথে আরো কোন আল্লাহ রয়েছে? বলে দাও আমি এ ধরনের -সাক্ষ দিব না। বল, তিনিই একমাত্র উপাস্য ও প্রভু, আমি অবশ্যই তোমাদের কৃত শিরক থেকে মুক্ত।' –[আল আনআম : ১৯]

'বল, দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। সর্বপ্রথম আমাকেই আনুগত্যের মস্তক অবনত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ... বল, আমার দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট করে আমি শুধু তাঁরই আনুগত্য-দাসত্ব করবো। তোমাদরে অবশ্য তাকে পরিত্যাগ করে যাকে ইচ্ছা তার গোলামী করেও বেড়াতে পারো ... (তবে) যারা তাগুতের (অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী) দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ।' – [আয-যুমার : ১১-১৭]

'আমরা তোমাদের প্রতি সঠিক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যে দ্বীনকে খালেছ করে কেবল তারই ইবাদত কর। সাবধান, দ্বীন একনিষ্ঠভাবে কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত ও নির্দিষ্ট।' –[আয-যুমার : ২-৩]

'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। দ্বীন একান্তভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদিত। তবুও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা ভয় করবে ?' – [আন-নাহাল : ৫২]

'তারা কি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে দ্বীন তালাশ করে? অথচ আসমান-জমিনের প্রতিটি বস্তু ইচ্ছায় হোক-অনিচ্ছায় হোক আল্লাহরই নির্দেশ মেনে চলছে। আর তারই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।' – [আল ইমরান : ৮৩]

'শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। তাঁরই নির্দেশ, তিনি ব্যতীত আর কারো আনুগত্য-দাসত্ব-বন্দেগী করো না। এটাই সত্য-সঠিক দ্বীন।' – [ইউসুফ : ৩০]

'আনুগত্যব্যবস্থাকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য খালেছ করা ব্যতীত তাদেরকে অন্য কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।'

'তুমি যাকে চাও তাকেই হেদায়াত করতে পারো না। কেন না আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত করে থাকেন। তিনিই জানেন কে হেদায়াত গ্রহণ করবে।' –[আল কাসাস : ৫৬]

'বল, আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে এবং সর্ব প্রথম আমি নিজেই তাঁর কাছে আনুগত্যের মস্তক অবনত করলাম।' –[আল আনআম : ১৬২-১৬৩]

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পুরোহিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। মরিয়ম পুত্র ইসাকেও মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ

www.pathagar.com

তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা যে সব জিনিসকে তাঁর সাথে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।' –[আত তওবা : ৩১]

'জেনে রাখ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পিছনে পড়ে আছে, যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করছে, তা তাদের উদ্ভট ধারণা-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এরা কল্পনা বিলাসী।' –[ইউনুস : ৬৬]

'যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ মনে করে তাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ নেই।' –[আল মু'মিনুন : ১১৭]

'আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-বিধান দেয়ার এখতিয়ার নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটিই সরল সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' –[ইউসুফ : ৪০]

'আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিচ্ছেন, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করে ওঠাবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারে? তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।' –[আর রূম :৪০]

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে যেন (আল্লাহর উপর) বড় অপবাদ আরোপ করল।'–[আন নিসা : ৪৮]

'যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলল : হে পুত্র, আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক ক'রো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম।' –[লোকমান : ১৩]

আল্লাহর একত্ববাদের পাশাপাশি আল কোরআনে শিরকের ব্যাপারেও করা হয়েছে সমালোচনা ও কঠোর হুশিয়ারী। যেমন :

'অবশ্যই যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের ওপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনেই গজব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি করেই আমি অপবাদ আরোপকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' –[আল আরাফ : ১৫২]

'তারা যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে, তারা আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়। বল, মজা লুটে নাও, পরিণতিতে আগুনের দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' –[ইব্রাহিম : ৩০]

'তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা তোমরা কর, তারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।' –[আল আম্বিয়া : ৯৮]

'যারা বলে মরিয়ম পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ, তারা কাফের। অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের

www.pathagar.com

পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' –[আল মায়িদা : ৭২]

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে শরীক করে। এছাড়া আর সমস্ত গুনাহ-ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন মাফ করে দেন। যে শিরক করল সে যেন আল্লাহর উপর শক্ত অপবাদ আরোপ করল।' –[আন নিসা : ৪৮]

এভাবে পবিত্র কোরআন মজিদের পরতে পরতে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর এ ঘোষণা অনুযায়ী মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য। বিশেষ করে মাক্কী যুগের তেরো বছরে রাসূলের মিশনের প্রধান কাজই ছিল আল্লাহর একত্ববাদের আলোকে মানুষের মন-মানসিকতা ও তাদের জীবনকে পুনর্গঠন করা, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা। আর মাক্কী যুগের সূরাগুলোরও কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলা এবং শিরকের পংকিলতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহর প্রভুত্ত, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়াই ছিল মহানবীর নবুয়তী জিন্দেগীর প্রধান মিশন এবং মূলত তাওহীদের এই শাশ্বত ঘোষণাই ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত দাওয়াত। আল্লাহর নির্দেশে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে, বিশ্বনবী বা মহানবী হিসেবেও হযরত মুহাম্মাদ ও (সঃ) মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে এই শাশ্বত আহবানই জানাতেন :

'হে লোক সকল, তোমরা ঘোষণা কর, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই, তাহলে তোমরা সফল হবে।' আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে তিনি কিছুকাল গোপনে তার নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের কাছে দ্বীনের এ দাওয়াত প্রচার করেন। পরে যখন প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে একদিন তিনি কুরাইশদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত করে বললেন : 'আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে হানাদার বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে ছুটে আসছে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত জনগণ সমস্বরে বলে উঠল : 'হা, কেন করবো না? আমরা তোমাকে সব সময় সত্য বলতে দেখেছি।'

'তাহলে হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, হে আবদ মানাফের বংশধর, হে যাহরার বংশধর, হে তামীমের সন্তানেরা, হে মাখযুমের সন্তানেরা, ওহে আসাদের বংশধর, শোন, আমি বলছি, তোমরা এক আল্লাহকে প্রভু ও উপাস্য মেনে নাও, তা না হলে তোমাদের উপর কঠিন আযাব নেমে আসবে।'

খ. আল্লাহর কালামকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া বা কোরআন প্রচার

নবী-রাসূলদের বিশেষত্ব এখানে যে, তাদের কাছে আল্লাহ'র কালাম প্রেরিত হ'ত যা সাধারণ মানুষের কাছে হ'ত না। আল্লাহ বলেছেন :

'হে মুহাম্মাদ (সঃ), বলে দাও, আমি তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।

www.pathagar.com

তবে (পার্থক্য এই যে,) আমার কাছে অহী অবতীর্ণ হয়।' –[কাহাফ : ১১০]

নবী-রাসূলদের কাজ ছিল এই অহী বা আল্লাহ'র বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ কারণে আল কোরআনে নবী-রাসূলদেরকে আল কোরআনে বাণীবাহক বা বার্তাবাহকও বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী, তাঁর হুকুম, বিধান বা পথ-নির্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া বা আল্লাহর কালামের শিক্ষাকে মানুষের সমাজে প্রচার করাই ছিল নবী-রাসূলদের কাজ। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এরও প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল আল্লাহর কালাম আল কোরআনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং কোরআনের শিক্ষার দিকে মানুষকে আহবান জানানো।

মূলত আল্লাহর দিকে আহবান করা বলতে কিন্তু আল্লাহর কালামের দিকে, আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও তাঁর হেদায়াতের দিকে মানুষকে আহবান করাকেই বুঝায়। তাই মহানবীর জীবনের অন্যতম প্রধান মিশন ছিল আল কোরআনের প্রচার করা, আল্লাহর কালামকে যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন :

'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রচার কর। যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি আল্লাহর রিসালাতকে পৌঁছালে না।' –[আল মায়েদা : ৬৭]

'হে চাদর আবৃত্ত শয্যাগ্রহণকারী, ওঠো, সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।–[মুদ্দাস্‌সির : ১-৩]

মহানবীর এই মিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আরো বলেছেন :

'তিনিই উম্মিদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন; যে তাদেরকে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও কৌশল শিক্ষা দেয়। ইতিপূর্বে তো এরা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।'–[জুমু'আ : ২]

'তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ মোমেনদের প্রতি অবশ্য অণুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। এর পূর্বে তো তারা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।'–[আলে ইমরান : ১৬৪]

'(বল) আর এ কোরআন আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছবে তাদের সবাইকে সাবধান করে দিতে পারি।'–[আনআ'ম : ১৯]

'প্রচার করাই রাসূলের কর্তব্য। তোমরা যা প্রকাশ কর এবং গোপন কর সে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন।'–[আল মায়েদা : ৯৯]

'কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর ফোরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।'–[ফোরকান : ১]

'এ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতপূর্ণ। এতএব তোমরা এর অনুসরণ কর

www.pathagar.com

এবং নিষিদ্ধ সীমা পরিহার করে চল। তবেই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।'–[আল আনআম : ১৫৫]

'(হে নবী!) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন বুদ্ধিমান লোকেরা একে গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করে।' –[আস সোয়াদ : ২৯]

'তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছু নেই।' –[আল বাকারা : ৭৮]

'আমি তোমার প্রতি আমার জিকির (আল কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বর্ণনা করতে পারো, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'

এমনিভাবে পবিত্র কোরআন মজিদের আরো অসংখ্য আয়াত উদ্ধৃত করা যায়, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন প্রচার করা, মানুষের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করে শোনানো, এর বিষয়বস্তু ও শিক্ষা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া, এর আলোকে মানুষকে কর্ম-কৌশল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা, কোরআনের শিক্ষার আলোকে মানুষের মধ্যে বিরাজমান অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও গোমরাহি দূর করা এবং তাদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে তোলা ছিল আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) নবুয়তী দায়িত্ব।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যেও দায়ী ইলাল্লাহর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন :

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে আর ঘোষণা করে যে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।'–[হা-মীম-আস্‌সাজদা : ৩৩]

আল্লাহর নবী এবং সাহাবায়ে কেরাম তাই নিজেদের জীবনে কোরআন প্রচারের এ কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহর কালাম আল কোরআন হল আল্লাহর নৈকট্য ও হেদায়াতের সেই ফল্গুধারা, সেই সিরাতুল মুস্তাক্বিম; সূরা ফাতিহার মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়তই যার প্রার্থনা করে থাকি। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের প্রতি রাকায়াতেই আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে থাকি –'আমাদেরকে সহজ-সঠিক পথে পরিচালিত কর। সে সব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো; তাদের পথ নয়, যারা পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বস্তুত, আল ফাতিহার প্রার্থনার জবাবই হচ্ছে সমগ্র আল কোরআন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আমাদেরকে এ প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং আবার তিনিই আমাদেরকে আমাদের প্রার্থীত সিরাতুল মুস্তাক্বিম পথের দিশা দিয়ে ধন্য করেছেন। আবার আল কোরআনের এই ঐশী হেদায়াত মূলত সেই শাশ্বত পথ; যে পথের সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় দিয়েছিলেন। আদিপিতা হযরত আদম (আঃ)-কে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন, যুগে যুগে তাঁর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের কাছে ঐশী পথ-নির্দেশ বা জীবন বিধান পাঠানো হবে। যারা সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য ভয় ও বিপদের কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা আল্লাহর দেয়া সেই জীবন-বিধানের বিরোধিতা করবে, তারাই হবে বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ। তাদের জন্য রয়েছে বিপর্যয় ধ্বংস। পবিত্র কালামে মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন এভাবে :

'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন-বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছানো হবে; যারা সে বিধান মেনে চলবে তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আর যারা সে বিধান গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা গণ্য করবে, তারা নিশ্চয় জাহান্নামী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।' –[আল বাকারা : ৩৮-৩৯]

সুতরাং আল্লাহর কালাম আল কোরআনই হল মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহর দেয়া হেদায়াতই তাঁর নৈকট্য বা খোদাপ্রাপ্তির যথার্থ সিরাতুল মুস্তাক্বিম। আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ বা ওসিলা তালাশ করতে হলে আমাদেরকে তাই কোরআনের পথের দিকেই ফিরে আসতে হবে। কারণ এ পথই ঈমানের পথ, এ পথই হেদায়াতের পথ। এ পথই নির্ভেজাল জ্ঞান ও সত্যের পথ। কোন বুযুর্গ ও কোন বাবার পাও ধরা এ পথের বিকল্প হতে পারে না। আল্লাহ কথার চেয়ে কোন মানুষের কথাকে বড় মনে করলে কেবল শয়তানের সান্নিধ্যই লাভ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য ও হেদায়াত তাতে কখনো লাভ হতে পারে না। যারা মনে করে আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পন না করে কোন পীর-মাশায়েখ বা তথাকথিত বুযুর্গ ব্যক্তিদের পা ধরে পরে থাকলেই নাযাত পাওয়া যাবে তারা মূলত ঐসব ব্যক্তিদেরকেই খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। কারণ কোন মানুষ কখনো অপর মানুষের প্রভু হুকুমকর্তা হতে পারে না, নিরংকুশ আনুগত্য বা গোলামী দাবী করতে পারে না। যারা এসব করে তারা পরিষ্কার শিরক ও পৌত্তলিকতার মধ্যে নিমজ্জিত। কারণ এসব কর্মকা তাওহীদের শাশ্বত আদর্শ ও ঈমানী চেতনার পরিপন্থী। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা পরিষ্কার বিভ্রান্তি ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

সূরা আসরে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা বা কামিয়াবী নির্ভর করছে চারটি জিনিসের উপর। ১. ঈমান, ২. আল্লাহর হুকুম পালন বা নেক আমল, ৩. হকের দাওয়াত বা ইসলামের প্রচার এবং ৪. সবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি। বলা হয়েছে সত্যের এ চারটি মূলনীতি থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। অতীতে যারা এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তারা যেমন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল; বর্তমানেও যারা ঈমানদারী, আল্লাহ হুকুম পালন এবং সহনশীলতার নীতি হকের দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারাও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং ভবিষ্যতেও যা এ পথ থেকে বিচ্যুত হবে ও তারাও ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকবে। আর এ ক্ষতি হল দুনিয়া ও আখেরাতেরই চরম ক্ষতি।

www.pathagar.com

বস্তুত, পৃথিবীতে আল্লাহর কালামই হচ্ছে পরম সত্য ও নিরংকুশ জ্ঞানের উৎস। কোন ধরনের বিভ্রান্তি, ভুল চিন্তা, ভুল মত, কোন ধরনের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি এতে নেই। সামান্য সন্দেহ-সংশয় বা অনুমান নির্ভর কোন কথাও এতে বলা হয়নি। মিথ্যা ও বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কালাম সর্বতো ভাবে মুক্ত ও পবিত্র। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন :

'যারা জ্ঞানবান মানুষ, তারা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ গ্রন্থ সম্পর্কে মনে করে যে, এ গ্রন্থই হচ্ছে সত্য, এটি মানুষকে পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত প্রভুর দিকেই নিয়ে যায়।' –[সাবা : ৬]

বস্তুত, আল কোরআনের সাথে কোন মানুষের কথা তুলনীয় হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালাই বলে দিচ্ছেন এভাবে :

'হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, যিনি আসমান ও জমিনের সকল রহস্য জানেন এ কিতাব তিনিই নাযিল করেছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান।' –[ফুরকান : ৬]

'নিশ্চিতরূপে এ এক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত কিতাব। মিথ্যা না এর সামনে থেকে আসতে পারে আর না পেছন থেকে। এ এক প্রাজ্ঞ ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। –[হা-মীম-আস সিজদাহ : ৪১]

'এ কিতাবে কোন কথাই সন্দেহের ভিত্তিতে বলা হয়নি।' –[বাকারা : ২]

বস্তুত, কোন মানুষের বা তথাকথিত কোন পীর বা বুযুর্গ ব্যক্তির কোন কথা বা মতবাদ এ মর্যাদা পেতে পারে না। সকল ধরনের পবিত্রতা ও প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কারণ কেবলমাত্র তিনিই এর যোগ্য, অন্য কেউ নয়। এটিই আল কোরআনে বর্ণিত তাওহীদ বা একত্ববাদের মূলকথা। ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সর্বাবস্থায় ঈমানের এ চেতনাকে লালন করেন এবং এ থেকে তারা কখনো বিচ্যুত হন না।

আল্লাহর কালাম থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য কিছু বিভ্রান্ত অথচ লেবাসধারী লোক আল কোরআন সম্পর্কে মানুষকে অহেতুক আতংকিত করে তুলছে। তারা একে অত্যন্ত জটিল অস্পৃশ্য গ্রন্থ বলে বর্ণনা করে এ গ্রন্থের অর্থ জানা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। যেমনটি করতো কুরাইশ মুশরিকেরা। তারা কোরআন সম্পর্কে নানা অপপ্রচার করে বেড়াতো যাতে লোকেরা কোরআন না শোনে। কারণ কোরআন শুনলেই লোকেরা কোরআনের কথায় আকৃষ্ট হতো। এক সময় খ্রিস্টান পাদ্রী-পুরোহিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতো। হিন্দু-ব্রাহ্মণগণও এ কাজটি করতো। তারা বাংলা ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদকে নিষিদ্ধ করেছিলো। যারা মাতৃভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করার চেষ্টা করতো তাদেরকে রৌরব নরকের ভয় দেখানো হত। এ সবেরই উদ্দেশ্য ছিল ঐশী আদর্শের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহর কথার চেয়ে নিজেদের কথাকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই কোরআনের কথাকে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও বোধগম্যহীন বলে বর্ণনা করে এর অর্থ জানা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ আল কোরআন হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই আল্লাহ প্রদত্ত এক সুস্পষ্ট হেদায়াত বা পথ-নির্দেশ। আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

'নিঃসন্দেহে এ কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা একেবারেই সহজ-সরল।' –[বনি ইসরাইল : ৯]

এসব বৈরী প্রচারণা এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি নিস্পৃহতার কারণে আমাদের সমাজে কোরআনের শিক্ষা জানার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখা যায় না, কোরআন পড়া হয় শুধু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে। অথচ যে কোন গ্রন্থ পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জানা। আমরা যদি কোন গ্রন্থের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহলে সে গ্রন্থের শিক্ষা জানার জন্যই আমরা তা পড়ে থাকি। গ্রন্থটি যদি এমন ভাষায় লিখিত হয়, যা আমরা জানি না, তাহলে আমরা গ্রন্থটির শিক্ষাকে অত্যন্ত জরুরী মনে করার কারণেই তার অনুবাদ জানার চেষ্টা করি। কারণ অর্থ না জানলে গ্রন্থাকার কী বলতে চান তা আমরা কীভাবে বুঝব? আর কোন একটি বই পড়ে তা থেকে কোন কিছু জানতে ও বুঝতে যদি আমরা নাই পারি তাহলে সে গ্রন্থ পড়াকে আমরা অর্থহীন বলে থাকি। কোন সুস্থ ব্যক্তিই নিশ্চয়ই এমন আচরণ করেন না। অর্থাৎ কেউ যদি নিয়মিতভাবে এমন একটি বই পড়ে যে বইটির ভাষা সে জানে না, গ্রন্থটি সে খুবই শুদ্ধ করে পড়তে পারে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না অথচ সেই ব্যক্তি দাবী করে যে সে ঐ গ্রন্থের লেখককে খুবই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে আর একই ভাবে তার গ্রন্থটিকেও সে তার জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; তাহলে ঐ ব্যক্তির এহেন আচরণে আমরা নিশ্চয়ই সন্দিহান হয়ে পড়ব যে, সে আসলে সুস্থ আছে কিনা! অথবা তার এ সব আচরণকে আমরা পাগলামি ও হাস্যকর যে মনে করব তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর এই উদ্ভট ও হাস্যকর আচরণের মাধ্যমে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থ-প্রণেতার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা, ভালোবাসার দাবীও যে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তাও নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করে দেখতে চাইব।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সাথে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরণের উদ্ভট ও হাস্যকর আচরণই করে যাচ্ছি। আরবদের কাছে আল কোরআন তো কোন দুর্বোদ্ধ গ্রন্থ নয়। তারা তো কোরআন তেলাওয়াত করে এর অর্থ সহজেই বুঝতে পারতেন। যার কারণে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য অশেষ সওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছেন। কারণ, বেশি বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করার কারণে কোরআনের শিক্ষা তাদের হৃদয়পটে গাথা হয়ে যেত। আর ইসলামী জিন্দেগী যাপনের জন্য এর অপরিহার্য প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আমরা যারা আরবী ভাষা জানি না তারা যদি কোরআনের অর্থ জানার চেষ্টা না করে শুধু তেলাওয়াত করি তাহলে আমাদের কোরআন পড়ার হক কতটুকু আদায় হবে তা কি ভেবে দেখা উচিত নয়? আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কি কোরআনের শিক্ষাকে জানা ও বুঝার জন্য নয়? আমরা যদি কোরআনের শিক্ষাকে না জানি তাহলে কোরআন থেকে হেদায়াত নেয়া আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে?

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে জানা ও বুঝার কারণে দ্বীনের যে ধরনের বুঝ, যে ধরনের ঈমান ও উপলব্ধি তৈরি হওয়া সম্ভব তা কি অর্থ না জেনে তেলাওয়াতের মাধ্যমে, আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে বেখবর থাকার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব? মোটেই সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনই এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, জ্ঞানী আর মূর্খের উপলব্ধি সমান নয়। আর জ্ঞানীরাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, তারাই হেদায়াত থেকে বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন :

'এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, যে ব্যক্তি তোমার আল্লাহর এই কিতাবকে, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন, সত্য বলে জানে আর যে ব্যক্তি এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞ-অন্ধ তারা দুজনই সমান হতে পারে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে।' –[রা'দ : ২০]

সুবহানাল্লাহ! কী দুর্ভাগ্য আমাদের! আল কোরআনের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও আজ আমরা উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছি! আল্লাহর কথার চেয়ে আজ আমরা তথাকথিত বুযুর্গদের কথাকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলেছি। আল্লাহ বলছেন জানো, জানতে চেষ্টা কর! আর বুযুর্গ রূপী আযাযিল ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলছে খবরদার, কোরআনের অর্থ জানার চেষ্টা ক'রো না, শুধু তেলাওয়াত কর, শুধু তেলাওয়াত...!

শুধুই তেলাওয়াত? আর কিছুর প্রয়োজন নেই? কোরআন কেন পাঠানো হয়েছে তা জানারও কোন প্রয়োজন নেই? চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন নেই? মহাগ্রন্থ আল কোরআন এসেছে কি শুধু না বুঝে তেলাওয়াতের জন্য? কিন্তু কোরআন যিনি পাঠিয়েছেন সেই পরওয়ার দিগার এ সম্পর্কে বলছেন –

'এ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতপূর্ণ। এতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং নিষিদ্ধ সীমা পরিহার করে চল। তবেই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।'–[আল আনআম : ১৫৫]

'(হে নবী!) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন বুদ্ধিমান লোকেরা একে গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করে।' –[আস সোয়াদ : ২৯]

'তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছু নেই।' –[আল বাকারা : ৭৮]

'আমি তোমার প্রতি আমার জিকির (আল কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বর্ণনা করতে পারো, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'

আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমরা প্রতিদিন, প্রতি ওয়াক্তে অত্যন্ত তাযিমের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করি কিন্তু ভুলে একবারও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে না এই পবিত্র বাণী গুলোতে আল্লাহ কী বলেছেন। আর ঠিক এ কারণেই নিরক্ষর লোকদের মতই আমরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান, ধারণা-কল্পনা নির্ভর আকিদা-বিশ্বাস লালন করছি আর মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় নিয়ে অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্যে হাবুডুবু

www.pathagar.com

খাচ্ছি। মানসিক এই বৈকল্যের কারণেই আজ আমাদের চিন্তা-চেতনাও হয়ে গেছে পঙ্গু ও নিস্প্রাণ। এ কারণেই আমাদের ঈমান আজ চেতনাহীন। আল্লাহর কালাম আজ ভুলুণ্ঠিত। আল্লাহর হুকুম আজ বিজয়ী বেশে নেই। আল্লাহর হুকুম আজ মানুষের হুকুমের অধীন। আল্লাহর আইন আজ সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, ভুলুণ্ঠিত। আল্লাহর আইন আজ মানুষের আইনের অধীন। কোরআন এসেছে শাসন করার জন্য, শাসিত হওয়ার জন্য নয়। অথচ এ সম্পর্কে আজ আমাদের কোন চেতনাই নেই। আমাদের অন্তর আজ এতটাই মরে গেছে যে, এই কঠিন অন্তরের মধ্যে বোমা মারলেও যেন আর সম্বিত ফিরে আসবে না। অথচ আল্লাহ বলছেন:

'আমরা যদি এই কোরআন কোন পাহাড়ের উপরও নাযিল করতাম, তাহলেও তুমি দেখতে যে সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে কেমন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! এই দৃষ্টান্ত গুলো আমরা এ জন্য দেই, যেন লোকেরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।'–[আল হাশর : ২১]

আমাদের অন্তর ইহুদীদের মত এত কঠিন ও অভিশপ্ত হয়ে উঠল কীভাবে? আল্লাহ বলছেন এই পবিত্র কালামকে যদি তিনি মানুষের উপর নাযিল না করে কোন নিস্প্রাণ পাহাড়ের উপরও নাযিল করতেন, তাহলে এই মহা নেয়ামতপূর্ণ কোরআনের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতি ও জবাবদিহির ভয়ে নিস্প্রাণ পাহাড়ও ক্রন্দন করে উঠতো, আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গলে গলে পড়তো। অথচ আকল সম্পন্ন মানুষ তথা সৃষ্টির সেরা মানুষ হওয়া সত্তেও, আল্লাহর খলিফার পরিচয় ধারণ করা সত্তেও মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রতি আজ আমাদের যেন কোন দায়বদ্ধতা নেই, কোন দায়িত্বানুভূতি নেই। এর কারণ কী? কারণ আল্লাহ নয় বুযুর্গই যে আজ আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছেন। খোদার আসন দখল করে নিয়েছেন আজ মুরুব্বি ও মূর্খতা! কাজেই আল্লাহর কালাম ভুলুণ্ঠিত হলে আমাদের কীই বা আসে যায়, মুরুব্বির আদেশ তো মাথায় করে রাখি! (নাউযুবিল্লাহ)।

এসবই ইহুদীদের এবং পতন যুগের জাতি সমূহের লক্ষণ। কোন জাতির অধঃপতন যখন ঘনিয়ে আসতো, তখন সে জাতির কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী সমূহ আল্লাহর কালাম থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন ভাবে ফন্দি-ফিকির করত। যার কারণে সে জাতির জীবন-প্রণালীর সাথে আল্লাহর কালামের আর কোন যোগসূত্র থাকতো না এবং এক সময় আল্লাহ তাঁর কালামকে ঐ অভিশপ্ত জাতির কাছ থেকে উঠিয়ে নিতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে আল্লাহর কালাম এক সময়ে সে সব জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং নানামুখি বিকৃতি ও অবহেলার শিকার হয়ে অবশেষে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু আল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সর্বশেষ কালাম হওয়ায় এটি কখনো বিকৃত ও বিলুপ্ত হবে না। কারণ সর্বশেষ কিতাব হওয়ার কারণে রাহমানির রাহিম নিজেই একে হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যার কারণে আরবী ভাষা না জানা সত্তেও যে কোন অনারব এ মহাগ্রন্থটি অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াতের মাধ্যমেও অশেষ ফায়েয

www.pathagar.com

ও তৃপ্তি লাভ করে থাকেন, যা পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থ পাঠে সম্ভব হয় না। অর্থ না জেনে দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠাও কেউ ক্লান্তিহীন ভাবে পাঠ করতে সক্ষম নয়। কারণ কাজটি অর্থহীন হওয়ার কারণে অশেষ বিরক্তি ও ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআনই এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ যার শাব্দিক অর্থ না জানা সত্বেও লক্ষ কোটি মানুষ পরম আবেগ, আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে প্রতিদিন তেলাওয়াত করছে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে অশেষ উপকৃত হচ্ছে।

এটি মূলত বরকতপূর্ণ এই ঐশীগ্রন্থের একটি মোজেজা, নতুবা শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে সওয়াব কামাইয়ের জন্যই এ মহাগ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়নি। বরং আল কোরআন এসেছে মানুষের জীবন ও সমাজ-সভ্যতার মধ্য থেকে সকল ধরনের কুফরিকে বাতিল করে দিয়ে তার স্থলে হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মূর্খতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বালিত করার জন্য। অজ্ঞতা ও নৈরাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য। ইসলাম জীবনমুখি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন বিধান। মূর্খতা ও বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

সুতরাং আজ সময় এসেছে আত্মজিজ্ঞাসার, সময় এসেছে চিন্তা-গবেষণা ও বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর। কারণ যারা জ্ঞান-বিমুখ, যারা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে না, চিন্তা-গবেষণা করে না, যারা কুপমন্ড, যারা তাদের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে উৎসাহী নয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলেছেন :

'এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু-সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তার সাহায্যে চিন্তা-ভাবনা করে না; তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না; তাদের শ্রবনশক্তি আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন।' – [আল-আরাফ : ১৭৯]

'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম; কিন্তু আসলে তারা শোনে না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম পশু, বধির ও বোবা হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নিজেদের বিবেক ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোন ধরনের কল্যাণ রয়েছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শোনার তওফিক দিতেন। তিনি যদি তাদেরকে শুনতে দিতেন, তবে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেতো।' –[আনফাল : ২০-২৩]

'এদের মধ্যে বহু লোকই তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শোনাবে তারা না বুঝতে চাইলেও? তাদের মধ্যে বহু লোক তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি সেসব অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা দেখতে না চাইলেও? আসল কথা হল, আল্লাহ লোকদের উপর জুলুম করেন না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে। –[ইউনুস : ৪২-৪৪]

www.pathagar.com

'তারা না কারো কথা শুনতে পারতো আর না তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে কিছু আসতো। এরা সেই লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তারা যা রচনা করেছিল, তার সব কিছুই তাদেও কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'–[হূদ : ২০-২২]

পবিত্র কোরআনই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের দাওয়াতী তৎপরতা বা গণসংযোগমূলক কাজের প্রধান হাতিয়ার। কারণ কোরআন শুধু যে সত্যের দলিল তাই নয়, কোরআন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবীর জন্য একটি বিরাট মোজেজা। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে কোন মোজেজা প্রদান করা হয়নি, যা দেখে লোকেরা ঈমান আনতো। কিন্তু আমার মোজেজা হলো অহী (কোরআন), যা আল্লাহ আমার প্রতি নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি কেয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে।' –[বুখারী]।

বস্তুত কোরআনের ভাষায় রয়েছে এমন এক সম্মোহনী শক্তি এবং এর বাণীতে রয়েছে মানুষের বিবেক ও চিন্তার জন্য এমন খোরাক যা কঠিন প্রাণ আরব-বেদুইনদের মনকেও বিগলিত না করে পারেনি। হযরত ওমরের মত কঠিন ও কঠোর স্বভাবের মানুষও; যিনি আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার জন্য উদ্যত সঙ্গীন নিয়ে রওনা হয়েছিলেন, তিনিও তো বশ মেনেছিলেন মূলত আল্লাহর কালাম আল কোরআনের বাণী শুনেই। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের দাওয়াতী কাজের প্রধান উপকরণ ছিল আল কোরআন। কোরআন প্রচারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহর নবী বলেছেন :

'একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর।' –[বুখারী]

বিদায় হজ্জের ভাষণেও মহানবী আল্লাহর কালামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন – 'আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহ কিতাব।'

দ্বীনের দাওয়াতে কোরআনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী ? কারণ, আল কোরআনই দ্বীনের ভিত্তি এবং দ্বীনী জ্ঞান ও হেদায়েতের মূল উৎস। হেদায়েতের পথে উম্মতের টিকে থাকাও মূলত নির্ভর করে আল কোরআনের সাথে তাদের গভীর সম্পর্কের উপর। উম্মতের রক্ষাকবচও হচ্ছে মূলত আল্লাহর কালাম আল কোরআন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মূল সূত্রই হচ্ছে এই কোরআন। মানব জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, কোন জাতির উত্থান-পতন নির্ভর করতো মূলত আল্লাহর কালামের সাথে তারা কী ব্যবহার করতো তার উপর। আল্লাহর কালাম চিরদিনই ছিল মানব জাতির জন্য সৌভাগ্যের পরশ-পাথর। যে জাতি আল্লাহর কালামকে বুকে ধারণ করেছে, আল্লাহর কালামকে তাদের জীবনে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, আল্লাহর কালামকে যারা সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে, বিনিময়ে আল্লাহও তাদেরকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছেন, সম্মান দিয়েছেন। আর পূববর্তী জাতি সমূহের অধঃপতনের মূল কারণই এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কালাম থেকে দূরে সরে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। আল্লাহর কালামের পরিবর্তে তারা নিজেদের মনগড়া ধারণা-বিশ্বাস, পীর, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকেই হেদায়েতের উৎস বানিয়েছিল। আল্লাহর কালামের পরিবর্তে নিজেদের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে পূর্ববর্তী কিতাবধারীগণ আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত পর্যন্তকরে ফেলেছিল।

ইহুদি আলেমদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দিত। অর্থাৎ নিজেদের মনগড়া কথা তারা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিত। তারা এটি করতে পারতো এজন্য যে, সমাজের মানুষের মধ্যে আল্লাহর কালামের যথার্থ কোন চর্চা ছিল না। ধর্মীয় নেতারা নানান বাহানায় আল্লাহর কালামের চর্চার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া কাহিনী ও মতবাদ চর্চার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। আর লোকেরাও আল্লাহর কালামকে পাশকাটিয়ে ধর্মীয় নেতা, বুযুর্গ ব্যক্তিদের বয়ানের দিকেই বেশি ঝুকে পড়েছিল। যার কারণে ইহদি আলেম সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে আল্লাহর নামে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে ও মনগড়া কথা বলা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে ইহুদিদের এ বদ অভ্যাসের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন :

'এর পরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা আল্লাহর উপর আরোপ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই জালিম।' –[আলে ইমরান : ৯৪]

এ কারণেই, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণ আল কোরআনের প্রচারকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহর রাসূল বেশিরভাগ সময়ই সরাসরি কোরআন শুনিয়েই মানুষকে দাওয়াত দিতেন। সাহাবীগণও তাই করতেন। তাঁদের মধ্যে কোরআনের চর্চা এত বেশি ছিল যে, একজনের সাথে আরেক জনের দেখা হলে তাঁরা পরস্পরকে কোরআনের কোন অংশ না শুনিয়ে কোন কথা বলতেন না।

পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা দ্বীনকে বিকৃত করে, এর উপর নিজেদের যেসব মনগড়া ধ্যান-ধারণা আরোপ করেছে এবং পবিত্র কালামের যেসব শিক্ষাকে তারা গোপন করেছিল সেসব শিক্ষাকে প্রকাশ করে দেয়া, আল্লাহর দেয়া যেসব হালালকে তারা হারাম এবং হারামকে হালাল করেছিল সেসব বিকৃতিকে পরিশুদ্ধ করাও ছিল মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আগমণের অন্যতম লক্ষ। এ কারণেও কোরআনের পয়গাম মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দেয়া ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুয়তী মিশনের অন্যমত দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আহলে কিতাবীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন :

'হে আহলি কিতাবী গণ! তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এসেছে। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে সে তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করে দেয় এবং অনেক বিষয় মাফ করে দেয়। তোমাদের কাছে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এরদ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন। –[আল মায়েদা : ১৫-১৬]

www.pathagar.com

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অতীতের বিভ্রান্ত, জালেম, ফাসেক ও অভিশপ্তদের জাতি সমূহের মত আমাদের মধ্যেও আজ আল্লাহর কালামের চর্চা ও প্রচার-প্রসার কমে গেছে এবং আমাদের দ্বীনদার লোকদের মধ্যে আল্লাহর কালামের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া কথা ও ধারণা-বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজেদের জীবন থেকে আল কোরআনের শিক্ষাকে বিদায় করে দিয়ে আজ আমরা অভিশপ্ত ইহুদী-নাসারাদের পদাংক অনুসরণ করছি। আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই আমরা পাশ্চাত্যের আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমরা ধর্মকে, ঐশী আদর্শ আল কোরআনের শিক্ষাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে ফেলেছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে যেয়ে আমরা তোতা পাখির মত তাদের শিখানো বুলি আবৃত্তি করে বলছি 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা।' এই অপ্রাপ্তবাক্যকে আল্লাহর নির্দেশের চেয়েও বেশি মর্যাদা দিয়ে শুধু রাজনীতি নয় সমাজ-সংস্কৃতির সর্ব পর্যায়ে আল কোরআনের প্রবেশাধিকারকে নিষিদ্ধ করতে এবং সত্য গোপন করতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ, আমাদের শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আমাদের প্রচার মাধ্যম এমনকি দ্বীনের তথাকথিত মেহনতকারীরাও উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ আল কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ বলেছেন :

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) মনোনীত করলাম।-[আল মায়েদা :৩]

এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অনুসরণ করার নির্দেশই দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন :
'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ ক'রো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।'-[বাকারা : ২০৮]

রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মহাগ্রন্থ আল কোরআনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। নামাজ-রোজার মত আল্লাহর এসব হুকুম পালন করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর দাসত্ব ও গোলামী করাই হচ্ছে ঈমানের অনিবার্য দাবী। কিন্তু রাজনীতি সহ সমাজ-সংস্কৃতির সর্ব স্তর থেকে ইসলাকে নির্বাসিত করা সত্যকে গোপন করারই নামান্তর এবং এটি ইহুদীদেরই অন্যতম বৈশিষ্ট। নিজেদের স্বেচ্ছাচারীতাকে বজায় রাখার জন্য আল্লাহর কালামের কিছু মানা এবং কিছু না মানার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ইহুদীদের তীব্র সমালোচনা এবং করেছেন এবং এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যারা ইসলামকে খন্ডিত ও সংকীর্ণরূপে তুলে ধরে; স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কিংবা মূখতা বশত যারা আল কোরআনের কোন আদর্শকে, আল্লাহর নূরকে তথা সত্যকে গোপন করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অভিশাপ আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন আযাব :

www.pathagar.com

'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস কর আর অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এ ধরনের আচরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান আর পরকালের জীবনে কঠিন আযাব। তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।' –[আল-বাকারা : ৮৫]

'নিশ্চয়ই কিতাবের মধ্যে মানুষের হেদায়েতের জন্য যেসব বিস্তারিত পথনির্দেশ ও তথ্য আমি নাযিল করেছি সেসবকে যারা গোপন করে, সেসব লোকের প্রতিই রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপ বর্ষণকারীদেরও অভিশাপ।' –[বাকারা : ১৫৯]

'এসব আহলি কিতাবদেরকে সেসব ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তাকে বিক্রয় করেছে। তারা এই যা কিছু করছে তা কতই না খারাপ কাজ!' –[আলে ইমরান : ১৮৭]

আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যে বিপর্যয়, যে জিল্লতি ও অপমান চেপে বসেছে তা কি আল্লাহর কালামের সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার এবং সত্যকে গোপন করার কারণে নয়?

গ. মানুষের জীবনকে আখেরাতমুখী করে তোলা

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের পাশাপাশি মহানবীর দাওয়াতের দ্বিতীয় বিষয় ছিল আখেরাতের জীবন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। বস্তুবাদী ও সেকুলার ভিত্তিক ভোগবাদী জীবন-দর্শন মানুষের জীবন-দৃষ্টিকে শুধুমাত্র পার্থিবতার দিকেই আটকে দেয় এবং মানুষকে ভোগবাদী করে তোলে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক ও সজাগ করে তোলা। বস্তুত আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী জীবনবোধের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। অথচ তাওহীদের মত আখেরাত বা পরকালীন জীবন এবং আল্লাহর কাছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে জবাবদিহীর ব্যাপারেও সঠিক ও বিশুদ্ধ ধারণা সে সময়ের মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি মৃত্যুর পরে যে আদও কোন জীবন আছে সে সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা ছিল না। আবার ইহুদী-খৃস্টান সহ তৎকালীন ধর্মীয় গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পরকালীন জীবনের জবাবদিহীতা এবং সেখানকার সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়ে তখনও যৎ সামান্য ধারণা বিদ্যমান ছিল, তাতেও ছিল নানা রকম ভিত্তিহীন ও মনগড়া ধারণা-বিশ্বাসের মিশেল। অথচ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাসের কারণেই মানুষের জীবনপথ ভুল পথে পরিচালিত করতে বাধ্য।

আমাদের চারপাশের এই দৃশ্যমান জগতের বাইরেও যে সুবিশাল জগৎ রয়ে গেছে সেটি আপাত আমাদের জ্ঞান ও বোধগম্যতার বাইরে থাকার কারণে প্রচলিত জ্ঞান সেই সেই দূরবর্তী জীবন বা পরজীবন সম্পর্কে সচেতন নয় এবং সেই মহাজীবনের সাথে আমাদের বর্তমান জীবনের কোন তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বস্তুবাদী জীবন-দর্শন অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত। কিন্তু ইসলাম পৃথিবীবাসীকে যে জীবন-দর্শন উপহার দেয় তা বস্তু-পৃথিবী ও দৃশ্যমান জীবন ও জগতের সীমানা ভেদ করে আমাদের বস্তুগত জ্ঞান, কল্পনা ও বোধগম্যতার বাইরের এক মহাজগতের সন্ধান দেয়। ইসলামী

www.pathagar.com

জীবনদৃষ্টি পৃথিবীকে ভেদ করে চলে যায় – স্রষ্টার কোলে, আরশ মহল্লায়। জীবনবোধের এই বিশালত্ব ও সম্পূর্ণতার কারণে ইসলামী জীবন-দর্শন সকল ধরনের কুপমন্ড ও সংকীর্ণ বস্তুবাদী-ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিশাপ থেকে মুক্ত। আর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) সহ সব নবী-রাসূলগণ ছিলেন আখেরাতমুখী এই সম্পূর্ণ ও সুবিশাল জীবনদৃষ্টির প্রবক্তা।

রাসূল (স.) যে সময়কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময়ও মানুষ ছিল চরম ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগবাদের মধ্যে আচ্ছন্ন। দুনিয়ার মোহ সে সময়ের মানুষগুলোকে বিবেকহীন অন্ধ ও পশুজীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারা ছিল ভয়ানকভাবে অপরাধ প্রবণ। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা ছিল চরমভাবে গাফেল। ধর্মীয়জীবনে নানামুখী বিকৃতির কারণে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন ধারনা তাদের মধ্যে ছিল না। ইহুদি আলেম ও পীর পুরোহিতরা নিজেদের ধর্ম ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য আখেরাতের জীবন সম্পর্কে মনগড়া সব কিচ্ছা-কাহিনী ফেঁদে বসেছিল। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার পরিবর্তে এসব পীর-পুরোহিতদেরকে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই মানুষ আখেরাতে নাজাতের উসিলা পেয়ে যেতো। তারা হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের পরকালীন জিন্দেগীর জিম্মাদার। এসব বিভ্রান্ত ধর্মীয় নেতারা সামান্য নজর-নিয়াজ ও প্রাপ্তিযোগের বিনিময়ে লোকদের পরকালীন জীবনের সফলতার গ্যারান্টি দিত। ফলে সে সময়ের মানুষগুলো হয়ে উঠেছিল চরমভাবে স্বেচ্ছাচারী। এ অবস্থায় নবী করিম (স.)-এর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল আখেরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা প্রচার এবং সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও যত্নবান করে তোলা। আখেরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদান করা ছিল নবী-রাসূলদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বা মিশন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

'সকল মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা নবী পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যেন মানুষের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করা যায়।'–[বাকারা : ২১৩]

মহানবীর মিশন সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলে দিচ্ছেন এভাবে :

'হে নবী, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং খোদার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।' -[আল-আহযাব : ৪৫]

আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের চব্বিশ ঘন্টায় একদিন হিসেবে যে ক'দিন আমরা বাঁচি, তা মহাকাশের ও পরকালের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও নগন্য। পরকালের তুলনায় দুনিয়াটা হচ্ছে নিছক বাচ্চাদের খেল-তামাশার মত। দুনিয়ার এই চাকচিক্য ও মোহ খুবই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি পৃথিবীর এই বসন্ত, এই অপরূপ সৌন্দর্যও অস্থায়ী। একদিন মঙ্গলগ্রহের মতই পৃথিবী বৃক্ষহীন হবে, তার সব সৌন্দর্য ও শ্যামলিমা হারিয়ে প্রাণহীন নিরস-নিস্ফলা মৃত্তিকায় পরিণত হবে–

www.pathagar.com

'তাদের কাছে এই দুনিয়ার উদাহরণটি বর্ণনা করে দাও। তা পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা উৎপন্ন হয়। তারপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, সামান্য বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।'–[আল কাহফ : ৪৫]

'আমি পৃথিবীর মধ্যকার সকল কিছুকেই দৃষ্টিনন্দন করে সৃষ্টি করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করতে পারি, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, একদিন আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত দিব।'–[আল কাহফ : ৭-৮]

একদিন আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রচন্ড শব্দে শুরু হবে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প এবং তাতে সমস্ত সৃষ্টি লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। একে বলা হয় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। পবিত্র কোরআন মজিদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁ এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উঠিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।'–[আল হাক্কাহ : ১০-১৩]

'যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সে ব্যাতীত। অতপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।'–[আয যুমার : ৬৮]

এরপর সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে এক নতুন জগতে উপস্থিত করাবেন যাকে বলা হয় হাশরের ময়দান।সেখানে প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াবী জিন্দেগীর আমলের হিসেব-নিকেশ করা হবে :

'তা এমন একটি দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ সমবেত হবে। সেদিনটি যে উপস্থিত হবার দিন।–[হূদ : ১০৩]

'যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।'–[মু'মিন : ১২]

সেদিন মানুষের দুনিয়ার বাহাদুরী আর থাকবে না। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিবেন। সেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাই হবে চূড়ান্ত। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলেছে তারা সেদিন সফল হবে, তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না, তারা হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা দুনিয়ায় বেপরোয়া জীবন-যাপন করেছে, সেদিন তারা চরমভাবে ব্যর্থ হবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে চরম অপমান আর দুঃখ। বস্তুত তাদের মত হতভাগ্য সেদিন আর কেউ হবে না। পবিত্র কালামে বলা হয়েছে :

'সেদিনটি এলে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। তাদের কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান-জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্যকিছু

www.pathagar.com

ইচ্ছে করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতদিন আসমান-জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্যকিছু ইচ্ছে পোষণ করেন তা ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনও ছিন্ন হবার নয়।'–[হূদ : ১০৫-১০৮]

মানুষের জীবনে আখেরাতের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। আখেরাতের উপর যথাযথ ও দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের জীবন-প্রবাহকে একদিকে প্রবাহিত করে আর আখেরাতে অবিশ্বাস মানুষের জীবনধারাকে পরিচালিত করে ভিন্ন দিকে। ইসলামী জীবনধারায় তাই আখেরাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আখেরাত তথা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি ঈমান্দার-মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন মানুষে পরিণত করে এবং তাদের জীবনধারাকে পরিচালিত করে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধারায়। একজন আখেরাত বিশ্বাসী মানুষ কখনও বল্গাহীন, অনিয়ন্ত্রিত ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারে না। একজন সত্যিকার মুমিন-মুসলমান কখনো আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারে না। সুতরাং একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের প্রয়োজনে সর্ব প্রথম সমাজের মানুষকে আখেরাতমুখী করে তোলা অপরিহার্য। আখেরাতের প্রতি প্রবল ঈমান ছাড়া কারো পক্ষে ঈমান্দারীর পথে এক কদম অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জীবনদৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত আখেরাত পর্যন্ত প্রসারিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে দুনিয়ার মোহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না; তার দৃষ্টি বৈষয়িকতার সীমার মধ্যেই আটকে থাকবে। দুনিয়া পাওয়ার ধান্দাই তাকে সারাক্ষণ মশগুল রাখবে :

'বেশি! বেশি! দুনিয়ায় একে অন্য থেকে বেশি পাওয়ার ধান্দাই তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। এমনকি (ধান্দাবাজি করতে করতেই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। কখখনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার (শুনে নাও), কখখনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখখনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে! (তাহলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে। আবার (শুনে নাও), একেবারে স্থির, নিশ্চিতভাবেই তোমরা তা দেখতে পাবে। তারপর নিশ্চয়ই সেদিন তোমাদেরকে (দুনিয়ার) এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' –[তাকাসুর]

'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং অহংকারী।' –[নাহল :২২]

'যে আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, সে সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।'-[আল মু'মিনূন : ৭৪]

আখেরাতের প্রতি কারো ঈমান যদি দুর্বল হয়, তাহলে তার আল্লাহ, রাসূল, ফিরিশতা, কোরআনের প্রতি ঈমান ও ইসলামী সমস্ত বিধি-বিধানও তার কাছে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এবং তারা যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনারও দাবী করে তাহলেও তারা ঈমান্দার হতে পারবে না। কারণ আল্লাহর কোন আয়াতকে অবিশ্বাস-অস্বীকার করা মূলত আল্লাহকেই অবিশ্বাস-অস্বীকার করা। আল্লাহ বলেছেন :

www.pathagar.com

'এটি (নামাজ) খুব কঠিন কাজ, কিন্তু যারা বিনয়ী তাদের পক্ষে খুবই সহজ। যারা মনে করে তাদেরকে প্রতিপালকের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'–[বাকারা : ৪৫-৪৬]

'যারা পরকালকে বিশ্বাস করে তারাই কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী এবং তারা নামাজকে সংরক্ষণ করে।'–[আনআ'ম : ৯২]

'যারা আমার আয়াত ও আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করে তাদের সব আমলই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা যেমন আমল করেছে তেমন ফলাফলই পাবে।' –[আল আ'রাফ : ১৪৭]

এমনিভাবে আখেরাত সম্পর্কে ভূল ধারনাও মানুষকে গোমরাহীর দিকে ধাবিত করে। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা পীর, দরবেশ, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে উসিলা করে পরকালে পার পাওয়ার স্বপ্ন দেখত এবং তাদেরকে নাযাতের কান্ডারী ও যিম্মাদার মনে করত। ইহুদিরা মনে করতো তারা ঈশ্বরের বংশধর। বংশ, গোত্র ও সাম্প্রদায়িক কারণে তারা শাস্তির উর্ধে। বেহেশত তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। এমনিভাবে কিছু লোক পীর, দরবেশ, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের আত্মীয়তা-ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করতো আর মনে করত ঐসব ব্যক্তিরাই তাদেরকে নাযাতের ব্যবস্থা করে দিবে। এসব কারণে দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি তাদের ছিল না। যার কারণে তাদের জীবনধারা পরিচালিত হতো বিভ্রান্তির পথে, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এসব লোকের বিভ্রান্তি দূর করাও ছিল মহানবীর জীবনের অন্যতম মিশন। তিনি পবিত্র কালামের বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে তাদেরকে হুশিয়ারী করে গেছেন:

'ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে : আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বল, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে শাস্তি দেবেন কেন? বরং তোমরাও অন্যদের মতই সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সব কিছুর উপর আল্লাহর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'–[আল মায়েদা : ১৮]

'তারা বলে, ইহুদী অথবা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এটি তাদের বাসনা। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর। হ্যা, যে নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিয়েছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, তার জন্য তার পালনকর্তার নিকট পুরষ্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।'–[বাকারা : ১১১-১১২]

'তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। যদিও বা করে তবে তা নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য মাত্র। জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছো যে, তিনি কখনও তা ভঙ্গ করবেন না? নাকি তোমরা

www.pathagar.com

যা জানো না তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছো? হ্যা, যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়েছে এবং পাপাচারের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'-[বাকারা : ৮০-৮২]

'তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে। আল্লাহর কিতাবের দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছিল, যেন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ, তারা বলে : জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না, যদিও করে, তা হাতে গোণা কয়েক দিনের জন্য। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে। তখন তাদের অবস্থা কী হবে, যেদিন আমি তাদেরকে সমবেত করব এবং যেদিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই? সেদিন প্রত্যেকেই তাদের কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে, কারো উপরই সামান্যতম অন্যায়ও করা হবে না।'-[আলে ইমরান : ২৩-২৫]

'তারা বলে – এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দিচ্ছ, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না?'-[ইউনুস : ১৮]

'তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছো, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা পেছনে রেখে এসেছো। আমি তো তোমাদের সাথে সেই সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবীও উধাও হয়ে গেছে।'-[আল আন'আম ৯৪] ■

www.pathagar.com

হে প্রিয় রাসূল

আবদুল হালীম খাঁ

অজস্র রাতদিনের রুদ্ধ দরজা খুলে খুলে
দীর্ঘ পথের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে অনেক আশায়
এ পৃথিবীতে এলাম
এসে কী লাভ হলো
যদি না তোমার দেখাই পেলাম!
এখানে দেখছি মাঠ ঘাট নদ নদী পাহাড় পর্বত
আকাশে মেঘ পাখির উড়াউড়ি। গলিতে গলিতে
কেচোক্রিমির মতো জনতার কোলাহল মিটিং মিছিল
স্লোগান। এসব দেখে আমার কী লাভ
যদি না তোমার দেখাই পেলাম!

মাঠে ফসলের দোলা বাগানে বাগানে
ফুলের হাসি। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা রঙ পাতার বাহার
ফুলে ফুলে মৌমাছির গুন গুন
ফুল খুব সুন্দর খুব সুন্দর মানি
এ সব দেখে আমার কী লাভ
যদি না তোমার দেখাই পেলাম!

www.pathagar.com

আহ! কাফ্রী বেলালের কী সৌভাগ্য
পেলো সে তোমার হাতের ছোঁয়া
তায়েফ বাসীরাও পেলো তোমার দোয়া
খাত্তাবের বেটা ওমর ধন্য হলো তোমায় দেখে
সালমান ফারসী কত দূর থেকে এসে পেলো তোমার দেখা
আহ! আবুজর গিফারী ধন্য হলো পেয়ে তোমার
হাতের পরশ!
কৃতদাস যায়েদ কোথা থেকে উড়ে এসে
পেলো তোমার ভালোবাসা
হায়! আবদুল হালীম খাঁ
পেলো না তোমার একটু দেখা
তা হলে পৃথিবীতে জন্মে কী লাভ হলো!

মরুচারিনী উম্মে আন্দ কত বড় ভাগ্যবতী!
সেও পেয়েছিল তোমার দেখা
আহ! কী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এঁকেছে তোমার অপরূপ ছবি!
বনের পাপিয়া বুলবুল তোমার নামের গান গেয়ে
কণ্ঠস্বর করলো কত সুমধুর!
শুধু আমিই গাইতে পারলাম না
তোমার নামের হান!
এই পৃথিবীতে এসে আশায় আশায়
এতো কাল ঘুরে ফিরে বসবাস করে
যদি না তোমার দেখা পেলাম
যদি না তোমার হাতের ছোঁয়া পেলাম
যদি না পেলাম তোমার সোনা পায়ের ধুলি
তা হলে কী লাভ হলো!
হে আল্লাহর হাবীব
হে প্রিয় রাসূল [সা]
একবার স্বপ্নে দেখা দাও
অন্তত : একবার!

www.pathagar.com

মুহাম্মদ [সা]

হাসান আলীম

বৃত্তের বিন্দু উৎক্ষেপে আপনি এলেন হে নবী মুহাম্মদ
তীর্যক আলিফ, সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ব মাথা উঁচু বীর,
তাকবির দিলেন, নিজেকে ঘোষণা দিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ে।
আপনিই শ্রেষ্ঠ নবী
আপনিই শেষ নবী
চৌকোনা ঘরের সামনে আপনি অবাক
দাঁড়ালেন রুকুর মমতা মেখে
সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ,
অতঃপর সেজদার বৃত্তের কী এক আকুতি
তারপর সটান দাঁড়ালেন
অন্ধকার পৃথিবী ছেঁড়ার জমাট বৃত্ত ভাঙার
দুরন্ত সাহসে ক্ষুরধার তরবারী।
আপোষহীন নেতার তীব্রতার
আপনার তর্জুনী আঙুলের–
ছিলা ভেদ করে বের হয়–
বিদ্ধ হয় মিথ্যা মূর্তির
অলীক ভাস্কর্যের
ভুয়া সম্রাটের বক্ষকেন্দ্রে,
হুড়মুড় পড়ে যায়, মূর্ছা যায় মিথ্যার নায়ক,
সুন্দরী রমনি নয়
বিপুল বৈভব নয়
নয় রাজ সিংহাসন–
ডান হাতে যদি সূর্য বসে যায়
বাম হাতে হাসে চাঁদ,
তবু আপনি মাথা না নোয়ানো বীর,
সত্যের স্ফুটন আলোর ফোটনে
আপনি অমিত তেজ সম্রাট;
আপনার সাম্রাজ্য বেড়ে যায়,
ক্রমসম্প্রসারিত হয় মসজিদ থেকে
ময়দানে, রাজ সিংহাসনে–
আপনি মুকুটহীন সম্রাট–
আপনি রাখাল রাজা,

www.pathagar.com

আপনি ধর্মবর্ণ দলমত নির্বিশেষের
সত্য আলোর পুষ্প সু ঘ্রাণের,
আপনি অ-প্রতিদ্বন্দ্বী তুলনাহীন।
আপনার সরল রেখার বিদ্যুৎ বীক্ষণে
দূর হয়ে যায়- কালো আবলুস আজদাহ,
আপনার সুঘ্রাণ সমগ্র পৃথিবী ব্যপে,
মহা বিশ্বে-পরা বিশ্বে
মুহূর্তে ছড়িয়ে যায়
আপনার মধুর নাম।
মুহাম্মদ আপনি খাড়া মিম
পাগড়ী পরা মিম রুকুর হে
বৃত্তের মিম আবার সিজদা শেষের অর্ধবৃত্ত দাল।
আপনি চির উন্নত আকাশ চুম্বি,
মহাকাশ ভেদকারী,
মহাবিশ্বের পরিব্রাজক-
অনন্ত আনন্দময় বীর
মহান প্রেমিক,
ধ্যানি সাধক হেরা গুহার অনন্য সম্রাট-
আপনি মানুষের বন্ধু,
আপনি মহান প্রভুর বন্ধু,
মহাজগতের প্রিয়তম
হে বন্ধু মধুর তম।

রাসূল তোমায় ভালবাসি

হারুন ইবনে শাহাদাত

হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি
এ কথা বলবো আমি কোন উপমায়।
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে
কাউকে কি বেশী ভালবাসা যায়?

www.pathagar.com

রাসূলের শানে নিবেদিত

নিজাম উদ্দীন সালেহ

এক.
স্রষ্টার ধেয়ান থেকে বিচ্ছুরিত নূরে মুহাম্মদী
সেই নূরে বিশ্বসৃষ্টি–প্রাণীকূল, পর্বত, জলধি
সকল সৃষ্টির আদি সৃষ্টি সেই জ্যোতির্ময় রূপ
যাতে হলো প্রকাশিত আল্লাহর শৈল্পিক স্বরূপ
যারে ভিন্ন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো এই চরাচর
যারে ছাড়া হতোই না এই বিশ্ব সর্বাঙ্গ সুন্দর
যার নাম ভিন্ন দোয়া পৌঁছে না খোদার আরশে
যার নাতে মশগুল নরনারী পরম হরষে
সৃষ্টি প্রথম তিনি, সর্বশেষও নবী মুহাম্মদ
সকল ধনের সেরা ধন তিনি পরম সম্পদ।

তারই রূপেতে বিমোহিত এই জমিন আসমান
তারই আলোতে পায় পথহারা পথের সন্ধান
প্রখর মরুতে তিনি যেনো সুশীতল মহীরুহ
পাপপূর্ণ জনপদে তিনি দৃঢ় ঈমানের ব্যূহ
তারই পবিত্র শানে অবিরাম প্রতি সুবেহ-শাম
কোটি কণ্ঠে নিঃসরিত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম।

দুই.
যে ছবি যায় না আঁকা কোন রং-কলম-তুলিতে
হৃদয়ের পটে যারে করা যায় শুধুই ধারণ
যেই শুনে তার কথা পারে না সে কখনো ভুলিতে
তিনি নূরনবী-বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণ।

যদিও সম্রাট নন, অধিপতি দুই জাহানের
তারই প্রেমেতে লীন এই ইহ আর পরলোক
তারই আলোতে হলো আলোকিত দ্যুলোক-ভূলোক
ছিন্ন হলো সব পর্দা অন্তহীন গাঢ় আঁধারের।

যে প্রেম যায় না করা কোন তৌলদণ্ডে পরিমান
যে প্রেমের গভীরতা সাগরের চেয়েও গভীর
যেই পুণ্যে মুছে যায় অন্তহীন পাপ-পরিতাপ
সেই প্রেম পুণ্য নিয়ে আবির্ভাব প্রিয় নবীজীর।

সৃষ্টির রহমত তুমি, ইয়া নবী, তোমাকে সালাম
অশান্ত হৃদয়ে শান্তি তোমারই পবিত্র এ নাম।

www.pathagar.com

প্রত্যয়

মাহবুবুল আলম গোরা

এগিয়ে আসছে ধাবমান অশ্বখুরের শব্দ,
এগিয়ে আসছে ঘাতকের দল,
জিঘাংসায় ঝলসে উঠছে
তাদের হাতের নাঙ্গা তরবারি।
তবে কী নিহত হবে সত্য!
এমন গভীরে প্রোথিত শ্বাশত বিশ্বাস
নিষ্ঠুরতায় উৎপাটিত হবে!

আবুবকর সভয়ে তাকালেন হযরতের দিকে।
ঘাতকেরা থমকে দাঁড়িয়েছে গুহামুখে–
থেমে গেল অশ্বখুরধ্বনি।
'ওরা সদলবলে আর আমরা মাত্র দুজন'
অস্ফুট উচ্চারণ আবুবকরের।
না সিদ্দিক, আমরা দুজন শুধু নই,–
কি প্রত্যয়ী কণ্ঠ হযরতের,
আল্লাহ্ সবসময়ই রয়েছেন আমাদের সাথে।'

গুহামুখে তখন রচিত হয়েছে অলৌকিক উর্ণনাভ জাল–
নাজুক, দুর্বল অথচ কী নিপুণ, অক্ষত।
বিভ্রান্ত ঘাতকের দল,
অবিশ্বাসের চোরাবালিতে হারালো অশ্বখুরধ্বনি।

চারদিকে আজ বেজে চলেছে অশুভ দামামা,
ঘাতকের হাতে কী সুলভ ভয়াল মারণাস্ত্র
দিকে দিকে রক্তের হোলি খেলা।
'তবুও সত্যের জয় হবে নিশ্চিত'
এ প্রত্যয় প্রমাণিত রসূলে খোদার জীবন সংগ্রামে,
আরো জেনেছি আমরা সহায়হীন নই
'আল্লাহ্ সবসময়ই রয়েছেন আমাদের সাথে।'
"লাতাক্বাতু মির রহমতিল্লাহ"
আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়োনা।

www.pathagar.com

রাসূল ছিলেন

আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী

আকাশের মতো উদার উদার
সাগরের মতো নীল,
ছিলো রাসূলের নয়ন দুটিতে
তারাদের ঝিলমিল।

রাসূলের গায়ে ছিলো সুরভি
মধুময় পরিবেশ,
শুভ্র সত্য স্বচ্ছ ছিলো
রাসূলের প্রতিবেশ।

গোলাবের মতো হাসি ছিলো তাঁর
লাল জবা দু'টি ঠোঁটে,
চাউনিতে যেন মুক্তো ঝরে
রুপোলি ঝরনা ছোটে।

রাসূল ছিলেন আলোর পথিক
হেঁটে যান আলোর রথে,
দূর আকাশের তারাদের বনে
আলোভরা ছায়াপথে।

পূর্ণিমা চাঁদের দুধশাদা হাসি
সোনালি রূপালি রূপ,
রাসূল ছিলেন তেমনি মধুর
অপরূপ অপরূপ!

দেহ ছিলো তাঁর লাবণ্যে ভরা
সুবাসিত অনুপম,
রঙধনুকের সাত রঙে গড়া–
শবনম মনোরম।

হৃদয়ে তাঁর রূপঝলমল
শুধুই নূরের জ্যোতি,
সেই অন্তরে কস্তুরি সুবাস–
পান্না হীরা ও মোতি।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী প্রিয় যে আমার

আমিনুল ইসলাম

আমি চাই ক্ষমতা
বুক ভরা মমতা
পথ খুঁজি রাসূলে খোদার
প্রিয় নবী, প্রিয় যে আমার।

দেখেছে এ বিশ্ব
যারা ছিল নিঃস্ব
একজন পথ দেখাবার
তিনি নবী, প্রিয় যে সবার।

অন্যায় অনাচার
বাঁধ ভাঙা অবিচার
যাকে পেয়ে সবটা পাবার
মরু বুক ভিজলো আবার।

হেরার ঐ দীপ্তি
হৃদয়ের তৃপ্তি
রাসূলকে কি আছে দেবার
প্রিয় নবী, প্রিয় যে আমার।

www.pathagar.com

তোমাকে ভালবাসি বলে

শহীদ সিরাজী

তোমাকে ভালবাসি বলে হে রাসূল [সা]!
ভালবাসা অবিরল ঝরে দু'চোখে
হৃদয় থেকে হৃদয়ে সত্যের বুরাক শিরদাঁড়া সোজা করে ছুটে
অবিরাম শুকরানধ্বনি জায়নামাজে
ভালবাসার বুননে ভালবাসার নকশী কাঁথাটি ফুটে উঠে অপুর্ব নান্দনিকতায়
অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে তোমার চেতনা হৃদয়ে অনুভবে

তোমাকে ভালবাসি বলে
ভালবাসা জীবন-জগতের রক্ত ও ঘামের দরিয়ায়
হাসে জীবনের হাসি
নগর জনপদে বদর ওহদ খন্দক তাবুক পাড়ি দেয় অবিরত
নিরন্তর খোঁজে ভালবাসা
নিরন্তর সত্যের পথে সুন্দরের পথে পথ চলে
পথ চলা হয়ে উঠে জীবনের পথে

তোমাকে ভালবাসি বলে
ভালবাসা বুঝে বৃক্ষের প্রেম আকাশ এবং সাগরের আহবান
পাখিদের অবিরত গান শ্যামল-সবুজের ছায়া বৃষ্টির ছন্দময়তা
চাঁদ-সুরুজের অবিরত পথচলা ঝলোমলো দিন
রাতের নিরবতা নিবিড়তা
টপ টপ টপ শব্দময়তা শিশির বিন্দুর
তাবৎ জগতের সিজদার ভাষা।

তোমাকে ভালবাসি বলে ভালবাসা বুঝে
আলো এবং কালোর প্রান্তিকতা
নিরন্তর ইবলিসি অনুভবের সিনাচাক
সিদরাতুল মুনতাহা থেকে ঝরঝর ঝরে সিরাতাল মুসতাকিম
শিকড় থেকে শিখরে ফুঁটে উঠে অবয়ব তোমার
হে রাসূল [সা] !

www.pathagar.com

তোমাকে নিয়ে কবিতা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখার সাহস আমার নেই।
কারণ চারপাশে দুর্গন্ধে ভরা
মানুষের মাঝে হানাহানি খুন
সুদ, ঘুষে ভরা পৃথিবী।
তারপরও বাঁচার আকুতি নিয়ে বলি
আমি তোমাকে ভালবাসি
আমার জীভনের চেয়ে বেশী।

তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখার সাহস আমার নেই।
যেখানে মানুষের নিরাপত্তা নেই
যেখানে গণতন্ত্র নেই
যেখানে নারীদের সম্ভ্রম হানি হচ্ছে
যেখানে নারীনীতি নিয়ে কথা হচ্ছে
যেখানে তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ হচ্ছে।
সেখানে আমরা কিবা আশা করতে পারি
তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখার সাহস আমার নেই।
ভাবছি নিজের কথা
ভাবছি সম্পদের পাহাড় করার চিন্তা
ভাবছি সন্তানদের কথা
ভাবছি কিভাবে মানুষকে ঠকানো যায়।
ভাবছি কিভাবে ইসলাম নির্মূল করা যায়।
ভাবছি কিভাবে নিজের দেশের সীমানা
অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায়।
তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখার সাহস আমার নেই।
যখনি বলি তোমার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।
তখনি রক্তচক্ষু নিয়ে এগিয়ে আসে
কিছু মানুষ খোকা মানুষ।
অথচ আমরা সবাই তোমার
উছিলায় পার পেয়ে যেতাম।
তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখার সাহস আমার নেই ॥

www.pathagar.com

তোমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু তিনি

ইসমাইল হোসেন মুফিজী

দেখো হে মানুষ, চোখ তুলে দেখো
দেখো তোমাদের একান্ত কাছে
তোমাদের প্রিয়তম রাসূল তিনি
এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকে।

তোমাদের কোনো বিপদ সংকেতে
সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে তোমরা
তাতে তার ভীষণ কষ্ট অন্তরে,
তিনি তো তোমাদের কল্যাণকামী
তোমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু তিনি।

হে রাসূল শুনো, কান পেতে শুনো
তোমা' থেকে তারা যদি ফিরে যায় কখনো
তবে তুমি যেনো ঘাবড়ে যেওনা, বলে দাও-
"আল্লাহ আমার রব, আমার যথেষ্ট প্রাপ্তী
তিনি ছাড়া মাবুদ নেই আর কোনো
কেবলই আমি তার ভরসায় বেঁচে আছি
তিনি তো মহান এক আরশ অধিপতি।

www.pathagar.com

অনুবর্তনে ইতিহাস

নাজমা ফেরদৌসী

পলেস্তারা খসে গেছে সময়ের
অতীতের উচ্ছল কলরোল এখন
ছায়াচ্ছন্ন পাঁচিলঘেরা নীরব ইতিহাস।
পোড়োবাড়ির শ্যাওলাজমা চাতাল
কাঁটানটের ঝোঁপে দোল খায় দুরন্ত বাতাস।
নাগকেশর ফুলের ঘ্রাণ,
পদ্মদিঘির শান বাঁধানো দুগ্ধস্নানঘাট,
নাচঘর, কয়েদখানা, শশ্মানঘাটে ঘৃতাহুতি,
ধূপধোঁয়া, দরবারি আবহ এখন কেবলই ইতিহাস।

লতাগুল্মের নিগড়ে স্যাঁতস্যাঁতে আরামে
মাটির দূর্গ ;
বসতি গেড়েছে গোখরা পরিবার।
অথচ এই এখানে একদা–'
কতো শত উৎসবে ছিল বাঁধা
সহস্র আচার-অনাচার
ক্ষমতার দাপুটে কোলাহল
কতো সদর্প রাজাদের আনন্দ বিহার
কতো ধনে কতো জনে
কতো ভোজনে কতো আহার কতো উপাচার
এখন এখানে বাস করে গোখরা পরিবার।

জনারণ্যে অন্যের ধন হাতড়িয়ে ফিরেছে যারা
যতো ছিল হাতিশাল, ঘোড়াশাল, টাকশাল
থাকুক না পর্বতোপম স্তুপ সোনাদানা
কোনোকালের ইতিহাসে খুঁজে পাবেনা
সে রাজার সম্মান সুনামের নামনিশানা;
সেসব রাজারা ইতিহাসের পাতায় পাতায়
জমিয়েছে কেবল ধিক্কার, ঘৃণা।

www.pathagar.com

তুমি যদি হও রাজা আর
তোমার চারিপাশ জনারণ্য তোমার প্রজা
নষ্ট করে প্রজার অধিকার
শেষ রক্ষা হয়নি আজও পৃথিবীর কোনো দাপুটে রাজার
লোকে বলে, "ভাগ্যের নির্মম পরিহাস (?)"
তা নয়, সময়ের চাকার ঘূর্ণনে আপনিই
নিষ্ঠুর দাম্ভিক পিষ্ট হয়
তৈরি হয়ে যায় নিকৃষ্ট ইতিহাস।

কারও কারও সময় পলেস্তারা খসিয়ে
প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম ;
তবু রয়ে যায় চির নতুন, আলোকিত দিনের আভাস
প্রিয় রাসূলের অনন্য জীবন
হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস
অথচ তাঁর অনুবর্তনে আজও তুমি পেতে পারো
সোনালী ঝলমলে দিনের আশ্বাস।

তাঁর সেই অনুপম নমুনায়
ধরণীকে গড়ো আজ মানবিক অভিধায়।
এপথে প্রাণান্তিক প্রয়াসে-
লোকালয় হতে উচ্ছেদ হবে গোখরা পরিবার
সেই কথা লিখা রবে উজ্জ্বল অনিবার
সোনাঝরা ইতিহাসে।

www.pathagar.com

মনটা যদি হইতো পুবাল হাওয়া

মতিউর রহমান খালেদ

মনটা যদি হইতো পুবাল হাওয়া
হইতো যদি শুভ্র কবুতর
মেঘের ডানায় পাঠিয়ে দিতাম মদীনারই পথে
যেথায় আমার প্রিয় নবী ঘুমায় নিরন্তর ॥

মনের মিনার উতল নিরবধি
কাবার গিলাফ ছুঁয়ে দিতাম যদি
রওজা জিয়ারতের আশায় পিয়াসী অন্তর
যেথায় আমার প্রিয় নবী ঘুমায় নিরন্তর ॥

মেঘ ময়ূরী পশ্চিমেতে যেও
আমার সালাম নবীর দেশে দিও
তাঁর বিরহে দু'চোখ ভাসে জলে নিরন্তর
যেথায় আমার প্রিয় নবী ঘুমায় নিরন্তর ॥

www.pathagar.com

উস্‌ওয়াতুন হাসানা

রহমাতুল্লাহ খন্দকার

গিরিচূড়া বিজয়ের গল্পগুলো আমাকে আকুল করে।
বিচিত্র পর্বতমালা দেখতে দেখতে আমিও বিরতিহীন ছুটে চলি শেষে।
হিমালয় ও আল্পস অতিশয় ক্ষুদ্র বলে মনে হয়
আমার দৃষ্টির কাছে।
কেননা, যেটুকু উচ্চতায় গেছে পাহাড়ের চূড়া
তারও উপরে থাকে মানুষের চোখ।
কাজেই, আশ্চর্য বলে মনে হল না ওসব চূড়ামালা তখন আমার।

যেটুকু উচ্চতা থেকে সবগুলো পাহাড় কণাতুল্য মনে হয়
ফের ছুটি আমি তার খোঁজে।
অবশেষে, পর্বতচূড়ার ফাঁকে বহুদূরে দৃষ্টি গেল থেমে—
সেখানে আশ্চর্য জ্বলে সত্য-সুন্দরের জ্ঞানজ্যোতি ঝলমলে,
সেখানে সরল আলো খেলা করে দিবসের মতো সত্য হেসে।
সমগ্র উচ্চতা আর গিরিগহ্বর ভেদ করে গেছে সে জ্ঞানের রশ্মিপ্রভা,
যত কাছে যেতে থাকি তার তত ছোট মনে হয় নিজেকে নিজের কাছে।
আর বাড়ে সে উচ্চতা ক্রমাগত উচ্চতা শিখরে।

সে চূড়ায় আরোহণে ব্যর্থ আমি ফিরে দেখি—
আমার দুয়ারে কারা যেন রেখে গেছে স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি।
সিঁড়িতে পা দিয়ে দেখি ফের সেই উচ্চতায়—
আসীন মানুষ সেরা, জ্যোতির ডানায় বসা জ্ঞানের প্রদীপ।
জ্ঞানজ্যোতি মেখে তিনি ছড়ালেন আলো
অন্ধকার অন্দরে বন্দরে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে।
রাহমাতুললিল আলামিন, উস্‌ওয়াতুন হাসানা যে তিনি
চির সভ্যতার শিখরে শিখরে।

www.pathagar.com

প্রিয় রাসূল

এম. মুবীনুল ইসলাম

রাসূল তুমি আলোক শিখা
শিক্ষক মানবতার,
কায়েম করেছো এতিমের হক
নারীরে দিয়েছো অধিকার।

সত্য দ্বীনের আলো
হৃদয়ে তোমার,
দূর করেছো শেষে
অজ্ঞতা অন্ধকার।

জানি তুমি বিশ্বনবী
মুক্তি দূত বিধাতার,
তুমি কল্যাণকামী
পথের দিশারী আমার।

তুমি বিশ্বসেরা রাষ্ট্র নায়ক
নিশ্চিত করেছো সবার আহার,
ক্ষমতায় থেকে করনি কভু
অন্যায় ব্যবহার।

তুমি রহমদিল বিশ্বাসীর কাছে
কেবলই দয়ার আধার,
দু:খীজন এসে পেয়েছে শেষে
জীবনের ঠিকানা তাহার।

তুমি কঠোর আপোষহীন
ভেঙ্গেছো দেয়াল মিথ্যার,
দূর করোছো শক্ত হাতে
অন্যায় অবিচার।

www.pathagar.com

দ্বীননামা

ফারুক মোহাম্মদ

সকল নবীর দ্বীন-ই আল্লাহ এক
মন খুলিয়া শোন দ্যাখরে মানুষ দ্যাখ
ঈমানয়ালাই এক সম্মতি মুহাম্মদে কুল
সবার প্রতিপালক তিনি এক আল্লাহু বল

তোমার ইচ্ছায় সকল মানুষ এক আত্মা হয়
আত্মাজোড়া বিস্তারে মন প্রতিনিধির জয়
দ্বীন প্রচারে সকল প্রকার বাধা নির্যাতন
রাষ্ট্রীয়শক্তি কে নেবে আজ পরম সম্ভাষণ।

সত্য নিয়েই আজ এসেছি আক্রোশ নহে ভাই
দ্বীন সমাজি কুরআন হাতে রাসূলের গান গাই
বখিল মমিন দুভাগে আজ মানুষ যোজন দূর
নসিহত নেয় বুদ্ধিমানে আরশে আজিমপুর।

www.pathagar.com

শান্তির দূত

তারিকুল ইসলাম

আরবের বুকে এল
নবী হযরত,
এ ধরায় নেমে এল
এল রহমত।

আঁধারের বুক চিরে
আলো ঝিলমিল,
ভেদাভেদ দূর হলো
সাফ কালো দিল।

নবীজীর যত চলা
যত কথা কাজ,
মানবতা মুক্তির
প্রমাণিত আজ।

মানবীয় গুণে সেরা
নেই তিল খুঁত,
এ ধরাতে নূরে নবী
শান্তির দূত।

www.pathagar.com

হেরার আলো

সাইফ আলি

চারিদিকে কালো রাত
হেরার গুহায় প্রার্থনারত মহামানবের হাত
যায় দিন যায় মাস–
কান্না থামেনি কাঁদছে মানুষ
মাটির দেবতা হয়েছে ব্যর্থ
প্রাসাদে প্রাসাদে ভরা জৌলুশ
আর–
আস্তাকুঁড়ের সস্তা খাঁচায় বিশ্বমানবতার
পরাজিত হা-হুতাশ...
কাঁদে মন–
কাঁদে মজলুম জনগণ।
"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খলাক"
পড়ো–
তোমার প্রভুর নামে
যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে।
মহান স্রষ্টা কবুল করেন মহামানবের হাতকে
সত্যের আলো দূরিভূত করে মিথ্যার কালো রাতকে।
আসে দ্বীন; আসে ইসলাম
আল্লার কাছে ধরা দেয়া জানি মুক্তির এক নাম।
প্রাসাদ লুটিয়ে পড়ে
হেরার আলোর অমর রশ্মি জ্বলে
আরবের ঘরে ঘরে...

www.pathagar.com

কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

[তৃতীয় কিস্তি]

[১৯৯৬ সালে প্রথম মক্কা-মদিনার মুসাফির হবার সুযোগ পাই। সে ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। রোযার শেষ দশ দিন ছিলাম মক্কায়। ঈদ করি মদিনায়। এপ্রিলে প্রথম হজ্জ। হজ্জ শেষে রিয়াদ ফিরি ৩০ এপ্রিল। এরপর আশপাশের বিভিন্ন শহর নগর জনপদে ঘুরে বেড়াই। কখনো একা। কখনো সাথিসহ।

জুনের প্রথম সপ্তাহে আল-কাসিম যাই রাষ্ট্রদূত মীর নাসিরউদ্দীনের সাথে। আল কাসিমে মরুভূমির এক কৃষি খামারে দুর্ভোগের শিকার ক'জন বাংলাদেশী শ্রমিক। তাদের অবস্থার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রদূতের ব্যতিক্রমি সফর। মরুভূমির এক কৃষি খামারে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা সে অভিযান।

www.pathagar.com

জুনের মধ্যভাগে সফর করি ইস্টার্ন প্রভিন্স। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের দাম্মাম, দাহরান, আল আহসা, হফুফ ও আবকিক এলাকা। রহিমা, রাস্ত আনুরা, আল আওজাম। সিহাত কাতিফ ও জুবেইল। রেল ও সড়কপথে ভ্রমণ। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্যাম্প ও ভিলাগুলিতে আমার কয়েক সপ্তাহের এ সফর ছিল নানা চকমপ্রদ অভিজ্ঞতার সমাহার।

জুলাই মাসটা রিয়াদেই ব্যস্ত কাটে। এভাবে জুন-জুলাই-আগস্টের কয়েক সপ্তাহ এদিক ওদিক কেটে যায় মরুঝড়ের মতো বিক্ষিপ্ত। এরপর আগস্টের শেষ সপ্তাহের এক সকালে সাপটকো বাস আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ফের মক্কার পথে।]

জিয়ারত ও তেজারত ঃ মক্কায় তেসরা সফর

সৌদি আরবে এখন প্রচন্ড গরম। বাসে যাত্রি কম। প্রায় অর্ধেক আসন খালি।

রিয়াদ থেকে এক হাজার কিলোমিটার পথ। এক্সপ্রেসওয়ে। চার-চার আট লেনের সড়ক। মাঝখানে প্রশস্ত সড়ক দ্বীপ। দুই পাশে গাড়ির মিছিল। বিরামহীন রাতদিন।

রাস্তার দু'পাশে ধুসর বালিয়াড়ি। কখনো উঁচু-নীচু পাহাড় সারি। কোথাও কালো লাভার আস্তরণ। কোথাও বালির শরীর ছ্যাঁকা ছ্যাঁকা।

মরুমাঠের উটেরা সড়কে ওঠা বিপদজনক। সড়কের দুই কিনারে তাই শক্ত মোটা তারের বেড়া।

পথের ধারে কোথাও দুমড়ানো গাড়ি। শিয়াল-শকুনের ফেলে যাওয়া কংকালের মতো। কারা কবে পথ হারিয়েছে এ সড়কে?

কোথাও কোথাও ছাগল-ভেড়ার পাল। আগে চরাতেন আরব বেদুইন। এখন ছাগলের পালে আজনবী রাখাল।

নির্জন বিস্তীর্ণ মরুতে পশুপাখিদের সাথি আছে। কিন্তু এই প্রবাসি রাখালদের সাথি-বান্ধব নেই। পশুপালের সাথে তাদের বসবাস।

ছাগলের আরবি গানাম। ধূলা-মাটিকে বলা হয় তোরাব। রাখালরা *গানাম* ও *তোরাব* ভালো চেনেন।

রিয়াদে এক পিকনিক অনুষ্ঠানে প্রবাসিদের অভিনীত নাটক দেখছিলাম। নাটকের নায়ক রাই-ই-গানাম। ছাগলের রাখাল। মায়ের কাছে সে চিঠি লিখে ঃ 'মা আমি মরুভূমিতে ছাগল চরাই। প্রতিদিন দু'এক সের তোরাব খাই।'

মা খুব খুশী। দেশে দু'বেলা ভাত জোটেনি ছেলের। এখন প্রবাসে পেট ভরে তোরাব খাচ্ছে! খুশী মনে মা জবাব লেখেন ঃ 'আল্লাহর কাছে দোয়া করি! তুমি যেন আরো বেশী তোরাব খাইতে পার।'

মায়ের চিঠি বুকে নিয়ে মনের দুঃখে ছেলে হাসে।

পাশের সিটে ভিনদেশী যাত্রী। তবু নৈশব্দে আমি একা। বাসের সাথে একশ দশ কি.মি. গতিতে ছুটতে ছুটতে আমার ভাবনা হিজিবিজি।...

www.pathagar.com

এক পুরুষ আগেও নয্‌দ থেকে হেজাজ যাওয়ার পাকা সড়ক ছিল না। এই মাত্র ষাটের দশকে রিয়াদ-মক্কা বিজন পথে দু'চারটি মালটানা ট্রাক চলতো। সময় লাগতো কম-সে-কম দুই দিন। এখন চব্বিশ ঘন্টায় দু'বার যাওয়া-আসা করা যায়। সব কিছু কেমন বদলে গেছে। আলাদীনের আশ্চর্য জাদুর চেরাগের ছোঁয়ায়।

উড়ালপথে বন্ধুরা অনেকে এখন আরো সহজে রিয়াদ-জেদ্দা যাতায়াত করেন। কিন্তু সে যাত্রায় চরণ হয়! ভ্রমণ হয় না।

পথের দু'পাশে বালুর সাগর আর বিক্ষিপ্ত জনজীবন। দুপুরের নামাজ ও খাওয়ার বিরতিতে সরাইখানায় থামি। হাকডাক আর নানা ভাষার মানুষের বিচিত্র কলরবে মুহূর্তে নেচে ওঠে সরাইখানা।

এমনি সব সরাইখানায় আগে উটের কারাভাঁ থামতো। দু'চার দিন বিশ্রাম নিত। এখন তো বিরতি ঘন্টা-মিনিট ধরে। চালক হয় তো ঘোষণা করেন ঃ ইশতারাহ! নুস সা! বিরতি আধ ঘন্টা। সে মতে ঘড়ি ধরে সব কাজ সারি। তবু আমি সরাইখানার কোলাহল আর সরব আতিথেয়তা দারুণ উপভোগ করি। অন্তরে মেখে নেই নানা জনপদের বাসিন্দাদাদের আত্মার আশীষ। উড়ালপথে তা কি সম্ভব?

গাড়ি ফের চলতে শুরু করে। টিভির পর্দায় ভাসে নানা ছবি। কখনো সাগরের তলদেশ। কখনো জঙ্গলের প্রাণীকূল। কখনো বাজতে থাকে মরুপল্লীর বিরহী সুর। এ সব পল্লী গানে সৌদি জীবনরীতির ছন্দবদ্ধ ঐতিহ্য স্পর্শ করি। মনে হয় দিগন্ত বিস্তৃত মরুপথে উট হাঁকাচ্ছি। বিরহি প্রিয়ার তাঁবুর আকর্ষণে।...

পথের দু'পাড়ে জীবিত প্রাণী কিছু উট। কদাচিৎ দু'চারটা খচ্চর। উটেরা মরুর বুকে খুটে খায় কাঁটা জাতীয় ঘাস। কখনো দু-একটি উট তারের বেড়ায় ঠেস দিয়ে গলা বাড়িয়ে বিরহি চোখে অপলক চেয়ে থাকে দূর পথের যাত্রীদের দিকে।

এ উটকে মরুভূমির জাহাজ উপমা কে দিয়েছেন?

বালির সাগরে কালো রেখামতো এক্সপ্রেস ওয়ে। আমি সে সাগরে ভাসি। আর ঢাকা থেকে পাওয়া আধা ডজন সাময়িকীর শব্দে-শব্দে বাংলাদেশ তালাশ করি।...

ঢাকা ডাইজেস্ট-এর জুলাই সংখ্যায় লিখেছেন সালাহউদ্দীন বাবর ও আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। তাদের লেখার মাঝে নিজেরে খুঁজি। সাংবাদিকতায় তারা কতকাল আলো ছড়াচ্ছেন। আর আমি? পথিক তুমি কি পথ হারিয়েছ! ...এস. মুজিবুল্লাহ গত এপ্রিলে ইনতেকাল করেছেন। ডাইজেস্ট-এ তার মেয়ের একটি লেখা পড়ে চোখ ঝাপসা লাগে।

তায়েফে দু'রাতের মেহমান

তায়েফ স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছেন শামসুল ইসলাম। তাকে দেখে অবাক হই।

শামসুল ইসলাম এক সময় জাতীয় দৈনিকের সংবাদদাতা ছিলেন। সেই তখন পরিচয়।

www.pathagar.com

কৈশোর ও তারুণ্যের মাঝামাঝি বয়সের সেই বিনম্র ছেলেটি জীবনের অনেক বাঁক পেরিয়ে এখন মক্কা-তায়েফ-আলবাহা-হাদ্দা জুড়ে প্রবাসি বাংলাদেশীদের মাঝে সৌরভ ছড়াচ্ছেন। শামসুল ইসলামের সাথি লতিফুর রহমান টাঙ্গাইলের লোক।

তাদের সাথে বোখারিয়ায় যাই। সেখানে এশিয়া হোটেলে প্রবাসি বাংলাদেশীদের সাথে আমার প্রথম মুলাকাত।

তায়েফের আবহাওয়া রিয়াদের তুলনায় ভদ্র। তবে সন্ধায় বিনা নোটিশে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। পাশেই একটি টিনের ছাদওয়ালা বাড়ীতে বৃষ্টি ঝরছে ঝমঝম শব্দ করে।... যেন বাংলাদেশেই আছি। ঢাকাও এখন বর্ষণমুখর। আমার সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজকরা বলেন এ বৃষ্টি ক্ষণিকের মেহমান।

কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টির তীব্রতা কমে যায়। আমরা সভাস্থলে হাজির হই। রাত সাড়ে নয়টা থেকে টানা তিনঘন্টা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। তারপর খাওয়া দাওয়া। নুঝায় ফিরি রাত দেড়টায়। সেখানে রাতবাস।

ছাব্বিশে আগস্ট ফজরের পর তায়েফের নুঝা মহল্লার একটি হলরুম আকারের ঘরে শুয়ে স্মৃতির পাতা উল্টাই। এই আমি! যার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে গ্রামবাংলার নিভৃত গাঁয়।...প্রথম যৌবন লিপ্ত হয়েছে সদ্য মফস্বল উত্তীর্ণ শহর-ঢাকার নব জাগ্রত মধ্যবিত্ত সন্তানদের উত্তাল উৎক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝায়।...কর্মক্ষেত্রের প্রথম প্রেম ছাপাখানার কালি-ঝুলিতে। সাংবাদিকতায় গুজরেছে হাজারো ঘটনাবহুল দিন-রাত।...

তারপর ছন্দবদল! সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মী। শেষে ব্যাংক-বাণিজ্যের মূলস্রোতে ডুব-সাঁতার।...এখানেও শুধু দুই আর এক-এ তিন নয়। এখানেও মানুষের মাঝে ছুটে চলা। এখানেও রিপোর্ট তৈরির কাজ। এখানেও ভালোবাসাবাসি। রাগ-বিরাগ।...

সেইসব ছেড়ে এই আমি এখন শুয়ে আছি সৌদি আরবের তায়েফ নগরীতে।

তায়েফ অশ্রুভেজা নাম। রসূল [সা.]-এর জীবনের গভীর বিষাদময় দিনের স্মৃতিমাখা তায়েফ। এই তায়েফে আমি এক নতুন পণ্যের সওদাগর। আমার বিপণন বনি সকিফের মতো তীব্র-প্রচন্ড বৈরি কবিলার কাছে নয়। প্রবাসি বাংলাদেশীরা তাদের হৃদয়জুড়ে আমার জন্য মেহমানদারির দস্তরখান পেতেছেন।

বিকাল তিনটা পর্যন্ত বোখারিয়ায় ভীড় জমে প্রবাসি বাংলাদেশীদের। তাদের রোজগারের টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠালে দেশের কল্যাণ। হুন্ডিতে পাঠালে দেশ বঞ্চিত হয় বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। দেশের ক্ষতিতে নিজের ক্ষতি। এ প্রতিজ্ঞা ছড়িয়ে যায় প্রাণ থেকে প্রাণে।

বোখারা থেকে বোখারিয়া

নামাজের সময় এ দেশে সব কাজ বন্ধ। আমরা মসজিদে যাই। ইমাম সাহেবের পোশাক ও টুপিতে তুর্কিস্তানী ছাপ। কিছু ছেলে-বুড়ো মুসল্লির অবস্থাও তাই।

www.pathagar.com

রুশ বিপ্লবের সময় প্রতারিত ও লাঞ্ছিত রুশীয় তুর্কিস্তানের লাখো বিপন্ন মুসলমান দেশ ছেড়ে আশ্রয় নেন নানা জনপদে।...স্টালিনের আমলে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। বিপন্ন মুসাফিরদের একটি অংশ বনপোড়া হরিণের মতো ছুটতে ছুটতে এসে তায়েফে আশ্রয় নেন।

তুর্কিস্তানের বোখারার সেই মুহাজিরদের শতাব্দী-প্রাচীন আশ্রয়কেন্দ্র তায়েফ। তাদের হৃদয়ে বোখারার স্মৃতি অম্লান। তাদের স্বদেশপ্রেমের স্মারকরূপে পার্বত্য তায়েফ নগরীর এই জায়গার নাম বোখারিয়া। সেই কবে থেকেই বোখারিয়া তুর্কিস্তানী মুসলমানদের বড় আশ্রয়কেন্দ্র।

এক অনির্বচনীয় আকর্ষণে এগিয়ে যাই। ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলি। জ্ঞানী ও বিনয়ী মানুষ। দু'এক কথায় বুঝি তার ব্যক্তিত্বে চুম্বকের আকর্ষণ। শেষে আমি হুজরার দিকে তার গমনপথে আমার চোখ মেলে রাখি। আমার চোখের সামনে ভাসে ইমাম শামিল ও হাজী মুরাদের প্রতিচ্ছবি। হাজী মুরাদের যে ছবি এঁকেছেন লিও তলস্তয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে।

বোখারিয়ায় এখন ভীড় জমেছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে তারা জমা হয়েছেন তায়েফে। এখানকার বিভিন্ন দোকানপাট ও হোটেল রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডে এখন বাংলা হরফের বাহার।

রাসূলের স্মৃতি জড়ানো মাছনা

বিকালে বোখারিয়া থেকে শামসুল ইসলামের সাথে মাছনা যাই। শামসুল ইসলাম বলেন, রাসূল [সা.] যে পথে মক্কা থেকে তায়েফ এসেছেন এই সড়ক সে পথ ছুঁয়েছে।

তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে ক'বছর পর রাসূল সা. হিজরত করেন মদিনায়। সেই হিজরতের চৌদ্দশ সতেরো বছর পর আজ ১৩ রবিউসসানী আমরা নবীজীর কদমছোঁয়া জমিনে হাজার বছরের সঞ্চিত আবেগ নিয়ে ছুটছি দ্রুতগতি টয়োটা ক্রেসিডায়।

শামসুল ইসলাম একটি উঁচু পাহাড়ের পাশে পুরনো প্রাচীর ঘেঁষে থামেন। 'এই যে দেখছেন! মাছনার এই দেয়ালঘেরা এলাকা! এখানেই পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন নবীজি। তারপর ক্ষত-বিক্ষত দেহে আঙ্গুরঝোপের ধারে বিশ্রাম নিয়েছেন। এই সেই ঐতিহাসিক স্থান! তুর্কি আমলে এখানে একটি স্মারক মসজিদ নির্মাণ করা হয়।'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অবাক শামসুল ইসলাম বলেন, 'কী ব্যাপার! ওরা মসজিদে যাবার দুটি দরোজাই ইট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে!'

পাচিলের বাইরে থেকে মসজিদের দিকে তাকিয়ে থাকি। দেয়াল জরাজীর্ন। দেয়ালের একাংশে মেরামতের চিহ্ন।

মসজিদসহ জায়গাটির ছবি তুলতে ক্যামেরা তাক করি। সাথে সাথে পাথরের কয়েকটি ঢিল এসে পড়ে আমাদের দিকে। হতচকিত হয়ে দেখি পাচিলের ভিতর খোলা মাঠে

www.pathagar.com

কয়েকটি বালক। খেলা ফেলে তারাই আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়েছে। আমাদের কারো গায়ে লাগেনি। কেউ রক্তাক্ত হইনি।

একটু পরই পাঁচ-ছয়টি ছেলে বেরিয়ে আসে। তাদের প্রশ্ন ঃ এশ হাজা! কী হচ্ছে এটা?

পাচিলের একপ্রান্তে এই ছেলেদের বাসা। সৌদিদের বাসাবাড়ির দিকে ক্যামেরা তাক করা তো এক অভাবনীয় অপরাধ!

শামসুল ইসলাম ওদের বোঝান, বাংলাদেশী এই ভদ্রলোক ব্যাংক আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর মুদির এবং সৌদি আরবে ওই ব্যাংকের মানদুব। প্রতিনিধি। এককালে সাংবাদিক ছিলেন। রিয়াদ থেকে এসেছেন। রসূল [সা.]-এর স্মৃতিজড়ানো এ ঐতিহাসিক জায়গার একটি ছবি নিতে ক্যামেরা তাক করেছেন।

ছেলেরা কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু তাদের দলপতিটি শামসুল ইসলামের কাগজপত্র দেখতে চায়।

শামসুল ইসলাম বলেন, আমি তায়েফ হাসপাতালের কর্মকর্তা। আর তোমরা তো 'জাওয়াজাত'-এর লোক নও! তোমরা কেন আমার কাগজ দেখবে?

ছেলেটি বলে ঃ আনা বাবা মুদির আল জাওয়াজাত। আমরা বাবা পাসপোর্ট অফিসের ব্যবস্থাপক।

ছেলেদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাচীন তায়েফের দেয়াল ঘেঁষে আমাদের গাড়ি পাঁক খায়। আদি তায়েফের পুরনো পরিত্যক্ত এ এলাকা। প্রান্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা জনমানবশূন্য দীর্ঘদিন। চারদিকে পাহাড়-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে কেমন খা খা শূণ্যতা। ভয়বিহবল বিষন্ন পরিবেশ।

পরিত্যক্ত এ শহরের উত্তর-পুব কোণে আরেকটি মসজিদ। মসজিদে আলী। মসজিদের পটভূমিতে কালোশিলা বিশাল পাহাড়। এই পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করেই জিবরাইল [আ.] রসূল [সা.] কে বলেছেন ঃ 'আপনি বলুন, আমি দু'টি পাহাড় দিয়ে তায়েফ শহর ও তার জালেম অধিবাসীদের পিষে ফেলি।'

রাসূল [সা.] তায়েফবাসীর ধংশ চাননি। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।– বলতে বলতে আবেগে কাঁপছেন শামসুল ইসলাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কবরের পাশে

মাছনা থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মসজিদ দেখতে যাই। বাইরে-ভিতরে সৌন্দর্যের মুগ্ধতা নিয়ে প্রকান্ড মসজিদ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আমলের মসজিদের ওপর সর্বাধুনিক স্থাপত্যের অপরূপ কারুকাজ নিয়ে নগরীর সবচে সৌকর্যমন্ডিত এই স্থাপত্য। এই মসজিদ না দেখে পর্যটকরা তায়েফ ছাড়েন না।

মসজিদের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পুব-উত্তর কোণে কিছু প্রাচীন কবর। এসব কবরগাহে কোন্‌টিতে কে শুয়ে আছেন তা জানেন না মসজিদের কর্মচারীরা। নামাজের সময় ইমাম সাহেব আসবেন। তিনি জানেন কোন্‌টি কার কবর।

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত আমরা কবরস্থানগুলির সাথে পরিচিত হই। রাসূল [সা.]-এর তায়েফ অবরোধকালে ক'জন সাহাবী শহীদ হন। মসজিদের পশ্চিম পাশে তাদের কবর। পুব-উত্তরে শুয়ে আছেন বিখ্যাত সাহাবী ও হাদীসবেত্তা মক্কা ও তায়েফের গবর্ণর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস।

ইবনে আব্বাসের কবরে কোন নামফলক বা স্মারকচিহ্ন? নেই। আস্তর উঠে যাওয়া পুরনো প্রাচীরের ভিতর অনেকগুলি কবরের কোন একটিতে শুয়ে আছেন তিনি।

নান্দনিক স্থাপত্যমন্ডিত এক অসাধারণ সুন্দর মসজিদের পাশে বিখ্যাত সাহাবিদের সাদামাটা সমাধিস্থল।

শামসুল ইসলাম ব্যাখ্যা করেন ঃ মসজিদ জীবিত মানুষের কর্মকেন্দ্র। কবর মৃত ব্যক্তিদের শেষ বিছানা।

জীবিত মানুষদের জন্য আরামদায়ক প্রশস্ত বাসস্থান প্রয়োজন। মৃতদের ঘরে সাজসজ্জায় কারো কল্যাণ নেই। তাদের ভালো কাজ স্মরণ ও অনুসরণ করো। আর মন্দকাজের কাজীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নাও।

আমরা মসজিদ-ই-হাদী দেখতে যাই। তায়েফ অবরোধকালে এখানে দাঁড়িয়ে রাসূল [সা.] সাহাবীদের নসিহত করেন। সেই ঘটনার স্মারক হাদী মসজিদ।

শামসুল ইসলাম যোগ করেন, ঐতিহাসিক স্মৃতি রক্ষায় মসজিদ নির্মাণ মুসলমানদের একটি সাধারণ ঐতিহ্য।

হাদী মসজিদের ছবি তুলতে চাই। পাশে দাঁড়ানো পুলিশ বলেন থানার অনুমতি লাগবে। দূরে দাঁড়ানো থানার তিন কর্মকর্তা আমার ইকামা ও ওরাকা উল্টে-পাল্টে দেখে মসজিদের বাইরে থেকে একটি ছবি নেয়ার অনুমতি দেন। ভিতর থেকে ছবি তোলা মাম্‌নূ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মসজিদে মাগরিবের নামাজ শেষে দোতলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ও লাইব্রেরী দেখতে যাই। জাদুঘরের কিউরেটর আমাদেরকে বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি দেখান। তার সাথে গল্প করে ভালো লাগে।

রাতের সমাবেশ নুঝা থেকে দূরে এক কোম্পানির ক্যাম্পে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বহুলোক হাজির হন সেখানে। প্রায় সবাই বালাদিয়া কর্মী। ক'জন আছেন আধা দক্ষ জনশক্তি। প্লাম্বার ও টেকনিক্যাল কর্মচারী। তারাও অদক্ষ অবস্থায় সৌদি আরবে এসেছেন। এখানে কাজের ফাঁকে কাজ শিখেছেন। মান বেড়েছে।

একতলার হলরুমে অনুষ্ঠান। খাওয়ার ফরাসে মিলিত হই দোতালায়। রাতের ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে।

তায়েফ থেকে আল-বাহা

সাতাশ আগস্ট। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসেন নুঝায়। ব্যাংক হিসাব খোলার

www.pathagar.com

মিছিল। ব্যস্ততা ও ভীড় চলে জোহর তক। বিকালে রওনা হই আল-বাহা।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দায়িত্বে একজন মুদির। মুদিরের নীচে এদেশে কোন পদবি নেই। রিয়াদের পুলিশ প্রধান একজন মুদির। তায়েফ হাসপাতালের প্রধানও মুদির। ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কেয়ারটেকারও মুদির।

মুদির আমার ওরাকা দেখে চোখ কপালে তোলেন ঃ 'সিত্তা মুনতাকা! সৌদি আরবের পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সবখানে তোমার বিচরণ!' অবাক চোখে অদ্ভুত আজনবীকে দেখেন মুদির। তারপর তাজিমের সাথে কাগজপত্র ফেরত দেন।

পাঁচজন যাত্রী নিয়ে কঠিন চেহারার প্রবীণ সৌদি চালক ট্যাক্সি স্টার্ট দেন।

পথের দু'ধারে উঁচু পাথুরে পার্বত্য বিস্তার। যদ্দূর চোখ যায় কালো শিলার সাম্রাজ্য। বিশাল পাথরখণ্ডের স্তূপ। শত শত টন ওজনের পাথর সাজিয়ে চূড়া তৈরী করে রেখেছেন কেউ। চূড়াটি ক্রমশ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে হাজার টন ওজনের পাথর খণ্ড আলগোছে ঝুলে আছে। যেন অদৃশ্য সূতায় এই মহাস্তূপ ধরে আছেন কোন অদৃশ্য শক্তি। সূতা ছেড়ে দিলে চার পাশে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এই কঠিন শিলাস্তরের মাঝে রাস্তার দু'পাশে হৃতপিন্ডের ধুকধুকানির মতো শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে অনেক যত্নের ফসল সারিবদ্ধ কিছু সবুজ-শ্যামল গাছ।

পাহাড় পর্বতের গা বেয়ে নামে ঝর্ণাধারা। সে ঝর্ণা স্রোতের সৃষ্টি করে। সে পানি বয়ে যায় ওয়াদি দিয়ে। পর্বতের পায়ের নিচে দু'একটি ওয়াদিতে এখন ঝির ঝির বইছে পানির স্রোত।

চালকের পাশের সিটে দু'জন সৌদি যাত্রী। পিছনে আমার সাথি একজন বাংলাদেশী। অন্যজন পাকিস্তানী। বাংলাদেশীর হাতে পলিথিনের পুটলীতে খিলি পান। একটু পরপর তিনি মুখে পুরছেন পানের খিলি।

পাকিস্তানীকেও বাংলাদেশী ভেবেছিলাম। সৌদি মিসরী-সুদানী-তুর্কিদের বহুজাতিক জলসায় বাংলাদেশী পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের চেহারায় অমিলের চেয়ে মিলটাই বেশী। এই তিনদেশের লোকেরা এখানে থাকেন একে অপরের গলা জড়িয়ে। আলাপে জানলাম পাকিস্তানী ভদ্রলোকের বাড়ি করাচীর ঔরঙ্গাবাদের ইকবাল মহল্লায়।

তায়েফ সীমানা শেষ হবার আগেই পুলিশ চেকপোস্ট। পুলিশ কাগজপত্র দেখেন। আবার ছুটে চলা। কিছুক্ষণ পর আকাশ আচ্ছন্ন করে ধুলিঝড় শুরু হয়। এরপর মুষলধারে বৃষ্টি।

এমনি ঝড়ো পরিবেশে পার্বত্য এসকার্পমেন্টে ক্রুর মতো বাঁকানো ঘুরানো পথ। একটু পরপর রাস্তার ধারে সতর্ক সংকেত ঃ 'সামনে বিপজ্জনক মোড়! ওহে পথিক তুমি সাবধান হও!!'

www.pathagar.com

এসব কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই চালকের। তীর-তীব্রবেগে ছুটছে যান্ত্রিক উট। পর্বতসঙ্কুল প্যাঁচালো মোড়ানো বিপদজনক পথ। আমার চোখ বারবার স্পীডো মিটারে ঝুলে থাকে। হাজার হাজার ফুট উঁচু পার্বত্যপথে আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খাড়া বিপদজনক মোড় একশ বিশ থেকে একশ চল্লিশ কি. মি গতিতে পাড় হচ্ছি। আমার রোমাঞ্চপ্রিয় আত্মাটা এখন ভিতরে ভিতরে থরথর কাঁপছে।

কোহকাফের জঙ্গলের ধারণা ছোটবেলা থেকেই অন্তরে বাসা বেঁধে আছে। সয়ফল মূলুকের পুথির কোহকাফের ভেতর দিয়ে আমরা এখন ছুটছি ঝড়-তুফান অগ্রাহ্য করে।

রাস্তার একপাশে পর্বতের উঁচু দেয়াল। আরেক পাশে ঘন গভীর অতল খাদ। এ দেয়াল থেকে ছিটকে পড়লে হাজার হাজার ফুট নীচে পাতালের কোন রাজকুমারীর মেহমান হবো!

আস্তে চালানোর অনুরোধ করার সাহস নেই। লাভও নেই তাতে। অতএব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ডুব-সাঁতার কেটে ভয় মিশানো আনন্দের বৈচিত্রময় ভুবনের ভিতর হারিয়ে যেতে যেতে এগিয়ে চলি। সে-ই ভালো!

জেদ্দা থেকে আবহা পর্যন্ত সোয়া ছয়শ কি.মি. দুর্লংঘ পার্বত্য এসকার্পমেন্ট। দক্ষিণ আরবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাকৃতিক দেয়াল। আমাদের আজকের সফর তার প্রায় অর্ধেক পথ জুড়ে।

আমরা যেন পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করছি। হাতের নাগালে মেঘেঢাকা আকাশ। সড়কের কিনার ঘেঁষে একধারে পর্বতের গায়ে মেঘেরা খেলা করছে। আরেক কিনারে নীচে গহিন খাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় পৃথিবীর কিনারা বেয়ে নিঃসীম নীলের ভেতর ছুটছি। এখান থেকে পা ফসকালে অন্য কোন গ্রহের কালো গহ্বরে হারিয়ে যাব।

গাড়ির ক্যাসেটে চড়া ভল্যুমে গান বাজছে। অজানা শিল্পী দরাজ গলায় গাইছেন। সেই গানে কোরাশ ধরেছেন অনেক ক'জন। গানের কথা বুঝি না। কিন্তু দরদমাখা এই পল্লী গানের সুর হৃদয়ের সূক্ষ্ম তারে টংকার তোলে।

চালক আর তার পাশের দুই সৌদি যাত্রী গানের দোহারে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন। চালক এখন বেশী উত্তেজিত। দিগন্ত বিস্তৃত কোন মরুমাঠে যেন উট হাঁকিয়ে চলছেন।

অনেকক্ষণ চলে ক্যাসেটের এই গান। আমাদের সহিসের কণ্ঠে সেই সুর লেগে থাকে আরো বহুক্ষণ।

আমরা কখনো পর্বত বেয়ে নীচে নামি। পর্বতের পায়ের কাছে কোথাও পথের ধারে দু'একটি ছোট জনপদ। এ গহিন পার্বত্য প্রদেশে জনপদ মানে ক'টি বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ি। কিছু মানুষের ছিটেফোটা বসবাস। আর কিছু নিছক বাগান বিলাস।

সৌদি আরবের নানা মরু প্রান্তরে 'ইশতারাহা' দেখে কলকাতার হঠাৎ-বড়লোকদের

www.pathagar.com

বাগানবাড়ির কথা মনে পড়ে। সে ছিল উনিশ শতকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থশিকারি লাফাঙ্গা আধা-বণিকদের গলা জড়িয়ে বেড়ে ওঠা কলকাতার কিছু বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী আর নায়েব-গোমস্তা-দালালের গল্প।

আর এখানে! উপসাগরের তেলের দাপটে হঠাৎ জেগে ওঠা বদুরা তাবু ছেড়ে ঘর বেঁধেছেন শহরে। তারা প্রাণের টানে মাঝে-মধ্যে পরিজন নিয়ে সুখবাস করতে আজুমায় আসেন মরুভূমিতে।

দু'একটি বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কিছু দোকান– বাকালা। পাশে মাহাত্তা বা গ্যাস স্টেশন। আর মোটর ওয়ার্কশপ। কোথাও ভাঙ্গা গাড়ির স্তূপ।

এই সড়কের ডানপাশে সাহান পল্লীর পথ! এই গহিন পার্বত্য পথের কোথায় ঠেকেছে সাহান পল্লী! হালিমার গ্রাম। হালিমা আস-সাদিয়া। রসূল [সা.]-এর ধাত্রীমাতা হালিমার গাঁয়ের পাশ দিয়ে ছুটছি আমি!

রাসূল [সা.]-এর শৈশবের কিছুদিন কেটেছে এখানে হালিমার গহিন পল্লীগৃহে। এখানেই ঘটেছে তার সিনা-চাক!

বর্ধিষ্ণু এক বাজারের নাম আতাউরা। পাশে থানা। বাদশাহ ফয়সল ও বাদশাহ খালেদের যমানায় এখানে বদুরা কৃষিতে ঝুঁকেছিলেন। গড়ে উঠেছিল কৃষি খামার। ফাহাদের আমলে কুয়েত যুদ্ধের আঘাত লাগে সৌদি অর্থনীতির শাহরগে। সরকার তুলে নেয় কৃষি ভর্তুকী। অসংখ্য কৃষি খামার ফের অনাবাদী বিরান উপত্যকায় পরিণত হয়।

পথের পাশে মাইল নির্দেশক সাইনবোর্ড জানান দেয়, আর মাত্র ৩০ কি.মি. পরই আল-বাহা।

গন্তব্যে পৌঁছার আগে দু'টি গ্রাম বিদাহ ও শুব্রিগাহ। পাহাড়ের ধুসর সবুজ জমিনে সেখানে সাদা-কালো ফোটা ফোটা দাগ। বিস্তীর্ণ কম্বলে শিল্পীর কারুকাজ। এ সবই পাহাড় পর্বতের গায়ে ভেড়া-বকরীর পাল।

এসব এলাকায় আগে মেষ বকরী চড়াতেন বদুরা। সেই রাখালদের স্থানে এখন কাজ করছেন পলি মাটির পল্লী বাংলার কৃষি-জমি থেকে উঠে আসা কর্মীদল।

পাহাড়-পর্বতের ঢালে জীর্ণ পুরাতন ছোট্ট তাবুতে বসতি এই আধুনিক বাঙালি রাখালদের। সৌদি মনিবরা থাকেন নাগরিক কোলাহলে, অট্টালিকায়। আর বাঙালি নতুন রাখালদের তাঁবুর পাশে ভেড়া-দুম্বার পাল। যেমনটি আগে ছিল বদুদের।

ডানে পথ গেছে আল-ফারহি। সোজা পথে আল-বাহা।

পর্বতের ঢালে ঢালে কুয়াশার পর্দা। কোথাও রাতের আভাস। কোথাও সূর্যের আলোক সম্পাত। এমনি আলো-আঁধারির মাঝে আমরা পৌঁছি আল-বাহায়।

লক্ষীপুরের আবদুল আজীজ আরো ৩০ কি. মি দূরে বেলজুরাইসী যাবেন। পাঁচ রিয়ালের ট্যাক্সিতে। আট বছর আছেন বেলজুরাইসীতে। স্ত্রী ও সদ্যজাত একমাত্র মেয়েটিকে রেখে এসেছেন বাংলাদেশে। তাদের জন্য দোয়া চেয়ে বিদায় নেন তিনি।

www.pathagar.com

আল-বাহা থেকে বেলজুরাইসী

আল বাহায় আমার প্রথম কাজ বাংলাদেশী একটি মাছের দোকান খুঁজে বের করা। সেখান থেকে জানবো আমার এখানকার ঠিকানা।...তার আগেই এক দল বাংলাদেশী আমাকে ঘিরে ধরেন।

এখন গাড়ি চালাচ্ছেন জাহাঙ্গীর হোসাইন। গন্তব্য বেলজুরাইসী। সেখানেই রাতের অনুষ্ঠান ও রাত্রিবাস।

জাহাঙ্গীরের সাথে আমার পরিচয় গত হজের সময়। মিনার তাঁবুতে। মিনার ক্যাম্পে কয়েকশ হাজীর যৌথ হজ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ছিলাম। সেখানে পানি সরবরাহের ইউনিটে জাহাঙ্গীর ছিলেন ক্লান্তিহীন কর্মী। তখনই তার চমৎকার মানবিক একাগ্রতায় মুগ্ধ হই।

আল-বাহা পার্বত্য শহর। এখান থেকে বেলজুরাইসী পাহাড়-পর্বতের ভিতর দুর্গম পথ। পথে একটি ছোট সুন্দর মসজিদ। সেখানে মাগরিব আদায় করি।

বেলজুরাইসীতে জাহাঙ্গীরদের ভিলায় শতাধিক লোক থাকেন একসাথে। সেখানে মেহমানের জন্য অপেক্ষার হাট বসেছে। শুরুতেই এক মগ কড়া সুলেমানী চায়ের রিকুইজিশন দিয়ে সরাসরি হলরুমে হাজির হই।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত সভা চলে। হাজির জনতা সাধারণ শ্রমিক। এক কথায় তাদের পরিচয় বালাদিয়া। শ খানেক হিসাব খোলার ফরম পূরণ হয়। কারো কারো হাতের লেখা মুক্তার মতো।

আদর্শলিপিতে পড়েছি, হাতের লেখা সুন্দর হলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়! সে পরীক্ষায় পাশ করে তারা এখন বেলজুরাইসীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এই পর্বতকোলে জীবনের বিচিত্র চাষাবাদ করছেন।

অনুষ্ঠান শেষে জাহাঙ্গীর ও জহিরদের সাথে কাঠের বারকোশে আট দশ জন করে এক পাতে খ্যাপছা খাই।

আটাশ আগস্ট বেলজুরাইসীতে ভোর হয়। ভিলার হল রুমে জাহাঙ্গীরের ইমামতিতে ফজরের জামাতে যোগ দেই। জাহাঙ্গীরের তেলাওয়াত প্রাণস্পর্শী।

নামাজের পরে হিসাব খোলার জন্য লোকদের মিছিল। কিছু লোক তো ফজরের আগে এসে জামাতে শামিল হয়েছেন। সৌদি আরবের এই পর্বতসংকুল শহরে প্রায় পাঁচ হাজার বাংলাদেশী থাকেন। এখানে ব্যাংকের প্রতিনিধি আসবেন এটা তারা ভাবেননি।

বালাদিয়ার ক্লিনারদের কারো কারো ডিউটি শুরু সূর্যোদয়ের আগে। তারা ফজরের আগে এসেছেন। ইকামা দেখে দেখে একটির পর একটি হিসাব খোলার ফরমে স্বাক্ষর করি।

www.pathagar.com

ভোর ছয়টায় হলুদ ইউনিফরম পরে সামনে দাঁড়ান জাহাঙ্গীর। গত রাতে তিনি ব্যাংকিং বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেছেন। এখন পথে নামছেন বেলজুরাইসীর রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার জন্য। তারা কেউ বাগান পরিষ্কার করবেন। কেউ গাছের গোড়ায় পানি দেবেন। গাছের পাতা ছাঁটবেন। কেউ পৌরসভার গাড়িতে ময়লা তুলবেন।

জাহাঙ্গীর আরজ করেন ঃ 'কয়েক ঘন্টার ছুটি চাই। সুপারভাইজারের অনুমতি নিয়ে এগারোটায় ফিরে আসব। আপনি তখন তৈরি থাকবেন।'

সুলায়মানের ডিউটি বিকালের শিফটে। তার তত্ত্বাবধানে আমি কাজে ব্যস্ত থাকি।

জাবাল আল ময়দান ও আবু হিশামের গল্প

বেলা এগারোটার দিকে জাহাঙ্গীরের সাথে তার সাদা ডাটসান গাড়ীতে বেরোই। পথের ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফনিমনসার ঝোপ। সেই গাছে থোকা থোকা লাল-হলুদ এক ধরনের ফল! ধুতুরার মতো। শক্ত কাঁটাযুক্ত। এ ফলের নাম বরসুমী। এই অদ্ভুত সুন্দর ফলের সাথে ছবি তুলি।

পাহাড়ি পথ। গ্রামের নাম ময়দান। অপরিসর অমসৃণ পথ বেয়ে আমরা পৌঁছি জাবাল আল ময়দানে। আল-বাহা পার্বত্য এলাকার শীর্ষ চূড়া এই ময়দান পর্বত। পর্বতের গা ঘেঁষে পাথরের তৈরি পুরনো ঘরবাড়ি। কোন কালে এখানে মানুষ বাস করতেন। গুহা মানব! এসব পাথরের ঘরে এখন মানুষ থাকেন না।

এ গাঁয়ের এক প্রবীণ পুরুষের সাথে খাতির-পরিচয় জাহাঙ্গীরের। তার বাড়ীতে যাই। অশীতিপর মেজবান আপ্যায়ন করেন নানাপ্রকার খেজুর, কাহাওয়া ও চায়ের সমাহারে। তার সাথে গল্প জমে। জাহাঙ্গীর দোভাষী।

কথায় কথায় বেলজুরাইসীর অতীত দিনের কাহিনী শুনান আবু হিশাম। সৌদি আরবের এক প্রস্থ ইতিহাস।

আবু হিশাম বলেন, বড় কঠিন ছিল আমাদের অতীত জীবন। বাগানের ফসলে পাঁচ-ছয় মাস চলতো না। পাঁচ-ছয় মাসের উপযোগী খেজুর দিয়ে বছর পার করতাম। সন্ধ্যায় ঘরে বাতি জ্বালানোর কেরোসিন জুটতো না। আঁধার নামার আগেই খাওয়া সেরে নিতাম। এতটা হতদরিদ্র ছিলাম আমরা।

সৌদি গল্পদাদুর চোখ বিস্ফারিত হয়। 'তায়েফ ছিল তখন এক মাসের দুর্গম সফর। উটের পিঠে পাহাড়-কন্দর পাড়ি দিয়ে কালেভদ্রে কেউ তায়েফে যেতেন।'

সেদিনে আর এদিনে কত তফাত। আলাদিনের প্রদীপের ঘষায় যেন জেগে উঠেছে নতুন বেলজুরাইসী। নতুন আল-বাহা। সে দিন থেকে এদিনে রূপান্তর যেন এক অবিশ্বাস্য স্বপ্ন।

বলতে বলতে ছলছল করে আবু হিশামের কোটরাগত কুচকুচে কালো চোখ।

www.pathagar.com

জাবাল আল ময়দানের আতিথেয়তার পরাগ গায়ে মেখে আল গিমা ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢাল আর চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গহিন সবুজে ডুব দিতে দিতে একটির পর একটি ওয়াদি পাড়ি দেই আমরা। ওয়াদি বনি হেলাল, ওয়াদি আল সাফরাহ্।...

পাহাড় থেকে কখন কোন্‌কালে এ পথে ঝর্ণা ছুটেছে। সে স্মৃতি নিয়ে এসব ওয়াদি। নহরে পানি নেই। তবু পরিচয় নদী বা ওয়াদি নামে। সব ক'টি ওয়াদিতে সবুজের সৌন্দর্যের বাণ ডেকেছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ডুব সাঁতার কেটে জাহাঙ্গীর উচ্চারণ করেন কুরআনের বাণী ঃ 'আমার সৃষ্টির দিকে বারবার তাকিয়ে দেখ! দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সৃষ্টিতে খুঁত পাবে না!'

হুস্‌সাম ও বরশুমীর বন্দরে

পথ চলতে চলতে বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় ও ঢালে পাথরে তৈরী ওয়াচ টাওয়ার দেখি। একেকটি পাহাড়-পর্বতকে কেন্দ্র করে এ পার্বত্য এলাকায় গড়ে উঠতো একেক কবিলার জীবনযাত্রা। সেই কবিলার লোকদের ছিল নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তারা তৈরি করেছেন এসব খুদে প্রতিরক্ষা টাওয়ার। হোস্‌সাম।

গোত্রবিভক্ত সমাজ তখন কোন কেন্দ্রীয় শৃংখলার অধীন ছিল না। সুযোগ পেলেই এক কবিলা আরেক কবিলার ওপর হামলা চালিয়ে লুঠ করতো মালসামান। খুন-যখমের ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক। এসব টাওয়ার থেকে দুশমনের গতিবিধির নযরদারি করা হতো। দুশমনের হামলা মুকাবিলা করো। সুযোগ মতো হামলে পড়ো অন্যের ওপর। সবটাতেই এসব পাথুরে দুর্গ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সৌদি আরবে অন্য কোথাও এরূপ হোসসাম দেখিনি।

বাদশাহ আবদুল আযীযের যমানায় জাজিরাতুল আরবের নানা অঞ্চল সৌদি রাজতন্ত্রের কর্তৃত্বে আসে। তখন অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। হোসসাম তার কার্যকারিতা হারায়। এগুলো এখন ঐতিহাসিক নিদর্শন। সৌদি রাজতন্ত্রের আমলে অরাজক যুগের অবসান ঘটেছে। সে যুগের নিদর্শন এসব হোসসাম।

আমরা আল গিমা ন্যাশনাল পার্কে পৌঁছি ঠাঠা রোদ্দোরে।

গরমের মওসুমে আল গিমা ন্যাশনাল পার্ক লোকারণ্য হয়। এখন হাট ভাঙার মওসুম। পর্যটকদের ঘরে ফেরার সময়।

মওসুমের শেষবেলাতেও বহু তাবুতে এখন পর্যটকের ভীড়। একদল ছেলে খোলা জায়গায় হুল্লোর করে ফুটবল খেলছে। গোলপোস্টের বিকল্প দুইপাশে দুটি করে পাথর। আমি নস্টালজিক হই। ইট বা জামা-কাপড় স্তূপ করে গোলপোস্ট বানিয়ে ছোটবেলা সিদ্ধ জাম্বুরা নিয়ে মাঠে হৈ হুল্লোর করেছি। সে দিনের কথা মনে পড়ে।

www.pathagar.com

আল গিমা ন্যাশনাল পার্কে কৃত্রিম লেক। আগে পানি বেশী ছিল। গত বছর লেকের পানিতে ডুবে এক কিশোর মারা গেছে। এরপর পানির গভীরতা কমানো হয়েছে।

আমরা লেকের ধারে ঘুরতে ঘুরতে ভুলে যাই এটা বাংলাদেশের কোন এলাকা নয়।

পার্ক থেকে ভিলায় ফিরে দেখি হিসাব খোলার জন্য বহু মানুষের ভীড়। অগত্যা গোসল-খাওয়া বাদ দিয়ে ঝুঁকে পড়ি তাদের দিকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে প্রবাসিদের সাথে আমার আত্মার লেনদেন।

সন্ধ্যায় রওনা হই আলবাহা। তখনো আমার অস্তিত্ব জুড়ে সকালের ভ্রমণের আনন্দ খেলা করছে। বাবলার ঘন বন-জঙ্গল কিংবা সারিবদ্ধ কেয়ারীর ভিতর দিয়ে স্প্রীং এর মতো ঘুরে ঘুরে এখনো আমি যেনো আল গিমা নাশনাল পার্কের সজীব ও কোমল আদরকে স্পর্শ করছি। আল-গিমার ভ্রমণশীল আনন্দিত মানুষদের কলধ্বনীর মাঝে নাতিশীতোষ্ণ হৈমন্তী বাংলাদেশের নরম বাতাস আমার গায়ে ভালোবাসার পরাগ বিলায়।

আল বাহার সভা শেষে বেরিয়ে দেখি এ পার্বত্য শহরের দোকানপাট হোটেল-রেস্তোঁরা প্রায় বন্ধ। একটা আফগান হোটেলের শেষ খদ্দেররূপে আমরা রাতের আহার সমাধা করি। আলবাহা থেকে পর্বতসংকুল চন্দ্রালোকিত মসৃণ পথে ফের রওনা হই বেলজুরাইসী।

মানুষ বনাম জানোয়ারের ভাষা

ঊনত্রিশ আগস্ট বেলজুরাইসীতে ভোর হয়। সকাল আটটার আগেই স্যাপ্টকো বাসস্ট্যান্ডে রওনা হই। জাহাঙ্গীর এক ঘন্টার জন্য এসে হলুদ ইউনিফরম পরেই গাড়ি চালাচ্ছেন। পোশাক বদলাবার সুযোগ নেই। আমাকে বাসে তুলে দিয়ে ফের শহর পরিচ্ছন্ন করার কাজে যাবেন।

গাড়ির তলপেটের বাংকারে ব্যাগ রাখতে গিয়ে ঝামেলা হয়। একটু নিরাপদ জায়গায় জাহাঙ্গীর এটি রাখার চেষ্টা করেন। বাসের নাইজেরি চালক বাংকারের মালপত্র গুছাতে গুছাতে খেকিয়ে ওঠেন ঃ 'কেন? এতে কি আছে?'

তারপর আমার ব্যাগ নিচে রেখে তিনি চলে যান। আমরা সেটি বাংকারে তুলে দিয়ে চা খেতে রেস্তোঁরায় ঢুকি।

একটু পর চালক সেখানে হাজির। ব্যাগ ভিতরে কেন রাখা হলো। সেজন্য আমাদের খুঁজতে এসেছেন।

আমি বলি, এতে সমস্যা হয়নি।

তিনি বলেন, 'ইয়েস দেয়ার ইজ প্রব্লেম! হোয়াই ডিড ইউ আরলিয়ার রিকোয়েস্ট মি টু কীপ ইট ইন এ স্পেশাল ওয়ে?'

আমরা তার সাথে যাই। তিনি আমার ব্যাগ বের করে একটি আলাদা চ্যাম্বারে রাখেন।

www.pathagar.com

এ চ্যাম্বারে আর কোন মাল নেই।

জাহাঙ্গীর চালককে ধন্যবাদ দিতে গেলে তিনি তেড়ে ওঠেন।

আমি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি শামাল দেই। এ অদ্ভুত আচরণে আমরা হতবিহবল।

সাড়ে আটটায় বাস ছাড়ার কথা। দুই মিনিট আগে বাসে উঠে চালক যাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করেন ঃ 'ইয়া আইয়্যুহাল জামায়াহ! হে সমবেত লোক সকল। আপনারা মানুষের ভাষা কে কে বুঝেন!'

এ অদ্ভুত প্রশ্নে যাত্রীরা লা-জওয়াব। দু'একজন বলেনঃ 'আমরা বুঝি।'

'আপনারা কি জানোয়ারের ভাষা বুঝেন?' চালক জিজ্ঞেস করেন।

এবার দু'একটি ক্ষীণকণ্ঠে 'না' উচ্চারণ শোনা যায়।

চালক বলেন ঃ 'আমি এখন কথা বলছি মানুষের ভাষায়। পরিষ্কার শুনে রাখুন! এই বাসে ধূমপান নিষেধ। এখানে কেউ ধূমপান করবেন না। এই নিষেধ না মানলে তার সাথে আমি জানোয়ারের ভাষায় কথা বলবো। তাকে বাস থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

গাড়ির ডিজিটাল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে আটটা। গাড়ী চলতে শুরু করে।

যাত্রীদের কেউ কেউ এবারে উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। দম বন্ধ থাকা গুমোট পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার একটা চেষ্টা যেন।

জাহাঙ্গীর আহত কণ্ঠে স্বগতোক্তির মতো বলছিলেন ঃ 'এই আফ্রিকী জংলী আসলেই জানোয়ার। আমি ইউনিফরমে না থাকলে পুলিশে খবর দিয়ে ওকে শায়েস্তা করতাম।'

বেলজুরাইসী থেকে মাইল কুড়ি পথ চলার পর চালক হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে সিট থেকে উঠে আসেন। যাত্রীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানতে চান ঃ 'কে ধূমপান করছেন? আমার নাকে সিগারেটের গন্ধ লেগেছে।'

চালক আসনে ফিরার সাথে সাথে ক'টি সৌদি বালক ও ক'জন প্রবীণ বদু উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন।

চালক এ হাসি হজম করে গাড়ীতে স্টার্ট দেন।

সকাল নয়টায় বাস থামে আল-বাহা। আরো একদল যাত্রী ওঠেন। চালক এবারও সবার মালপত্র নিজ হাতে গাড়ীর পেটে তুলে রাখেন। দু'একজন যাত্রী বড় ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। সেগুলি বাইরে নেয়ার নির্দেশ দেন চালক। সহজে তা তামিল হয়।

আল-বাহার এক যাত্রী বাসের বাংকারে প্লাস্টিকের দু'টি পাইপ রেখেছেন। ড্রাইভার সেই পাইপ দুটি টেনে নীচে নামান। এক প্রবীণ যাত্রী পাগড়ি নাচিয়ে চীৎকার করে ওঠেন ঃ 'এটা আমার জিনিস'! তিনি খুব বিরক্ত।

চালক বলেন ঃ 'এগুলি বাংকার থেকে কারো গায়ে পড়ে কেউ ব্যথা পেলে ক্ষতিপূরণ

www.pathagar.com

কে দেবে?'

আরেক দফা হাসির আওয়াজ চারদিকে। চালকের সেদিকে খেলায় নেই।

বাস আলবাহা ছেড়ে রওনা হয়। বেলজুরাইসী থেকে তায়েফ পর্যন্ত পার্বত্য পথের দু'ধারের দৃশ্য দেখি।

শেষে বাস তায়েফ বন্দরে নোঙর করে। বাংকার থেকে ব্যাগ বের করে চালক আমার হাতে দেন। স্বভাবসিদ্ধ একটা ধন্যবাদ না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে আসি। এরপর খারাপ লাগে।

এই লোকটির আচরণ বিশ্লেষণ করি। তার প্রতি কখন থেকে আমার ভেতর সহানুভূতি জমতে শুরু করেছে। কিছু ভালো গুণ তিনি খারাপভাবে ব্যবহার করছেন। ঠিকমতো গাইড করলে তিনি হতে পারেন একজন চমৎকার মানুষ।

তায়েফ বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি ট্যাক্সিতে ওঠি। এগুলোকে বলা হয় দাব্বাব। দাব্বাবের ড্রাইভার সৌদি। তায়েফেই ঘর। যেতে যেতে টুকটাক কথা হয়। তিনি বলেন ঃ 'বাংলাদেশের মানুষ ভালো। বাংলাদেশে মুসলিম 'কাতির'। অনেক মুসলমান। বাংলাদেশ কয়েস। বাংলাদেশ ভালো।'

আমি তাকে বাংলাদেশে বেড়ানোর দাওয়াত দেই। তুমি যাবে ভাই/যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়...।

বোখারিয়ায় এশিয়ান হোটেলে প্রচন্ড ভীড়। লোকেরা বসে বা দাঁড়িয়ে হিসাব খোলার ফরম পুরণ করছেন। আমার পৌঁছতে প্রায় দু'ঘন্টা দেরী হয়েছে। একগ্লাস চা হাতে কাজে লেগে যাই। আছরের আগে মক্কা রওনা হবার কথা। কিন্তু প্রবাসি বাংলাদেশীদের আবেগ ঠেলে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

তায়েফের রিং রোডে

সন্ধার পর রওনা হই মক্কা আল-মুকাররমার উদ্দেশ্যে। গাড়ির চালক শামসুল ইসলাম। সাথে মুজিবুর রহমান আনসারি।

তায়েফ থেকে মক্কা যাওয়ার দুটি পথ। নতুন সমতল পথের নাম সাঈল রোড। পুরনো রিং-রোড সাগরের পিঠ থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু পর্বতের ঢাল বেয়ে চড়াই উৎরাই ঠেলে স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে ধীরে নেমেছে নীচে। এ সড়কে মক্কার দূরত্ব কম। তবে সবল চালক আর সাহসি যাত্রী ছাড়া এ পথ অন্যদের জন্য সুবিধার নয়।

শামসুল ইসলাম জানতে চান কোন্ পথ আমার পছন্দ।

আমি বলি, সাঈল সড়কে বার ক'য়েক তায়েফ হয়ে মক্কা-রিয়াদ যাতায়াত করেছি। এখন আমি পর্বতের চূড়া বেয়ে রিং রোড ধরে নামতে আগ্রহী।

তায়েফ ছাড়ার আগে শহরের শেষ মাথায় এক বাজারে গাড়ি থামান শামসুল ইসলাম। সেখানকার দোকানে বিক্রি হচ্ছে থোকা থোকা হলদে-লাল পাকা বরশুমি। হাতে মোটা

www.pathagar.com

গ্লাভস পরে ধারালো ছুরি দিয়ে শক্ত কাঁটা-বাকল সরিয়ে দোকানি এ জংলী ফল বিক্রি করছেন। বরশুমির ভেতরটা রসগোল্লার মতো নরম ও মিঠা। স্বাদ অনেকটা ড্রাগন ফলের মতো। আমরা বরশুমি কিনি।

তায়েফ-এর মিকাতে দু'রাকাত নামাজ পড়ে উমরার সফর শুরু। রিং রোডের পার্বত্য সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা পাঠ করি লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। লাব্বায়েক লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক।

বিশাল বিস্তীর্ণ পর্বতরাজীর ভেতর ক্রুর মতো পাঁক খাওয়া পথ। পাহাড়-পর্বতের গায়ে ঝুলছে অসংখ্য বানর। যেতে যেতে যাত্রীরা এদেরকে ছুঁড়ে দেন রুটি ও কলা। নানাপ্রকার খাদ্য।

গাড়ি কখনো পর্বত চূড়ায় খাড়া উঠে যাচ্ছে। আবার কখনো নেমে যাচ্ছে একেবারে নিচে।

উঁচু থেকেই প্রকৃতির বড় ছবি দেখা যায়। কোথাও বা পর্বত চূড়া থেকে দেখা যায় দীর্ঘ পথে রাতের গাড়ীর নয়নকাড়া মিছিল। তায়েফ থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোর সেতু।

শামসুল ইসলাম এ সড়ক নির্মাণের গল্প শুনান। তায়েফ-মক্কা বিস্ময়কর এই রিং রোড নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন বিন লাদেন পরিবারের এক ইঞ্জিনিয়ার। সড়ক নির্মাণ শেষে হেলিকপ্টারে সড়কের কাজ দেখার সময় পর্বতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার উড়ালযান বিধ্বস্ত হয়। সড়কের স্থপতি নিজের গড়া এই সড়কপথেই ইন্তেকাল করেন।

মধ্যরাতে কাবার টানে

মক্কায় পৌঁছে এক তুর্কি হোটেলে রুটি-কাবাব-চা-কফি খেয়ে সফরের ধকল আত্মস্থ করি। এরপর বা'ব-উস-সালাম দিয়ে মসজিদুল হারামের চত্বরে প্রবেশ করি।

মধ্য রাত। এত রাতে কাবার চত্বর কিছুটা ফাঁকা পাবো ভেবেছি। কিন্তু রবিউসসানীর গভীর রাতেও মাতাফে প্রচন্ড ভীড়। অন্তহীন মানব স্রোত কাবাকে ঘিরে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। একের পর এক নতুন স্রোত এসে যুক্ত হচ্ছে এখানে। ঢেউ এর ঢেউ। এতে কোন ছেদ নেই মুহূর্তের জন্য।

ইবরাহিম [আ.] চার হাজার বছর আগে কুবায়েস পাহাড়ে দাঁড়িয়ে জনমানবশূন্য প্রান্তরের ইথারে ইথারে প্রচার করেন এক অনন্য আহ্বান। সে ডাক শুনে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানব স্রোত আছড়ে পড়তে থাকে।

লাব্বায়েক। আমি হাজির। আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক! প্রভু হে আমি হাজির হয়েছি তোমার কাছে! হযরত ইবরাহিমের সে ডাকে সাড়া দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে এ আবর্তন।

হৃৎপিন্ডের সাথে সম্পর্ক রক্তের। কাবার সাথে দুনিয়াবাসীর তেমনি সংযোগ।

হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু। সে অনন্ত আবর্তনে শরিক হয়ে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি আর ক্ষমার মাঝে আশ্রয় খুঁজি।

www.pathagar.com

রাতের বাকি সবটুকু সময় আমার একান্ত নিজস্ব। ধীরে সুস্থে তাওয়াফ করি। তাওয়াফের মাঝে কাবার দেয়ালে বুক-মুখ-নাক-চোখ ঘষি। রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করি। হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করি। আর মুলতাজিমে হাত রাখতে চাই। তৃতীয় চক্করে সুযোগ পাই হাজরে আসওয়াদে ঠোঁট রাখার। এভাবে তাওয়াফ শেষ হয়।

মাকামে ইবরাহিম সামনে রেখে তাওয়াফ শেষের নামাজ আদায় করি। কাবার প্রভূর দরবারে সেজদানত হই। 'প্রভু হে! তুমি আমার সফর কবুল করো। আমার তাওয়াফ কবুল করো! পা থেকে মাথা পর্যন্ত শত ত্রুটি-বিচ্যুতি-অন্যায়-অপরাধ-অবাধ্যতা নিয়ে হাজির হয়েছি তোমার ঘরে! প্রভূ তুমি মাফ না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো! আমি ধ্বংস হতে চাই না। আমি চাই তোমার করুণা। আমার জীবন ও মরণ তোমার রাহে, তোমার সন্তুষ্টির পথে কবুল করো!'

মাতাফ থেকে ধীর-পায়ে সাফা পাহাড়ে যাই।

শামসুল ইসলাম ও মুজিবুর রহমান আনসারী এখন সাঈ শেষ করে ফিরছেন।

সাফা থেকে মারওয়া। মারওয়া থেকে সাফা। এভাবে সাত চক্কর। মা-হাজেরার পায়ের দাগ ধরে ছুটছে অনন্ত মানবস্রোত। আমি তাদের অনুসরন করি। আল্লাহ তুমি যাদের প্রতি রাযি হয়েছো আমাকে তাদের শামিল করো।

সাঈ শেষে চুল কেটে এহরাম থেকে মুক্ত হই। এরপর জমজমের মূল উৎসস্থলের কাছে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি।

কাবা শরীফে বার্ষিক সংস্কারের কাজ চলছে। কাবার চারপাশে সাদা বেষ্টনী। কাবার একদিকের দরোজা বরাবর বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছেন উৎসুক মানুষ।

কি আকর্ষণ ওখানে! কিছুই দেখি না। তবুও দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। আমিও ভিতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করি। এই সময়টাতে কখনো কেউ হঠাৎ কাবা ঘরের ভিতরে ঢুকার বিরল সুযোগ পেয়ে যান।

উৎসুক বহু মানুষের মাঝে আমি অপেক্ষা করি। আমার নসিবে কি সে সুযোগ আসবে?

এভাবেই তাহাজ্জুদের সময় হয়। আরেকটি ভোর আসে। জুমাবারের ভোর। কাবার ইমামের পেছনে ফজর আদায় করে একটি নতুন দিন শুরু হয়।

তিরিশে আগস্ট সকালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমাবেশ মিসফালা মহল্লায়। সেখানে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে কথা বলি। এরপর দলেবলে হারাম শরীফে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করি।

মক্কায় আজুমা

বিকালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পিকনিক। চারদিকে পাহাড়ঘেরা বিস্তীর্ণ সবুজ নুরিয়া উপত্যকা। সবুজের মাঝে রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান। তার মাঝে ইশতারাহা বা বিশ্রামকেন্দ্র। পিকনিকের জন্য এমন চমৎকার জায়গা মক্কায় আছে ভাবতেও পারিনি।

www.pathagar.com

উদ্যোক্তারা পিকনিক সম্পর্কে ধারণা দেন। এখানে আনন্দ করবো। খাওয়া দাওয়া করবো। প্রবাসে নিজ দেশের সংস্কৃতি চর্চা করবো। এ ধরনের আজুমা বা বিনোদনমূলক জমায়েতে সৌদি প্রশাসনের আপত্তি নেই।

উদ্যোক্তাদের অনুরোধে প্রায় পাঁচশ বাংলাদেশীর উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতিতে আনন্দ প্রকাশের ধরন সম্পর্কে দু'চার কথা বলে আমি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করি।

আমি বলি ঃ 'আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। আল্লাহ্ মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাদেরকে সোজা মেরুদন্ডের ওপর শির উঁচু আলিফ-এর মতো সটান বানিয়েছেন। আল্লাহর কিছু অবাধ্য লোক এই মানুষদের ঘাড়ে অন্যায় বোঝা চাপায়। ফলে আলিফের মতো সোজা মানুষগুলোর মেরুদন্ড বাঁকা হয়। পাগুলো অদৃশ্য শিকল-বেড়িতে আটকা পড়ে। সেই চাপে ও প্রতাপে সোজা 'আলিফ-মানুষ'গুলো নুব্জ-কুব্জ 'জিম-মানুষে' পরিণত হয়।'

'আমাদের সংস্কৃতির লক্ষ্য আনন্দ, স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজ। এই যে আমরা প্রবাসে কষ্ট করছি, এটা শুধু নিজের জন্য নয়। পরিবার, পরিজন, স্বজন ও সমাজ এ শ্রমের উপকারভোগী। এটা আমাদের শ্রমের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আমরা শুধু নিজের জন্য নই। প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

পিকনিকের দ্বিতীয় পর্বে খেলাধুলা। একটির পর একটি ইভেন্ট দেখতে দেখতে আমি শৈশবে ফিরে যাই। প্রবাসে অনেকের শরীরে জমে ওঠা মেদ-ভুড়ি খেলার মাঠে বাড়তি আনন্দ যোগায়।

মাগরিবের পর ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা। আমি বলি পিকনিকে এ বিষয় টেনে আনা কি ঠিক? উদ্যোক্তারা বলেন, এটা প্রবাসিদের পিকনিক। তারা এ সুযোগে ব্যাংকিং বিষয়ে কথা শুনতে বেশী আগ্রহি।

আমি মাইকের সামনে দাঁড়াই। এ নিরস পর্বও দারুণ জমে ওঠে।

এরপর গান-নাটক-কৌতুকের অনুষ্ঠান। গানে গানে শিল্পীরা কণ্ঠের চমৎকার কারুকাজ তুলে ধরেন। নাটক ও কৌতুকে সমাজের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে হাস্যরস দর্শকদের মাতিয়ে তোলে।

গভীর রাতে শামসুল ইসলামকে তায়েফের পথে বিদায় দিয়ে মোস্তফা কামালসহ নাওয়ারিয়া রওনা হই। পথে মদীনা সড়কের পাশে একটি দেয়ালঘেরা স্থানে রাসূল [সা.]-এর স্ত্রী হযরত মায়মুনার কবর। দূর থেকে হৃদয়ের চোখ দিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা [রা.]-এর কবর দেখি। মু'মিনদের মা এখানে শুয়ে আছেন।

একটি চুম্বনের জন্য প্রার্থণা

৩১ আগস্ট শনিবার জেগে ওঠি তাহাজ্জুদের আযান শুনে। মোস্তফা কামাল ও জাকিরসহ হারাম শরীফে যাই। চারদিক থেকে তখন কাবা শরীফের দিকে ছুটছে

www.pathagar.com

মানুষের স্রোত। নিয়ন বাতির আলোর নীচে ছুটছে আলোর পথের পথিকদের মিছিল। ঘর থেকে বেরোলেই এখানে এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। কাবামুখী এ এক অনন্ত মিছিল। ইবরাহিমের সন্তানদের কণ্ঠে উচ্চারণ ঃ লাব্বায়েক! আল্লাহুমা লাব্বায়েক।

তাহাজ্জুদ ও ফজরের জামাতের মাঝখানে তাওয়াফ। এরপর ফজরের আযান। ভারি কণ্ঠে তেলাওয়াত করেন কাবার ইমাম। আল হামদু লিল্লাহ উচ্চারণের সাথে সাথে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন ইমাম। নামাজের মধ্যে চারদিকে চাপা কান্না। সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহর। এ মর্মবাণী বুঝে উচ্চারণ করলে বুঝি এভাবেই আবেগের প্রকাশ ঘটে। দমফাটা কান্না বেরিয়ে আসে!

ফজরের জামাত শেষে মেসফালায় ফিরি। সকাল থেকে বহুলোক আসেন। তাদের সাথে কথা বলি। কাজ করি।

জোহরের সময় ফের আল্লাহর ঘরে যাই। সালাতের পর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না। হারাম শরীফে বসে কোরআন তেলাওয়াত করি। তেলাওয়াত করি আর কাবা শরীফের দিকে তাকাই। আবার তেলাওয়াত করি। চোখের সামনে কালো গেলাফ মোড়ানো প্রাচীন ঘর। পৃথিবীর হৃৎপিন্ড। এ ঘরের দিকে সারা জীবন তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ক্লান্ত হবে না। এখানে বসে কোরআন তেলাওয়াতের মজাই আলাদা।

এক সময় মাতাফে ভীড় পাতলা হয়। কাবার চারধারে চক্কর দেই। একবার। দুইবার। সাতবার। তাওয়াফের সময় লাইনে দাঁড়িয়ে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাই। আবেগে দু'চোখ ফেটে পানি ঝরে। আল্লাহ তুমি কবুল করো!

এই সে কালো পাথর। হযরত ইবরাহিম [আ.]-এর পবিত্র পরশধন্য। যাকে আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ [স.] নিজ হাতে চাদরে তুলেছেন। কোরেশ সরদারদের হাতে ধরা চাদর থেকে তুলে এনে এ পাথর তিনিই কাবার গায়ে স্থাপন করেছেন। এই সে কালো পাথর, গভীর মমতায় নবীজি যেখানে তাঁর মুবারক ঠোঁট রেখেছেন।

এই পাথর স্পর্শ করার জন্য প্রেমের পথের যাত্রীদের অশেষ-অন্তহীন স্রোত। সেই ভীড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়া সব সময় কষ্টকর। আজ আমি কয়েকবার হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার সুযোগ পেলাম। এ তো আমার প্রতিপালকের করুণা!

তাওয়াফ সেরে মাকামে ইবরাহিমের সামনে দুই রাকাত নামাজ আদায় করি। কাছেই একটি কালো বৃত্ত। এ বৃত্তের বরাবর নীচে জমজম কূপের মূল উৎস। কালো বৃত্তের জায়গায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করি।

এ সময় দেখা হয় ড. ইউসুফের সাথে। মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। উমরা করতে এসেছেন। দোয়া কবুলের স্থানগুলিতে তার আবেগাপ্লুত দোয়া ও মুনাজাতে করুণ রোদনভরা আকুতি দেখে আমার ভিতরটা ব্যাকুল হয়। আমি তো এমন করে কাঁদতে পারি না!

www.pathagar.com

ড. ইউসুফ-এর সাথে কাবার চত্বরে কিছু সময় কাটিয়ে মেসফালায় ফিরি। আছরের পর রাবেতার জাকিরের সাথে বেরোই মক্কার কিছু ঐতিহাসিক স্থান দেখতে।

সওর পর্বতের পাদদেশ। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আবু বকর [রা.] কে নিয়ে রাসূল [সা.] এই পর্বতের নিভৃত গুহায় ছিলেন। কোরেশ সর্দাররা তাঁকে হত্যা করার জন্য এখানে আসে। বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়। এখানে আমি এর আগে এসেছি মোস্তফা কামালের সাথে। তবু এ জায়গার স্মৃতি বারবার টানে।

সওর থেকে মুজদালিফা ও মিনা। মিনায় ইবরাহিম [আ.] ও ইসমাইল [আ.]-এর ত্যাগ ও কুরবানির কাহিনী স্মরণ করি। আল্লাহর রাহে নিজেকে এবং সবচে প্রিয় বস্তুকে কোরবানী করার শপথ করি।

সেখান থেকে আরাফার ময়দান। হযরত আদম [আ.] ও হাওয়া [আ.]-এর মিলনভূমি। পৃথিবীর মাটিতে এ প্রান্তরে তাদের প্রথম সাক্ষাত। মহা মিলনের এ ময়দানে ঘুরে ঘুরে আমরা যাই জাবালে রহমত। রহমতের পাহাড়। বিদায় হজের ভাষণের বিখ্যাত স্থান।

এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমরা দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করি। আরাফা থেকে ফিরার পথে মিনা, জামরাহ ও আকাবা ঘুরে দেখি।

এভাবে আমার দিন ও রাত কাটে মক্কায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে কাজ করি। কাবার চত্বরে হাজিরা দেই। মক্কা নগরীর বিভিন্ন মহল্লায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে কথা বলি। ইসলামী অর্থনীতি ব্যাখ্যা করি। তেজারত ও জিয়ারত এক সাথে চলে।

রাসূল [সা.] আর তার সাহাবিগণ এসব মহল্লায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আমি এক নগণ্য বান্দা এখানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কথা বলছি। ইসলামের কথা বলছি। আল্লাহ তুমি আমার এ ছোট কাজকে সেইসব বড় কাজের সাথে যুক্ত করো!

তিন সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাতে মেসফালা থেকে ষোল কিমি দূরে নূরিয়ায় সভা। টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের ইঞ্জিনিয়ার জি এম সিদ্দিকী রাত দশটায় বাসা থেকে তুলে নেন। সভাস্থলে যারা জড়ো হয়েছেন প্রায় সবাই মক্কার বালাদিয়ার কর্মী। পবিত্র ভূমি পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তাদের।

তাদের এক দল বিদায় নেয়ার পর আরেক দলের সাথে কথা বলি। তারাও মক্কা নগরী ঝেড়ে মুছে পরিচ্ছন্ন রাখেন। 'ছোট কাজ' করে তারা বড় আনন্দ আহরণ করেন।

রাত বারোটার পর ব্যবসায়ীরা জমায়েত হন। এছাড়া তাদের সময়-সুযোগ নেই।

মক্কা শরীফ আন্তর্জাতিক মিলনকেন্দ্র। এখানে কাজ করতে এসে এই বাংলাদেশীরা ব্যবসায় ঝুঁকেছেন। খুচরা ও পাইকারী সব ধরনের ব্যবসা। অনেকে ভালো করেছেন।

প্রবাসিদের ব্যবসায়ে সৌদি সরকারের বিধিনিষেধ আছে। এসবের মধ্যে দশকের পর দশক কৈ মাছের জান নিয়ে টিকে আছেন তারা।

মক্কার বাজারে অধিকাংশ খদ্দের বাইরের। হজ্জ বা ওমরা থেকে ফিরার পথে এটা-সেটা

www.pathagar.com

দেশে নেবেন। জায়নামাজ-তসবি-আতর। বোরকা-কাপড়, ঘড়ি, স্বর্ণালংকার। খেজুর, তেঁতুল কিংবা ত্বীন জাতীয় ফল। নানা দেশের বিচিত্র সম্ভার। রুশীয় তুর্কিস্তানী বা চীনা উরগুই এলাকার মুসলমানদেরও দেখা যায় নানা সওদা নিয়ে বসেছেন কোথাও। পথের ধারে। মোট কথা এ বাজার অন্য রকম।

ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকের পর রাতের শেষ যামে ঘরে ফিরি।

আমি মেসফালায় আছি। এ খবর গত ক'দিনে ছড়িয়েছে পবিত্র নগরীর সবখানে। আমার ছোট্ট আস্তানায় তাই প্রবাসিদের উপচে পড়া ভীড়।

উম্মুল জুদে এক বিকাল

চার সেপ্টেম্বর হারাম শরীফে জোহরের নামাজ পড়ে রওনা হই উম্মুল জুদ। জেদ্দাগামী পুরনো সড়ক ধরে রাবেতা আলম আল ইসলামীর সদর দফতর ডানে রেখে সৌদি বাদশাহদের কিছু পুরনো ঘরবাড়ি মাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উম্মূল জুদ।

এ পথের দু'ধারে পরিবর্তনের ছোঁয়া কম লেগেছে। চারদিকে মক্কার পুরনো ল্যান্ডস্কেপ দেখে আবেগে আপ্লুত হই। পাহাড় পর্বতের গা বেয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ি। পাহাড় বনানী ঘেরা চমৎকার শান্ত নিবিড় উম্মুল জুদ।

আজ এখানে প্রবাসি বাংলাদেশীদের পিকনিক।

বিকাল চারটায়ও মরুসূর্য প্রচন্ড উত্তপ্ত। দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্যই বিকালে পিকনিকের আয়োজন।

খেলাধুলার পর্ব শেষ হতে না হতেই পাহাড়বেষ্টিত উপত্যকার চারদিক আঁধার করে বিনা নোটিশে শুরু হয় মরুঝড়। সেই সাথে বৃষ্টি আর ঘনঘন বিদ্যুত চমক। বাতাসের প্রচন্ড দাপাদাপির সাথে মেঘের বিকট গর্জন।

সন্ধ্যার পর প্রকৃতি কিছুটা শান্ত হলে আমাকে বলা হয় ব্যাংকিং বিষয়ে বক্তৃতা করতে! আজ এ বিরূপ পরিবেশে পিকনিকের মূল আয়োজনই তো পন্ড হবার যোগাড়। এ অবস্থায় আমার আলোচনা বাদ দিতে বলি। উদ্যোক্তারা নাছোড়বান্দা। তাদের মতে, পিকনিক উপলক্ষ। আমার আলোচনা মুখ্য। আজুমা ছাড়া এতলোক এখানে মিলিত করা সম্ভব নয়।

বাতাস মাইকস্ট্যান্ড উড়িয়ে নিতে চায়। দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। এ অবস্থায় কথা বলি ঃ 'ঝড়-বৃষ্টি আর বজ্রনিনাদের মাঝে আজকের পিকনিক যথার্থ ব্যতিক্রম। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক পথ চলেছে এমনি ঝড়-তুফানের বিপদ তুচ্ছ করে। ঝড়-তুফানের পর আমাদের জীবনে সফলতার সূর্য উঠবে। ইসলামী ব্যাংক আপনাদের সাফল্যের সাথি হবে।

আলোচনা চলতে চলতে প্রকৃতি শান্ত হয়। এক বস্তা প্রশ্ন হাতে নিয়ে আন্দায করি

www.pathagar.com

আমার আলোচনা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যায়নি।

ঠান্ডা মনোরম পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাটক, একাংকিকা ও কৌতুক। মাঝে মাঝে গান। জমে ওঠে অনুষ্ঠান। ভিজা জামাকাপড় গায়ে শুকিয়ে ঝরঝরা হয়। পায়ের নীচের ভিজা কার্পেটও ওমওম হয়ে ওঠে।

রাত বারোটার পর বনভোজ। আবদুল মান্নান ভাইর 'মাতবাখ'-এ রান্না করা খাবার। ঝড়ের রাতের সে ভোজের তৃপ্তি বহুদিন মনে থাকবে।

উম্মুল জুদ থেকে আল গারাবা। হারাম শরীফের কাছে সাফা-মারওয়ার ধারে আল গারাবা মার্কেট। সেখানে একটি বিশাল ভবনের পাঁচ তলায় ব্যবসায়ী সমাবেশ। দুটি কক্ষে ঠাসাঠাসি অপেক্ষা করছেন ব্যবসায়িরা। তারা হারাম শরীফের পরশি। অধিকাংশ গাজ্জা মার্কেটের ব্যবসায়ী।

গাজ্জায় ছিল হযরত খাদিজার বাড়ি। সেখানে এখন বড় ব্যবসাকেন্দ্র।

রাত তিনটার পর বাসায় ফিরে বিছানায় পিঠ ঠেকাই। একটু পর তাহাজ্জুদের আযান শুনে দৌড়াই কালো গেলাফের আকর্ষণে।

পাঁচ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভোর হয় মিসফালায়। দুপুর পর্যন্ত প্রবাসিদের খেদমতে কাটাই।

জোহর ও আছর হারাম শরীফে আদায় করে গাজ্জা মার্কেটে বসি। গাজ্জায় নাজির আহমদ আকিক পাথর, টুপি ও তসবিহ আর কত কি বিক্রি করেন। আলাউদ্দীন স্বর্ণের ব্যবসায়ী। এ দুই দোকানে ইসলামী ব্যাংকের ফরম পাওয়া যায়। অনেকে আসেন ব্যাংকিং লেনদেন সম্পর্কে বুঝ-পরামর্শের জন্য। সৌদি আরবের সবখানে এ ধরনের অসংখ্য স্বেচ্ছাকর্মী আমার কাজ কত সহজ করেছেন!

মাগরিবের পর মক্কা নগরীর কুদাই মহল্লায় অনুষ্ঠান। জান্নাতুল মা'লা পার হয়ে নাক্কাসার পথ ধরে আবুল হাসনাতের সাথে কুদাই যাই। অনুষ্ঠানস্থলে হাজির প্রায় সকলেই বালাদিয়া কর্মী। তাদের মতো করে ব্যাংকিং আলোচনা করি। মুদ্রাস্ফীতিতে সূদের ভূমিকা ও কীনসের পূর্ণ কর্মসংস্থান তত্ত্ব তাদের কাছে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করি। অনেক পন্ডিতের চেয়ে এই অপন্ডিত স্বশিক্ষিত মানুষগুলো সহজ কথা খুব সহজে বোঝেন।

কুদাইর প্রোগ্রাম শেষ হয় রাত এগারোটায়। রওনা হই উতাইবিয়া। পথে অপেক্ষায় আছেন রুহুল আমীন।

উতাইবিয়া থেকে পথে নামি রাত তিনটায়।

তারপরও তারা ভুল বোঝেন...

ছয় সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ছুটির দিন। সকাল থেকে ভীড় মিসফালার আস্তানায়। হিসাব খোলার ফাঁকে ফাঁকে কথা শুনি। নানা প্রশ্নের জবাব দেই। অনেকেই প্রবাসে আছেন

www.pathagar.com

বছরের পর বছর। কাগজপত্রের সমস্যার কারণে কেউ কেউ দেশে যেতে পারছেন না। একবার গেলে ফিরতে পারবেন না।...তারা দেশে টাকা পাঠান নিয়মিত।

বাড়িতে টাকার দরকার। কিন্তু টাকায় সব সমস্যার সমাধান হয় না। নতুন নতুন জটিল সমস্যা সেখানে বাসা বাঁধে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা। পরিবারের ভেতর জটিল সূক্ষ্ম অবিশ্বাস। ফাটল।...

'এত কষ্ট করে স্বজনের কাছে টাকা পাঠাই! তারপরও তারা ভুল বোঝেন।'...কারো কারো এমন আক্ষেপ।

দীর্ঘদিন বিদেশ করেও অনেকে ব্যক্তিগত সঞ্চয় গড়তে পারেননি। ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায়। তাদের কথা শুনি। সাধ্যমতো প্রেসক্রিপশন দেই।

কথার ফাঁকে ঝিলিক দেয় দেশের প্রতি এই মানুষগুলোর অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা। তারা দেশের পরিস্থিতির খোঁজ রাখেন নিয়মিত। দেশের উন্নতির ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। কবে বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা সৌদি আরবের মত সুন্দর ও নিরাপদ হবে? প্রশ্ন করেন তারা।

জুমার নামাজ মসজিদুল হারামে আদায় করে কাবা শরিফের পাশে মাতাফে বসে কোরআন তেলাওয়াত করি। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেসফালায় গণ সাক্ষাতকার।

সন্ধ্যার পর শারে আল-হাজ্জ-এ অনুষ্ঠান। একটি বড় ভিলার মাঝখানে খোলা জায়গা। সেখানে চাঁদের আলো গায়ে মেখে বৈঠক। ভালো লাগে।

এশার বিরতির সময় মফিজ সাহেব আমাকে তুলে নিয়ে বসেন পাশের এক তুর্কি হোটেলে 'এই ফাঁকে পেটে কিছু দানা-পানি দিন। নইলে পরে পস্তাবেন।' চাটগাইয়া রসিক সজ্জন মফিজ সাহেবের কথা এমনই। প্রবাসিদের মঞ্চেও তিনি ভালো অভিনয় করেন।

সাত সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে কাকিয়ার আল-হালাকায় সমাবেশ। আমার সঙ্গী বাদশাহ ফয়সল হাসপাতালের আবুল হাসনাত। মক্কার নগরকেন্দ্র থেকে দূরে নাক্কাসার কাছে কাকিয়া। বহু বাংলাদেশীর ঠাঁই এখানে। তাদের একটি ভিলায় অনুষ্ঠান।

রং-বেরং কাগজ কেটে সাজানো হয়েছে ঘর। কাগজের ফুলে ফুলে আঁকা হয়েছে শুভেচ্ছা-স্বাগতম। প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা রাত জেগে কাজ করেছেন। কিছু নজরকাড়া কারুকাজ।

ছোট বেলার কথা মনে হয়। বরযাত্রী দলের জন্য কিংবা স্কুলে কোন বিশেষ দিনে এভাবে কাগজের ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি প্রাঙ্গন রাঙিয়েছি।

একজন শিল্পী তার সহকর্মীদের নিয়ে সারারাত পরিশ্রম করে ঘর সাজিয়েছেন। কিন্তু সকালে ডিউটির কারণে তিনি অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেননি। এ শিল্পীর সাথে দেখা হলো না।

www.pathagar.com

গত ক'দিনে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছে। পথে হাসনাতকে বলেছি আজ কথা কম বলবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজকের সমাবেশে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে ইসলামী ব্যাংকিং আলোচনা করি।

কাকিয়া থেকে ফিরার পথে হাসনাত বলেন, আপনার শারীরিক অবস্থা ভেবে স্লিপ দিয়ে থামাতে চেয়েছি। কিন্তু শ্রোতাদের মুগ্ধতা আর আপনার তন্ময়তা দেখে বিরত হই।

হাসনাতের দিকে তাকাই। ক'দিনের পরিচয়। আমার জন্য কেমন মায়া জন্মেছে! এমনি অসংখ্য ভাই সারা সৌদি আরবে আমাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন। এত শত স্বজন নিয়ে প্রবাসের সংসারে ভুলে থাকি দেশের ক'জন স্বজনের মুখ।

বিকালে মিসফালায় বসি। সন্ধ্যার পর নাজির ও কামালকে নিয়ে দাল্লা ক্যাম্প রওনা হই।

মক্কা শরীফের বৃহত্তম বালাদিয়া ক্যাম্প। আগে নাম ছিল মাওয়ারিদ। এই ক্যাম্প হাত বদল হয়েছে দাল্লা কোম্পানির কাছে।

দাল্লা ক্যাম্পে বাংলাদেশী শ্রমিক আছেন পাঁচ হাজারের বেশী। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা ও মিসরসহ নানান দেশের নানা রংয়ের মানুষের শ্রমের লেনদেন এই অদ্ভুত হাটে।

সৌদি আরবে দাল্লা, মাওয়ারিদ, বিন লাদেন, আমুদি প্রভৃতি বড় কোম্পানি নানা দেশ থেকে লোক সংগ্রহ করে। একেকটি কোম্পানি দেড়-দুই লাখ শ্রমিকের যোগান দিয়ে সৌদি আরবের উৎপাদন ও নির্মাণের চাকা সচল রাখে। প্রায় সত্তর লাখ প্রবাসি শ্রমিক কাজ করছেন সৌদি আরবে। তারা সৌদি আরবের নিজস্ব শ্রমশক্তির প্রায় তিনগুণ।

দাল্লা ক্যাম্পের গেটে ইকামা জমা দিয়ে ভিতরে যাই। ক্যাম্পের বিশাল মসজিদে এশার নামাজের পর সমাবেশ। মিম্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলি কয়েক হাজার বাংলাদেশীর সামনে। তাদের বলি ঃ ইসলামী ব্যাংকিং হলো শোষণ মুক্ত স্বাভাবিক সহজ লেনদেন পদ্ধতি।

আলোচনা শেষে শুরু হয় হিসাব খোলার কাজ। ফরম যা এনেছি চাহিদা তারচে কয়েক গুণ। ফরম না পেয়ে অনেকের চেহারা কান্নামাখা। শীঘ্র তাদের মাঝে ফিরে আসব। এই ওয়াদা করে বিদায় নেই।

জেদ্দা-জেদ্দা দস রিয়াল...

আট সেপ্টেম্বর রবিবার। হারামের পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সৌদি ট্যাক্সি চালকরা 'জেদ্দা দস রিয়াল জেদ্দা টেন রিয়াল' বলে চীৎকার করছেন। জেদ্দাগামী যাত্রীরা প্রায় সবাই বিদেশী। এ কারণেই 'দস রিয়াল, টেন রিয়াল, জেদ্দা-জেদ্দা' চীৎকার করে যাত্রী টানার চেষ্টা।

একটি লিমুজিনে চেপে বসি। চালক আজনবি। আমার গন্তব্য জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

www.pathagar.com

চালকের সাথে গল্প করি। তিনি বলেন, বাজারের হালত এখন বহুত খারাপ। আগে মালিকের কেরায়া ছিল দিনে একশ আশি রিয়াল। দুপুরে দুই ঘণ্টা আরাম করে মাসের শেষে সাত আট হাজার রিয়াল ফায়দা থাকতো। এখন দিন-রাত মেহনত করি। মালিককে কেরায়া দেই একশ চল্লিশ রিয়াল। তারপরও রোজগার অর্ধেকের কম।

জেদ্দা কনস্যুলেটে ভাইস কনসাল জেনারেল ড. নূরুল ইসলামের অফিসে চা খেয়ে নুঝলায় বজলুর রশীদের বাসায় যাই। বিকালে শহীদুল বারীদের ভিলায় বৈকালিক আড্ডা জমে। সন্ধায় সারওয়াত মার্কেটে চক্কর দিয়ে এশার পর জেদ্দার কল এন্ড গাইডেন্স সেন্টারে বাংলাদেশীদের সমাবেশে যোগ দেই।

নয় সেপ্টেম্বর সোমবার। সকালে কনস্যুলেট অফিসে চা খেতে খেতে কথা হয় বাংলাদেশের একটি সরকারী ব্যাংকের প্রতিনিধিসহ দূতাবাসের ক'জন কর্মকর্তার সাথে।

কনসুলার এনায়েত সাহেব বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অনেক দিনের বিতর্ক দূর করতে এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে খোলাখুলি আলোচনায় সত্য স্পষ্ট করতে হবে।

বিকালে জেদ্দার নানা জায়গায় দৌড়-ঝাপ করে কাটাই। রাতে জেদ্দার নেতৃস্থানীয় প্রবাসি বাংলাদেশীদের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে এক জমজমাট অনুষ্ঠান।

দশ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে জেদ্দা কনস্যুলেটে 'বাহাস'। বিতর্কের বিষয় ইসলামী ব্যাংকিং। দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও জেদ্দার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং কিছু শিক্ষক উপস্থিত।

শুরুতে আমি আলোচনা করি। প্রতিপক্ষ বন্ধুটি এতদিন যেসব কথা বলে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছেন, আমি সেসব প্রশ্ন নিজে তুলে একে একে সেগুলোর জবাব দেই। ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতি কিভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে আলাদা সেটা বিশ্লেষণ করি। এরপর বলি দুই পদ্ধতির বিপরীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা। একটি পদ্ধতির জন্য কিছু লোকের লোভ পূরণের জন্য। আর একটি পদ্ধতি সর্ব সাধারণের প্রয়োজন পুরণ বা কল্যাণের জন্য।

আমার আলোচনার পর শ্রোতাগণ বাহাসের অন্য পক্ষকে সরাসরি প্রশ্ন করেন তার কোন বক্তব্য আছে কিনা। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেষে বলেন, 'এ সম্পর্কে আমার আর কোন কথা নেই।'

কনস্যুলেটের প্রটোকল কর্মকর্তা নূরুল্লাহ সাহেব ঠোঁট কাটা মানুষ। তিনি বলেন, এতদিন প্রবাসি বাংলাদেশীদের কাছে ইসলামী ব্যাংক নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার জন্য তার এখন তওবা করা উচিত।

আমি নুরুল্লাহ সাহেবকে বাধা দিয়ে আমার 'প্রতিপক্ষ'কে বুকে জড়িয়ে ধরি। বলি, ইসলামী ব্যাংকিং কোন বিশেষ ব্যাংকের সম্পদ নয়। আমরা দু'জনই এখন থেকে অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করবো।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় নাজলা মহল্লায় প্রবাসি বাংলাদেশীদের সমাবেশ। জেদ্দা রেডিওর এএনএম সিরাজুল ইসলাম এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

এগারো সেপ্টেম্বর বুধবার। সারাদিন কাটে নানা ব্যস্ততায়। সন্ধ্যার পর যাই শহরের বাইরে আল আমুদী ক্যাম্পে।

এশার নামাজের পর মাইকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রচার করেন মসজিদের ইমাম সাহেব। তার আহবান ছড়িয়ে যায় ক্যাম্পের সবখানে। আমরা ক্যাম্পের বিরাট অডিটরিয়ামে মিলিত হই।

অনুষ্ঠান শেষে ক্যাম্প ঘুরে দেখি। শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবস্থা এই ক্যাম্পে চমৎকার। খেলার মাঠসহ সব ধরনের বিনোদনের আয়োজন। কর্মচারীদের থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। প্রতিটি রুমে টিভি। সাথে ডিশ এন্টেনার সংযোগ।

একজন সুপারভাইজার বলেন ঃ এখান সব কিছু ভালো। তবে মুশকিল হলো বাংলাদেশের কৃষি জমির আইল বেয়ে উঠে আসা ছেলেরা এখানে ছবির নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। কাজ থেকে এসেই টিভির সামনে বসে। টিভির পর্দার দিকে চোখ রেখেই ঘুমাতে যায়।

ক্যাম্প থেকে বেরোই রাত দু'টার দিকে। ইকামা ফেরত নিতে রিসেপশনে যাই। সেখানে ডিউটি করছে সুদানী ও মিসরী তিন যুবক। আমাদের হাতে ইকামা ফেরত দেয়ার সময়ও তাদের চোখ টিভির পর্দার দিকে। আলতাফের কথার পিঠে তারা মুখে হায়্যাকাল্লাহ, আফওয়ান, বারিকলানা ফিহ, মাআসসালামা বলছে আর টিভির পর্দায় অর্ধনগ্ন নাচ দেখছে।

আলতাফ সারা পথ আফসোস করেন এ নিয়ে।

বারো সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের জেদ্দা প্রতিনিধি জনাব রবিউল আউয়াল-এর বাসায় দাওয়াত। দু'তিন দিনে আলাপ পরিচয়। আমরা দু'জনই ১৯৬৭ সালে এসএসসি পাশ করেছি। তার ও আমার বাড়ী পাশাপাশি থানায়, কাছাকাছি গ্রামে। আমরা পাশাপাশি দু'টি হাই স্কুলে পড়েছি। তার স্কুলের সহপাঠি আলম আমাদের কমন ফ্রেন্ড।

রবিউলের স্ত্রী মনি'র বাড়িও নারায়ণগঞ্জে। কলেজে পড়েছেন ঢাকার ইডেনে। শিশুকালে পিতৃ-মাতৃহীনা হয়ে ভাইদের কাছে মানুষ।

এখানেও মিল। আমার স্ত্রী পাঁচ মাস বয়সে মা হারিয়েছেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে হারিয়েছেন বাবাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগে তিনিও ইডেনে পড়েছেন।

এভাবে কথা ও আড্ডায় মনে হয় কত দিনের জানাজানি আমাদের।

রবিউলের স্ত্রী খুব যত্ন করে আমার প্রিয় লাউপাতার ঝোল রেঁধেছেন। সেই সাথে নানা ধরনের দেশী তরকারী। ডাল রেঁধেছেন টমাটো দিয়ে একেবারে ঢাকার পুব এলাকার কায়দায়। সবশেষে খেজুর গুড়ের পায়েস।

www.pathagar.com

রাতে যাই আলোয়ান কোম্পানির ক্যাম্পে। দেড়টা পর্যন্ত সমাবেশ। চারদিকে সাড়া পড়ে ক্যাম্পে। অনেক হিসাব খোলা হয় সেখানে।

এই অল্প ক'দিনে জেদ্দার সাথে একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু মেহমানদারি তো তিনদিনের বেশী নয়!

জেদ্দা থেকে মক্কা

তের সেপ্টেম্বর শুক্রবার। জুমার নামাজের পর রওনা হই মক্কার উদ্দেশ্যে। গাড়ী চালক আলতাফ। সাথে বজলুর রশীদ।

মক্কা শরীফের ভাইরা মিসফালায় আমার জন্য কিছু কাজ জমা করে রেখেছেন। আমি বেশ কিছু হিসাব খোলার ফরমে স্বাক্ষর করি। তারপর পিকনিক স্পটের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মোস্তফা কামালের বিশেষ অনুরোধে আজকের পিকনিক অনুষ্ঠানে যোগ দিকে জেদ্দা থেকে এসেছি।

যথারীতি পিকনিক উদ্বোধন করি। নানা ধরনের খেলাধুলার এক পর্যায়ে রশি টানাটানি ঃ প্রধান অতিথি বনাম বিশেষ অতিথির দল। ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ হয়ে রশি টানেন দ্বিগুণের বেশী লোক।

জয় পরাজয়ের ফয়সালা হয়ে যায়। শ্লোগান ওঠে ঃ 'ইসলামী ব্যাংক জিন্দাবাদ'। বিশেষ অতিথি বজলুর রশীদও সে শ্লোগানে যোগ দেন।

মাগরিবের পরে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনা। রাত এগারোটায় পুরস্কার বিতরণ। গভীর রাতে আমরা ফের জেদ্দা রওনা হই।

এইখানে তোর দাদির কবর...

চৌদ্দ সেপ্টেম্বর শনিবার। রিয়াদগামী বাস ছাড়বে দশটায়।

বাসস্ট্যান্ড জেদ্দার বালাদ এলাকায়। অদূরে লোহিত সাগর তীরে রিফাইনারীর চিমনীর চূড়ায় গ্যাস পোড়ানো আগুনের জিহবা লকলক করছে। অসংখ্য ক্রেনের উঁচু চূড়া জানান দিচ্ছে এদিকটাতে সমুদ্র বন্দর।

জেদ্দার সবচে প্রাচীন এলাকা বালাদ। জনশ্রুতি মতে এখানেই মা হাওয়ার কবর। আরবরা বলেন দাদি-হাওয়া। আরবিতে দাদিকে বলা হয় জেদ্দি। জেদ্দি থেকেই জেদ্দা নামের উৎপত্তি। এটাই কীংবদন্তি।

বাসে বসে দাদি হাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে কবি জসীম উদ্দীনের 'কবর' কবিতার ক'টি লাইন মনে পড়ে ঃ *এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে/তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'।*

সব শেষে বাসে ওঠেন এক সৌদি দম্পতি। মহিলাকে সামনে আসন দিতে সামনের সারির লোকদের চালান দেয়া হয় পিছনে।

www.pathagar.com

আমার পাশে বসেছেন মাঝ বয়সি এক সৌদি। আলাপি মানুষ। কথা বলার চেষ্টা করেন। আমি জবাব দেই ইংরেজীতে। সেই সাথে দুএক শব্দ ফি-মাফি দিয়ে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা।

জেদ্দা থেকে একটানা দু'ঘণ্টা চলার পর তায়েফের কাছে পাহাড়ের কিনারায় চেকপোস্টে বাস থামে। চেকিং চলে আধ ঘণ্টা।

হাত্ব ইকামা! ইকামা দাও।

এ সময়টা অস্বস্তিকর। পকেটে কাগজপত্র সব ঠিকই আছে। তবু একটা খচখচভাব। ইকামার ব্যাপারটা এক বছরেও আমি মানিয়ে নিতে পারিনি। কে একজন রসিকতা করে বলেছেন ঃ প্যান্ট পরতে ভুলে গেলেও ইকামা ছাড়া রাস্তায় বের হওয়া চলবে না!

এ কথা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করি।

ইকামা নিয়ে অনেক গল্প আছে। স্ত্রী হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়। ঘরে শিশু বাচ্চা রেখে এক প্রবাসি রাস্তার পাশের দোকানে গেছেন দুধ কিনতে। সাথে ইকামা নেননি। পুলিশ তাকে ধরে জেলে ঢুকায়। ঘরে শিশু বাচ্চা মারা যায়। আর স্ত্রী মারা যায় হাসপাতালে।...আজনবি তার স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে পাগলপ্রায়। খুন চাপে তার মাথায়। সে এক পুলিশকে খুন করে আবার জেলে যায়।

আমাদের বাসে চেকিং করছে ছিপছিপে গড়নের এক ছেলে বয়েসি পুলিশ। ফর্সা চেহারা, উন্নত নাক। সব মিলিয়ে তাকে লাগছে চমৎকার। সুন্দর মায়াবী চেহারার এই ছেলেটির গলার স্বরও খুবই মিষ্টি। অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমার কাছ থেকে ইকামা নিয়ে নেড়ে চেড়ে ফেরত দেয়।

সব পুলিশ এমন সুন্দর আর শরীফ হলে কথাই ছিল না।

তায়েফের দিকে আরো পাঁচ কি. মি. বাকি থাকতেই জোহরের নামাজের বিরতিতে বাস থামে পাহাড়-পর্বত ঘেরা সুন্দর প্রকৃতির কোলে। সেখানে এক মসজিদে জোহর ও আছরের দুই-দুই রাকাত নামাজ আদায় করে আবার রওনা হই।

এরপর আরো অনেকক্ষণ পাহাড়-পর্বতের মাঝে পথ। কখনো রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে সামনের দিকে। কোথাও সাইন বোর্ডে লেখা ঃ সামনে বিপদজনক মোড়।

জোহরের বিরতির সময় আবিস্কার করি বাসে আরো একজন বাংলাদেশী আছেন। তার নাম আনিস। কাজ করেন রিয়াদের বাথায়। লাভলী হোটেলে। ওমরা ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা-মক্কা সফর। তারপর ক'জন বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছেন জেদ্দা। আজ রিয়াদ ফিরছেন।

বাসে কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ ছিলেন আনিস। এখন একজন বাংলাদেশী সহযাত্রী পেয়ে অনর্গল কথা বলছেন।

জেদ্দা থেকেই পার্বত্য এসকার্পমেন্টের বিস্তার শুরু। তায়েফে এসে যুক্ত হয়েছে পাহাড়

www.pathagar.com

আর গিরি কন্দরে ঘন সবুজের মেলা। জেদ্দা থেকে তায়েফ-আলবাহা-বেলজুরাইসী-কুংফুদা-আন্-নামাস হয়ে আবহা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দুর্গম পার্বত্য বেষ্টনী। ইয়েমেন অবধি। আমি নিমগ্ন চিত্তে প্রকৃতির এই পাহাড়ি সৌন্দর্য উপভোগ করি।

আমার হাতের কাছে ব্রীফকেসে ভ্রমণসঙ্গী ক'টি বই। সেই সাথে একটি ডাইরী। আসার পথে আল মাহমুদের 'ডাহুকী' আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। এখন হুমায়ুন আহমদের 'আগুনের পরশমনি'র আবেগ স্পর্শ করি।

ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার সমকালীন এই দুই জননন্দিত লেখকের বই আমার ভ্রমণ সহচর। আগে কলকাতার নিমাই, শংকর, জরাসন্ধ না হলে ভ্রমণ জমতো না। ঢাকা এখন ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যেরও রাজধানীতে পরিণত হচ্ছে।

তায়েফের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে চোখ রেখে আমি আমার শ্যামল বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কথা ভাবি। আর ভাবি অর্জিত বর্তমান গৌরবের কথা।

কিছু সময় প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালো লাগে। কিন্তু মনের অন্য অলিন্দে তখনো দুলতে থাকে স্বদেশের মায়াবী পর্দা। আমি আল মাহমুদ থেকে ফররুখ আর ফররুখ থেকে আবদুল কাদির ও জসীমউদ্দীন হয়ে নজরুলে ডুবে যাই। তারপর সিরাজী-মীর মশাররফ-কায়কোবাদ হয়ে মোহাম্মদ সগীরদের ভুবনে আবর্তিত হই।

বাণকুড়ালীর বায়

তায়েফ থেকে ধীরে ধীরে সমতলের দিকে নামি। এখন পার্বত্য আবহ ছেড়ে আমাদের বাস মরুভূমির একঘেয়ে সমতল নিস্তরঙ্গ আবহকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে থাকে। আমি বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বাংলাদেশের কোন নিবিড় আঙিনায় বিচরণ করি। আবার কখনো জানালায় চোখ গলিয়ে মরুভূমির বিস্তার দেখি।

এ পথে আমি বেশ ক'বার সফর করেছি। কখনো একা। কখনো সাথিদের নিয়ে। কিন্তু আজ মরুভূমি যেন সৌন্দর্যের নতুন দ্যোতনা নিয়ে হাজির। ক'দিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। মরুভূমির কাঁটাগাছের ঝোপেরা পানির ঝাপটা খেয়ে সবুজের শক্তি নিয়ে মাথা তুলেছে। মরুভূমির তৃণ গুল্মের এ বিস্ময়কর সক্ষমতার কথা ভেবে অবাক হই।।

আশপাশে চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য উট। সহজে খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ পেয়ে তাদের গায়ে-গতরেও যেন নতুন এক স্ফুর্তি টগবগ করছে।

একটা সাইনবোর্ডে লেখা ঃ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এলাকা।

আমরা অতিক্রম করি একটির পর একটি ওয়াদি। কোন কোন ওয়াদিতে বৃষ্টির পানি জমেছে। নাম থেকেই বোঝা যায় সৌদি জনজীবনে এসব ওয়াদির প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক।

এরি মাঝে দূরে কোথাও ধূলিঝড় বইছে। বড় একটা এলাকা জুড়ে বালিরাশি কুন্ডলী পাকিয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে ফোয়াড়ার মতো।

www.pathagar.com

ছোটবেলা এ ধরনের ধূলা-বালুর কুন্ডলী নিয়ে অনেক কান্ড ঘটেছে। গাঁয়ের মাঠের এই 'বাণকুড়ালী'র মাঝে নাকি জীন-ভুতের বাস। জীন ভূতেরা বাতাসের কুন্ডলী পাকিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়ায়। তাদের চলার পথে পড়লে বিপদ হয়। পছন্দের ছেলে-মেয়েকে জীন-পরীরা ধরে নিয়ে যায়! পছন্দ না হলে চড়-থাপ্পর মেরে ফেলে যায়।

'বাণকুড়ালী' দেখার সাথে সাথে আমরা বুকে থুথু ছিটাতাম। থুথু ছিটানো নোংরা ছেলেকে জীন-পরীরা কিছু করে না।

সৌদি আরবের কূলকিনারাহীন বিস্তীর্ণ মরুমাঠে 'বাণকুড়ালী' দেখতে দেখতে ছেলেবেলার কত কথা মনে হয়। মাঠে ঘাটে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়ানো সেসব দিন। তখনকার আমি হয়ে আজকের মরুভূমির বাণকুড়ালী দেখি। আর ভাবি, মরুভূমির জীন-পরীরা নিশ্চয়ই পল্লী বাংলার জীন পরীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী!

আমার দুই সারি সামনের আসনে এক সুদানী দম্পতি। তাদের সাথে দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ের কোলে এক-দেড় বছরের শিশু। বোনের কোলে অশান্ত শিশুটি কয়েকবার বাসের এমাথা-ওমাথা করছে। আমি তাকে গালটিপে আদর করি। হাত বাড়িয়ে দিতেই কোলে ঝাপিয়ে পড়ে। এরপর আর কোল ছাড়তে চায় না।

কিছুক্ষণ পর শিশুটি তার মায়ের কোল বেয়ে আসনের উচ্চতা গলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ইশারায় কাছে ডাকছে।

পথ চলতে চলতে সুদানী এ কালো মানিক তার ছোট দুখানি হাত দিয়ে আমার হৃদয়ের গভীরে আদরের পরশ বুলায়। মরুভূমির বাণকুড়ালী শৈশবের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নেয়। ভাষার বেড়া ঠেলে সৌদি প্রবীণের সাথে নিবিড় হই। এভাবেই জীবনের পথ চলা।

সৌদি ভদ্রলোক আরবিতে যা বলেন আমি আন্দাযে বুঝে নেই। দু'চারটা আরবী শব্দ দিয়ে আমি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাক্য বানাই। সেটাও তার বুঝতে অসুবিধা হয় না। মনের ব্যাপারটাই আসল।

ভদ্রলোক আমার কাছে জানতে চান বাংলাদেশে একটি মসজিদ বানাতে কত ব্যয় হয়। পিছন থেকে আনিস ইশারা করেন আমি যেন কম করে বলি। তাতে ভদ্রলোক উৎসাহিত হবেন।

ভদ্রলোক জানতে চান বাংলাদেশে ডিশ এন্টেনা আছে কি-না। বলি, 'আছে, তবে সৌদি আরবের মতো এতো বেশী না।'

ভদ্রলোক বলেন, ডিশ এন্টেনা সৌদি তরুণদের চরিত্র নষ্ট করছে। মুসলমানরা নিজেদের চরিত্র ও তাদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ সুরক্ষায় সতর্ক হওয়া উচিৎ।

আমি জেদ্দায় দেখা আমুদি ক্যাম্পের কথা বলি। এস কে সি এফ নামের এক পশ্চিমা কোম্পানি আগে এটি চালাতো। তারা শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য প্রতিটি রুমে ডিশ এন্টেনার সংযোগ দেয়। সে ক্যাম্প এখন সৌদিরা চালাচ্ছে। কোম্পানির হাত বদল

www.pathagar.com

হলেও পাশ্চাত্যের মানসিক উত্তরাধিকার রয়ে গেছে। শ্রমিকরা সারাদিন বাইরে পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে টিভির নব ঘুরায়। টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে কাপড় বদলায়। সেদিকে তাকিয়ে ভাত খায়। বাসনের বদলে তাদের চোখ থাকে টিভির পর্দার দিকে।

ভদ্রলোক আফসোস করেন। এই অবস্থা পাল্টানোর ক্ষমতা কার হাতে?

বারো ঘণ্টার সফর শেষে বাথা বাসস্ট্যান্ডে এক বাংলাদেশীর লিমুজিনে হারা যাই। একুশ দিন পর ঘরে ফিরে মনে হয় দেশে ফিরেছি।

রুমটা কায়সার পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রেখেছে। মায়ার এ পরশ ভালো লাগে। টুকিটাকি কাজ সেরে রিয়াদের নানা জায়গায় বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলে ঘুমাতে যাই।

ঘড়িতে রাত দুটা। কিন্তু চোখে ঘুম আসে না। অনেক দিন পর নিজ বিছানায় শুয়ে এ মুহূর্তে স্বজন-পরিজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। একুশ দিন পর ঘরে ফিরেছি। বাসায় একটা হৈ চৈ পড়ে যাওয়ার কথা। এখানে সে অভ্যর্থনা কার কাছে পাব? ■

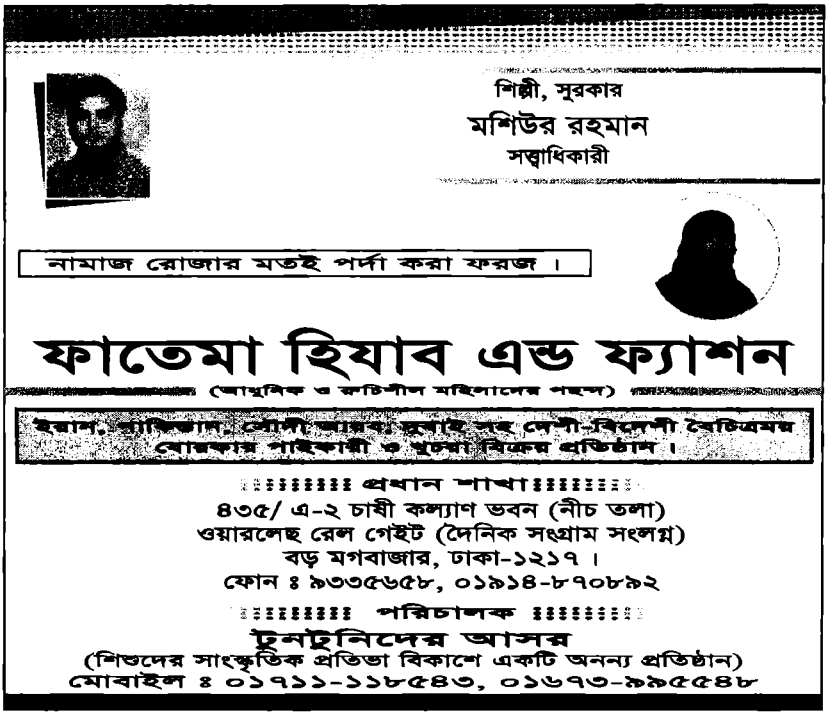

www.pathagar.com

আসিল বন্ধ-ছেদন
শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব

শফি চাকলাদার

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-মৃত্যু দিবস আবার ফিরে এসেছে। ফি বছর এই ১২ই রবিয়ল আউয়াল ফিরে আসে। যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে সমগ্র মুসলিম জাহান দিবসটি পালন করে আসছে। এবারও আমাদের মাঝে সুযোগ এসছে দিবসটিকে পালন করতে। যিনি আমাদের শিখিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, মানুষকে কি করে ভালোবাসতে হয়, প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতাকে, নারীকে কি করে শ্রদ্ধা জানাতে হয়, শিখিয়ে গেছেন–

"আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচাও প্রভু উদার
হে প্রভু শেখাও নীচতার চেয়ে নীচ পাপ নাহি আর।"

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণী প্রচারে বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গন পূর্ণ করে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

www.pathagar.com

উল্লেখিত লাইনদুটো সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করা। উল্লেখিত বাণীগুলো মনের কোনে গাঁথা থাকলে একজন মানুষ নিজেকে ভালো রাখার পথে চালাতে সক্ষম হতেই পারে। নজরুল বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পরিচিত একটি নাম। অসাধারণ অসংখ্য কিছু অবদানে নজরুল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে। সাহিত্যের আনাচে কানাচে নজরুল এই ইসলামী চেতনাকে যেভাবে ঠাঁই দিয়েছেন তাতে পাঠকবর্গ উপকৃত হয়েছেন। জনম জনম ধরে এমন উপকৃত হবেন সাহিত্য রসিকেরা। অনন্য এমন কিছু অবদানের মধ্যে নজরুল ইসলাম ধর্মকে নিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রায়শই যে বক্তব্য রেখেছেন, মন্তব্য করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন কিম্বা কাব্য-কবিতা, সঙ্গীত গেঁথেছেন যা সমাজকে করেছে উপকৃত। বিনোষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত লেখাগুলোর তুলনা শুধুমাত্র নজরুল স্বয়ং। অপূর্ব কিছু কবিতা এবং অসংখ্য অসাধারণ ইসলামী সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুল তার শ্রদ্ধেয় প্রিয় নবী [সা] কে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে গেঁথে রেখেছেন। যা প্রতিবার এই প্রিয় নবী [সা] এর জন্ম-মৃত্যু দিবসে তো বটেই বছরের অন্যান্য দিনগুলোয় পাঠকবর্গ পাঠ করে প্রিয় নবী [সা] কে স্মরণ করে থাকেন। নাত-এ রাসূলগুলো অমর হয়ে রবে চিরকাল। প্রিয় নবী [সা] এর প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখতে নজরুল মরু ভাস্কর নামে নবী-জীবনী রচনা শুরু করেন। এই জীবনী গ্রন্থ সম্পূর্ণ নয়, বিবি খদিজা পর্যন্তই কবি রচে যেতে পেরেছেন। চারটি ভাগে গ্রন্থটির পূর্ণতা বলা যায় এই অসম্পূর্ণ নবী [সা] জীবনীটিতে। প্রথম সর্গতে রয়েছে সাতটি কবিতা, দ্বিতীয় সর্গে চারটি কবিতা, তৃতীয় সর্গে দুইটি কবিতা এবং চতুর্থ সর্গে রয়েছে পাঁচটি কবিতা–সর্বমোট আঠারটি কবিতা। উল্লেখ করতে হয় নবী কারীম [সা] কে শ্রদ্ধা জানানোতে নজরুল যা লিখে গেছেন তা যেন সকল উন্মতেরই মনের কথা–যেন নজরুলই তা বলে গেলেন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে। 'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থের স্বপ্ন এমনি একটি কবিতা। আশি লাইনে সমৃদ্ধ। শুধু আমার কাছেই নয় সকলের কাছেই অসামান্য লাগবে কবিতাটি। এর বর্ণনা, এর ছন্দ, এর শব্দ চয়ন গাঁথা ইত্যাদিতে অসাধারণতার স্বাক্ষর রয়েছে–এখানে কটা বর্ণিল লাইন তুলে দিচ্ছি–যা পড়লে বুঝা যাবে নবী কারীম [সা] কে নিয়ে নজরুলের বর্ণনা-শক্তি কতটা কাব্য মিশ্রিত অসাধারণ–

"মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবি"
গাহিতে নান্দীগো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্ব-কবি।
আমিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব
পসিল অন্ধ-গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল বন্যাধারায় দজলা ফোরাত কন্যা মরুর,
সাহারায় নৌবতেরি বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা-ছুঁড়ে অশ্ব-ছেড়ে
খেলিছে গেন্ডুয়া-খেল রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেড়ে।
আরবের কুব্জা বঁধু উট ছেড়ে পথ সবজী-ক্ষেতী

www.pathagar.com

খুঁজিছে আজকে ঈদে খোর্মা আঙুর খেজুর-মোতি।
খর্জুর কন্টকে আজ বন্ধ খুলি যুক্ত বেনীর
ঢালিছে মুক্ত কেশী আরবি-নির্ঝর কলসি-পানির।
জরিদার নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাগরা ঘিরা
বেদুইন বৌরা নাচে মৌ-টুসকীর মৌমাছিরা।

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্ব শক্তিমান আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে যে দিক নির্দেশনা পেলেন তা দিয়ে তিনি আইয়ামে জাহিলিয়াহ থেকে আরব-ভূমিকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন তা কি শুধু আরব ভূমিই রক্ষা পেয়েছে? মোটেও নয়। আজ সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। নারীকে মুক্তি দিয়েছেন, সম্মান জনক স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন নারীকে সুন্দর জীবন যাপনের। নিষ্ঠার সাথে তিনি সমগ্র আরব জাহানকে আলোকিত করেছেন। পৌত্তলিক তাকে চিরতরে বিসর্জন করেছেন। অসংখ্য বাণী দিয়েছেন মানব জাতির কল্যাণে। গনতন্ত্র থেকে শুরু করে খাওয়া-পরা, কি নেই যা তিনি শিখিয়ে যাননি। নজরুল সে সব আহরণ করে আমাদের মাঝে দিয়ে আছেন ছড়িয়ে। অথচ আজ আমরা পিছিয়ে কেন? নজরুলের এই কাব্য-গীতিটি সেই কথাই ক্ষোভে উচ্চারণ করেন–

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা কর হজরত।
মোরা ভূলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমারি দেখানো পথ ॥
বিলাস বিহঙ্গ দলিয়াড় পায় মুসলিম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা-নবাব কভু,
এই ধরনীর ধন-সম্ভার, সকলেরই তাহে সম অধিকার;
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে সমান পুত্র-বৎ ॥
প্রভু তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে,
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন ধর্মীর পূজা-মন্দির, ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
প্রভু আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাক পর-মত ॥
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি;
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা, সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

হযরত খাদিজাকে নিয়ে বিয়েল প্রসঙ্গকে নজরুল মরু-ভাস্কর গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে শাদী মোবারক শিরোনামে একটি গজল গান বাঁধেন। সুন্দর বর্ণনা আর যথার্থ শব্দ-চয়নে নীতি কবিতাটিকে নবী করিম [সা] –এর সাথে বিয়ের বর্ণনা সহ সুন্দর কিছু দৃশ্যের অবতারণা করেছে। কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি পাঠকবর্গ যা পড়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন–

www.pathagar.com

মোদের নবী আল-আরবি/সাজল নওশার নওল সাজে;
সে রূপ হেরি নীল নভেরই/কোলে রবি লুকায় লাজে ॥

এমন সময় এল আহমদ তরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরী যুবক তখন নবী আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ কুলের নয়ন-মনি ॥

প্রথম সর্গে অভ্যুদয় কবিতায় নবী কারীম [সা] আগমনের সময় আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে–

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মত
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?

আইয়ামে জাহেলিয়াহ ক্ষত আরব জাহানে যখন মহামানব [সা] এর আগমন ধ্বনিত হল, তখন এমন আশাইতো হবার কথা–পরভৃ কবিতার শেষ দুটো লাইন যেন সে কথাই বলে দেয়–

তরুণ অরুণ আমিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর ফুটুক নতুন দিনের নতুন কোল।

নবীকরিম [সা] যে বাণী দিয়ে ইসলাম ধর্মকে সজ্জিত করলেন সেই বাণীগুলোর সমাহার নজরুল একটি সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। ধ্বনিত হয়েছে সেই সঙ্গীত নবী করিম [সা] এর উম্মতদের মুখে মুখে। সাত হয়েছে সকলে [সা] এর সেই মহান বাণী মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে আরো হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করেছে এমন রচনাগুলোর মাধ্যমে। এই গানটি কি তেমনি বিশালতা বহন করে না?–

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা সেই যে জাতি,
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি খ্যাতি ॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি-ধরা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি ॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক ইসলাম
সত্যে সে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমীর ফকিরে ভেদ নাই-সবে ভাই সব একসাথী ॥

www.pathagar.com

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আশার ভাতি ॥

আমাদের প্রিয় নবী [সা] এর জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আরো ২টি কবিতা রয়েছে। ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম" আবির্ভাব এবং বিরোভাব। নজরুলের এই দুটি কবিতায়ও তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব মহামানব নবী করিম [সা] এর প্রতি তাঁর কত যে অকৃত্রিম ভালোবাসা-শ্রদ্ধা কাজ করত তা প্রতিটি শব্দ চয়নে অনুভব হয়। আবির্ভাব পর্বতে পাঁচটি স্তবক রয়েছে, এর প্রথম চার স্তবক ১৬ লাইন করে পঞ্চমটি ১৮লাইনের মোট ৮২ লাইনে গাঁথা এই অমূল্য কবিতাটি। তিরোভাব এও রয়েছে ৭টি স্তবক। এর প্রথম ৬টিতে ১০ লাইন করে ৬০লাইন এবং সপ্তম স্তবকের ১২ লাইন নিয়ে মোট ৭২ লাইনের। দুটো পর্ব থেকেই দুটো স্তবক তুলে দিচ্ছি। আরবি ফারসি শব্দ যুক্ত লাইনগুলো কখনোই কারো বুঝতে অসুবিধে হয় না। কবিতার গতিতে ছন্দের সান্দন বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। নবী করিম [সা] এর প্রতি নজরুলের কত যে গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি জড় হয়েছিল তার সবই অকৃপন ভাবে দিয়ে গেছেন এই ৮২+৭২=১৫৪ লাইনের প্রতিটি ছন্দ-মাধুর্যে-আবির্ভাব পর্ব থেকে চতুর্থ স্তবকটি এরকম–

জঞ জাল
কঙ কাল
ভেদি–ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি–মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার।
বেদী–পঞ্জার রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার।
শঙ্কারে করি লঙ্কার পার কার ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা–নন্দেরে সব টুটেছে অহংকার!
মর– মর্মরে
নর– ধর্মরে
বড়– কর্মরে দিল ঈমানের জোর কর্মরে,
ভর– দিল জান–পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্স্যরে!
রণে– তাইত বিশ্ব–বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ–
ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয় সরওয়ারে কায়েনাত।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' কবিতাটির তিরোভাব' থেকে পঞ্চম স্তবকটির উদ্ধৃতি করছি–

www.pathagar.com

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে?
মুয়াজ্জিনের হোশ নাই, নাই জোশ চিতে শেষ হৃদে।
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে
নাড়ি ছেঁড়া একি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যোপে ব্যোপে।
উসমানে আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজিরে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আজ ভোতা সে দুধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার।
আহা রসূল-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
কোথা বাবাজান! বলি মাথা কুটে কুটে এলো কেশে নাহি বাঁধে।

শেষ করছি এই বলে যে নবী কারিম [সা] এর জন্ম -মৃত্যু দিবস প্রতি বছরই আসছে-আসবে। কিন্তু তাঁর এই মহান বাণীগুলোকে বর্তমান প্রজন্মদের নিকট ঠিকভাবে পৌছাতে পারছে কিনা–সে দায়িত্বও সমাজের গুরুজনদেরই পালন করে যেতে হবে। যুগে যুগে কবি-পণ্ডিত-মৌলভীরা নবী করিম [সা]-এর বাণীগুলো যেমন পৌছে দিতে নিজেরা কলম ধরেছিলেন বর্তমানেও এ দায়িত্ব আরো নিষ্ঠার সাথে করতে আহ্বান জানাতে হবে। নজরুল ফররুখ গোলাম মোস্তফা, আশরাফ আলী খান, আকরাম খাঁ সাহেব এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও নজরুল ছিলেন নবী [সা] প্রশংসায় সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সিপাহসালার। বর্তমানের প্রজন্মর কাছে নবী করিম [সা] এর জীবনী বেশি করে প্রচার হোক তবেই আমাদের এই জাতি সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে পারবে–ইনশাল্লাহ। ■

www.pathagar.com

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী [সা]

মুকুল চৌধুরী

জীবনবিধান হিসাবে ইসলামের পরিধি ব্যাপক ও সর্বব্যাপী। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক নেই যার নির্দেশনা এর মধ্যে উপস্থিত নেই। স্থান-কাল ও পাত্রের পরিধিতেও এ আদর্শ সর্বকালীন, সার্বজনীন ও সর্বসময়ের জন্য পরিব্যাপ্ত। সাদা-কালো, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আরবী-আজমী–সকলের জীবন পরিচালনার সার্বিক দিক-নির্দেশনায় ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত এ জীবনবিধান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিমোহিত সৌরভ ছড়ানো। কি পারিবারিক জীভন, কি সামাজিক জীবন; কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি আইন, কি দর্শন, কি সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের মহাতরঙ্গের অণুতে–পরমাণুতে, জীবনের সার্বিক কলনাদে এ আদর্শ সর্বপ-াবী। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য এ এক অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য জীবন-আদর্শ।

www.pathagar.com

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মতো সাহিত্য–সংস্কৃতিও এক অপরিহার্য বিষয়। সাহিত্য মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের শুভবুদ্ধির উজ্জীবনী শক্তি। সুস্বপ্নের বাতায়ন। জীবন চলার পথের সতর্ক সার্চ-লাইট। মানুষের হাসি–কান্না, সুখ-দু:খ, আশা-নিরাশা, অভাব-অভিযোগ, স্বপ্ন ও বাস্তবতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীল প্রতিফলন। সাহিত্যিকের কাজ মানুষের সুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা। মানব-মনকে কল্যাণের দিকে উদ্দীপ্ত করা; মানব-মনে উদ্দীপনার আবহ তৈরী করা এবং মানুষের জাগতিক জীবনের নানা বিপদসঙ্কুল ও নৈরাশ্যের পর্যায়ে হতাশার কালো মেঘের পর্দা সরিয়ে অনুপ্রেরণার সফেদ মনোহারিত্ব সৃষ্টি করে মানুষকে তার স্বমহিমায় আত্মশক্তিতে বলীয়ান করা। সাহিত্য মানে কল।পলোকের বিস্তার বা সম্মোহনের স্বপ্নজাল নয়। যে সাহিত্য তার সম্মোহনী জালে আত্মবিলীনতার বীজ রোপন করে সে সাহিত্য সৎ ও প্রকৃত সাহিত্য নয়।

সাহিত্য মানব-জীবনের অধীন। মানুষের জীবন-চক্রের উর্ধ্বের কোন বিষয় নয়। তাই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক হতাশা ও অবক্ষয় থেকে মানব সম্প্রদায়কে রক্ষাকলে।প সমাজের আরও অনেকের চেয়ে সাহিত্যিকের দায়িত্ব অনেক বেশী। এ দায়িত্ব ব্যক্তিক পর্যায় থেকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। একজন সৎ সাহিত্যিক তাঁর পরিমার্জিত ও পরিশীলিত সাহিত্য দ্বারা মানব-জাতিতে আলোকবর্ষিকা প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সহজাত ফিতরাত বা প্রকৃতিতে যেসব যোগ্যতা আমানত রেখেছেন; মানুষকে অনুগ্রহ করে যে বিশেষ বিশেষ নিয়ামত বা কল্যাণ দান করেছেন–বুদ্ধিবৃত্তি বা সৃজনশীলতা তার মধ্যে অন্যতম। যাকে এ অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, তিনি এর সদ্ব্যবহার করবেন। এ হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। ব্যক্তির জীবনে পথ নির্দেশনা প্রদান, জাথীয়-জীবনকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করা এবং বৈশ্বিক জীবনকে সদগুণাবলী দিয়ে চূড়ান্ত উৎকর্ষের লক্ষ্যে বিকশিত ও পরিপূর্ণ করার মধ্যেই এই সাফল্য নিহিত।

সংস্কৃতি তো জীবনের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও অতলস্পর্শী। শোভমানতা ও ঔদার্যে বির্ভষিত। জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি। মানুষ কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা]–এর নির্দেশিত পথে জীবনে সাফল্য অর্জন করবে, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য 'ইনসানে কামিল' হওয়ার পথে অগ্রসর হবে–সংস্কৃতি সেই পথ-নির্দেশক ব্যারোমিটার। এক কথায় : সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের পাথেয়। দীন ও দুনিয়ার মহত্তম সমন্বয়। এর ব্যাপকতাও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। যিনি যতো বেশি সংস্কৃতিবান, তিনি ততোই পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও সফল মানুষ। জীবন ও জগতের কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতায় জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য সংস্কৃতির পরিশুদ্ধ ও স্বচ্চ, সত্য ও সৎ, শৃঙ্খলা ও শুদ্ধতার ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়। সংস্কৃতির এ অপরিহার্যতা মানব ইতিহাসের কোন কালে, কোন সময়ে বা কোন জনপদেই উপক্ষোর বিষয় নয়।

www.pathagar.com

মানব জাতির মধ্যে পরম বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মানুষ হচ্ছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ [সা]। তিনি ছিলেন এক নয়া সংস্কৃতির নির্মাতা। শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার এক দুর্লভ মহিমায় বির্ভষিত।

অথচ তাঁর সমাজ ও সময়, তাঁর যুগ ও প্রতিবেশ ছিল পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। হযরত ঈসা [আ]–কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর থেকে তাঁর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘদিনব্যাপী মানব–সমাজ নিষ্পিষ্ট ছিল পঙ্কিলতা, নির্মমতা, অস্বচ্ছতা, অসততা, অসাধুতা, পৌত্তলিকতা ও পেশীশক্তিমত্ততার এক অসহনীয় অনাচার ও দুর্বৃত্তপরায়ণতায়। এ যুগ–সন্ধিক্ষণে তাঁর আগমন ঘটে। সমগ্র মানব-ম লীর কল্যাণকামী হয়ে তিনি যখন দীন প্রচারে লিপ্ত, শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি ছিলেন অবিচল ও সুদৃঢ়। অথচ তাঁর কোন শিক্ষক ছিলেন না। তিনি জাগতিক কোন পাঠও গ্রহণ করেননি। নবুয়তের আগে প্রকৃতিই ছিল তাঁর শিক্ষক। তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর ঔদার্য, তাঁর বিবেচনাবোধ তাঁর সময় ও পরিবেশ থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। সেই সামজের সম্মানিত ও মর্যাদাবান পুরুষ হিসাবে, পরিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে দুর্লভ সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। ভাষার শুদ্ধতা, সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতা ও মানবিক ঔজ্জ্বল্যে তিনি ছিলেন এক মহিমান্বিত মানুষ।

নবুয়ত লাভের পর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি এক প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী, সুবিবেচক, ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনের কোন কালিমাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। পৃথিবীর অগ্নিকু থেকে তাঁর মতো এমন অক্ষত অবস্থায় বের হতে পারা জীবন মানব–ইতিহাসে বিরল।

মহান ঐতিহ্যের এই মানব–সন্তান জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়ে গেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির মতো জীবনবোধে নিবিষ্ট, জীবনের অন্তগুঢ় বোধে প্রতিবিম্বিত, জীবন ও জগতের সাফল্যের পরিচায়ক, মানুষের সহজাত ও আত্মলগ্ন জীবনাচরণের সমন্বয়ক উপাদান দু'টিও তাঁর স্পর্শে পল্লবিত হয়েছে।

তিনি গর্ব করে বলতেন, "আনা আফসাহুল আরব–ইন্নি মিন কুরাইশিন অ-ইন্নি নাশা'তু ফি বানি সা'আদ ইবন বকর।" আমি শুদ্ধতম আরব, কেননা কুরায়শদের ভেতর আমার জন্ম। কিন্তু আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি সা'আদ বিন বকর গোত্রে।' তাঁর যুগও ছিল কবিতার ছন্দ ও উপমা, শব্দ ও উ।প্রেক্ষা, বাণী ও রূপকল্পে প-াবিত। আরবদের জীবন ও জীবিকা, স্বপ্ন ও বাস্তবতা, আশা ও আনন্দ, শত্রুতা ও মিত্রতার বাহন ছিলো কবিতা। কবিতা বহুল প্রচলিত ও চর্চিত একটি বিষয় ছিল। আরবের মানুষের মন ও মনন, আরবের পথ ও প্রান্তর কবি ও কবিতার দ্বারা মেঘমালার মতো আবৃত ছিল।

সেই কাব্য-প-াবী সমাজের একজন প্রাগ্রসর ও শুদ্ধভাষী মানুষ হয়েও রাসূলুল্লাহ [সা] নবুয়তের আগে কোন কবিতার আসরে যোগ দেননি। যে দু'একবার যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছেন, অলৌকিকভাবে পথিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন বা অন্যভাবে ফিরে এসেছেন।

www.pathagar.com

তারপরও যখন তাঁর উপর নবুয়তের আসমানী গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো তখন তাঁকে বলা হলো কবি এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব–আল-কুরআনকে বলা হলো কবিতা।

আল-কুরআনই এর প্রতিবাদে সোচ্চার হলো। বলা হলো, "আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।" [সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৬৯]

এরপরও ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমা প্রচারে আরও অনেক কিছুর মতোই কাফের–মুশরিকরা কবি ও কবিতাকে ব্যবহার শুরু করলো। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা, দিরার ইবনুল খাত্তাব, 'আমর ইবনুল আস, আবূ আযযা আল জুমাহী, আল হারিছ ইবন হিশাম, হুবায়রা ইবন ওয়াহাব আল-মাখযুমী, মুসাফি ইবন আবদ মানাফ, আবু উসামা মুআবিয়া ইবন যুহায়র, কাব ইবন আশরাফ প্রমুখ কবি যখন ইসলামের বিরোধিতায় কবিতা নিয়ে সর্বশক্তিতে নিয়োজিত, তখন কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামের নীতি-নির্ধারণী দিক-নির্দেশনা জারি হলো। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হলো, "আর কবিরা, তাদের অনুসরণ করে তা, যা তারা করে না। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবংস্মরণ করেছে আল্লাহকে বারবার, আর প্রতিকার করেছে অত্যাচারিত হওয়ার পর। শিগগিরই জানবে যারা জুলুম করেছে, কোন্ জায়গায় তারা ফিরে যাবে।" [সূরা শু'আরা : আয়াত ২২৪-২২৭]

কুরআনুল করীমের এ আয়াতে কবি ও কবিতা তথা সাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুরআনের বাচনভঙ্গি, ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কারণে নব–দীক্ষিত মুসলিম–কবিদের কাছে হঠাৎ ম্লান হয়ে যাওয়া কবিতা আবার নব-জীবন লাভ করে। এর সাথে যোগ হয় রাসূলুল্লাহ [সা] এর উৎসাহ ও উদ্দীপনা। তাঁর লালন ও পরিশোধন, তাঁর মমত্ব ও ভালোবাসা, তাঁর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। নবুয়তী দায়িত্ পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহাবী–কবিদের কবিতা সম্পর্কে খোঁজ–খবর নিতেন। তাঁদের কবিতা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁদের কবিতার শুদ্ধতার প্রতি নজর রাখতেন। তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কৃত করতেন। সমসাময়িক কবিদের কবিতা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মন্তব্য করতেন। মহানবী [সা] এর এসব কথার সারমর্ম ছিলো শিল্পকলা তথা সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং জীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

এভাবে ইসলামের গৃহাঙ্গনে কবি ও কবিতা স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য প্রচার, কাফের–মুশরিকদের সমুচিত জবাব প্রদান, নও–মুসলিমদের আত্মত্যাগ ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান করার ক্ষেত্রে সাহাবী–কবিদের কবিতা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সাহাবী–কবি হযরত হাস্সান বিন সাবিত [রা], হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা [রা], হযরত কাব বিন মালিক [রা] এবং হযরত লবীদ বিন রাহিয়াহ [রা] প্রমুখ।

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেও তাঁদের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেন। তাঁর সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন, স্নেহসিক্ত ও দয়ার্দ্র হৃদয়: মানুষের ও মানবতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ও অভাবনীয় ভালোবাসা সাহাবী কবিবৃন্দকেও বিমুগ্ধ করে। তাঁরা কবিতার ভাষায় তাঁর জীবনের নানা দিক উচ্চকিত করে তোলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ ধারা আরও বিকশিত হয় এবং আরবের সীমানা ছাড়িয়ে দুনিয়ার সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল-প্রশস্ত বা রাসূলের শানে কবিতা–নামক এই সমুজ্জ্বল ধারা আজ পৃথিবীর সকল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

পৃথিবীতে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র মানুষ, যাঁকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিরা মুখরিত হয়েছেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী, ইংরেজি, জার্মানী, ফরাসী, মালয়, উর্দু, হিন্দী, বাংলা–পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব ভাষার সব কিবর অনুভূতিতে একই সুর : 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার সত্তা যেন তোমায় উৎসর্গিত হয়।' এই আবেগ ও ভালোবাসা শুধু কবিতায় নয় নাটক, গল্প, উপন্যাস-সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাকে আলোড়িত করেছে, আলোকিত করেছে। তাঁর নামের জাদুস্পর্শে অনেক ভাষার গতি পাল্টে গেছে। সমৃদ্ধ হয়েছে সেই ভাষার গাঁথুনি। পরিপুষ্টি পেয়েছে এর অন্তঃসত্তা। বিকশিত হয়েছে ভাব। সমৃদ্ধ হয়েছে শব্দভা ার। সম্প্রসারিত হয়েছে আবেগ ও উদ্দীপনা, সম্মোহনী শক্তি ও উজ্জীবনী প্রভা। সাহিত্যের সৌন্দর্যের সাথে জীবনের সৌন্দর্যকে একান্ত করে দিয়েছে। ■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] যুগে কাব্যচর্চা

মুস্তাফা মনজুর

এক.

সাহিত্যের একটি প্রাচীনতম শাখা বা অধ্যায় কবিতা। এর উৎপত্তির সময়কাল নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার। আজও কোন গবেষক সঠিকভাবে কবিতা রচনার প্রাথমিক কাল নির্ণয় করতে সক্ষম হননি। ধারণা করা হয় প্রাথমিকভাবে কবিতাই মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। পয়ার বলি আর শের বলি– যাই বলি না কেন সেটাই ছিলো উচ্চারিত প্রথম পঙ্‌ক্তি। এ জন্যই কবিতাকে বলা হয় মৌলিক। সাহিত্যের মধ্যে কবিতাই একমাত্র শক্তিশালী মাধ্যম। সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বস্তরে কবিতাই কেবল উচ্চারিত হয়ে আসছে। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কবিতাই কেবল সদা চলিষ্ণু। আবহমান কাল থেকে এভাবেই কবিতা বহমান এবং চলমান। মানুষের মুখে তাই আজও ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয় বেদনা-বিষাদে কেবল কবিতাই। কবিতা অমর, অজেয় ও অন্তহীন কালের সাক্ষী।

কবিতা বহু রকমের হতে পারে। হতে পারে বহু ধারার। আদি ও প্রাচীনকালের কবিতা অতিক্রান্ত হয়েছে। অতিক্রান্ত হয়েছে মধ্যযুগের কবিতাও। এসেছে আধুনিককাল। আধুনিক কালে এবং আগেও কবিতা বহু ধারায় বিন্যস্ত ছিলো। এর মধ্যে একটি ধারা হলো ইসলামী ধারা। আজকের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাই।

www.pathagar.com

আধুনিক কালে ইসলামী সাহিত্য কথাটি বেশ জোরেশোরে সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এ সাহিত্যের উৎপত্তি সাম্প্রতিককালে নয়। আবার অতি প্রাচীনকালেও নয়। বরং মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সাথে এর চলা শুরু। তারপর ইসলামী দাওয়াতের সাথে তার নতুন আবাসভূমি মদিনায় গেছে। ইসলামী দাওয়াতের সাথে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরবভূমি পেরিয়ে পারস্য ও স্পেনে পৌঁছেছে। এই ভ্রমণে সে ইসলামী দাওয়াতের উজ্জ্বল দিনসমূহ এবং তমসাচ্ছন্ন রাতগুলোতে তার সাথে অতিবাহিত করেছে। এ সময় সে ইসলামী দাওয়াতের গৌরবময় কর্মকাণ্ড ধারণ করেছে, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যূহ রচনা করেছে এবং তার চারণভূমি সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছে।

এ হচ্ছে সেই সব সাহিত্যকর্ম যা কবি ও সাহিত্যিকগণ ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, তার মৌলনীতি শক্তিশালীকরণ এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বলেছেন বা সৃষ্টি করেছেন।

আমরা জানি মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবে ইসলামী সাহিত্যের সূচনাও সেখানে হয়েছে। ধরে নেয়া যায় হেরাগুহায় প্রথম অহি নাজিলের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা সংবলিত রাসূলুল্লাহর [সা] হাদিসটি, যাকে 'হাদিসুল গার' বলা হয়, সেটাকেই ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তেমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে রাসূল [সা] তাঁর গোত্রের নিকটজনদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে প্রথম যে ভাষণ দেন সেটিও ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনার মধ্যে পড়ে। মক্কায় রাসূলুল্লাহর [সা] ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তৎকালীন আরবি সাহিত্যের অন্যতম শাখা খুতবার [বক্তৃতা-ভাষণ] সাহায্য নেন। তখনও তিনি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা কবিতার সাহায্য পাননি।

মক্কার শক্তিশালী জাহেলি কবিরা তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে গেলেও তখনও পর্যন্ত কোন মুসলিম কবি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আরবি কবিতার ইতিহাস সে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। ইমরুল কায়েসের নাম বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তাঁর কবিখ্যাতি সর্বজনবিদিত। 'সাবায়া মুয়ালাকা'র কথাও আজ পর্যন্ত আমরা ভুলতে পারিনি। জাহেলি যুগে যেসব কবিতা রচিত হয়েছে তার কথাও ভোলার নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে সবই জ্বল জ্বল করছে।

রাসূল [সা] নবুওয়তপ্রাপ্ত হলেন। শুরু হলো আলোকিত যুগের সূচনা। এ সময়ে জাহেলি যুগের কবিরা রাসূলকে [সা]নানাভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক কবিতা রচনার মাধ্যমে উৎপীড়িত করা শুরু করলো। সে সকল কবিতা ছিলো তরবারির ধারের চেয়েও তীক্ষ্ণ। তাদের কবিতায় রাসূল [সা]আহত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কিন্তু সেইভাবে জবাব দেবার মতো তখনও তিনি কোনো কবিকে পাননি।

এক সময় রাসূলুল্লাহ [সা]মদিনায় গেলেন। এ সময়ে ইসলামী দাওয়াতের জন্য তিনি কবিদের সেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। কবিদের প্রতি তাদের কাব্য প্রতিভা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করার আহবান জানালেন। দ্রুত যাঁরা এই আহবানে সাড়া দিলেন তারা ছিলেন মাত্র তিনজন। তাঁদের নেতা ছিলেন কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত [রা]।

www.pathagar.com

হযরত হাস্‌সানের নেতৃত্বে সেদিন একদল কবি মক্কার কবিদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই দলটির কয়েকজন হলেন, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কাব ইবন মালিক, আলি ইবন আবি তালিব, সুওয়ায়েদ ইবন আস-সামিত, সারমা ইবন আনাস, আবু সারমা ইবন কায়স, খুবায়ছ ইবন আদী ইবন আবদুল্লাহ, আমর ইবন আল-জামুহ, আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির, নাবিগা আল জাদি, আন-নামির ইবন তাওলাব, খানসা ও আরও অনেকে। সেদিন তাঁরা ইসলামের সেবায় এক অসামান্য অবদান রাখেন। পালন করেন এক দুঃসাহসী ভূমিকা।

ভাবা যায়, স্বয়ং রাসূলের [সা] নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় একদল সাহাবী কবি ইসলামের খেদমতে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং রেখে গেলেন এক স্বর্ণ যুগ! যা আজকের দিনেও মডেল হিসেবে আমাদের সমাজে গৃহীত হতে পারে, এবং হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বটে।

মদিনাকেন্দ্রিক ইসলামী সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়, তা ইসলামী দাওয়াতের সাথে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের কবি-সাহিত্যিকরা তাদের প্রতিভাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এভাবে ইসলামী সাহিত্যও আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইসলামের অব্যবহিত-পূর্ব আরবের ভাষা ও সাহিত্যের দারুণ উন্নতি ঘটেছিল। তখন লিখিত গদ্য না থাকলেও মৌখিক গদ্য : বক্তৃতা-ভাষণ ও গল্প-কাহিনীর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সেকালের অসংখ্য বাগ্মী মানুষের নাম ও তাদের বক্তৃতা আরবি সাহিত্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দেখা যায়। আর জাহিলি আরবদের কাব্যচর্চার খ্যাতি তো বিশ্বব্যাপী। মোট কথা ভাষা-সাহিত্যের সমঝদার অসংখ্য লোকের জন্ম তখন আরবে হয়েছিল। তা না হলে আল-কুরআনের মতো এমন উন্নত ভাব ও ভাষাশৈলীর গ্রন্থ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হতো না।

আরবি ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের অনেকে জাহিলি যুগেও খ্যাতিমান কবি ও বাগ্মী ছিলেন। যেমন : কাব ইবন যুহায়র, হাস্‌সান ইবন ছাবিত, লাবিদ ইবন রাবিআ [রা] প্রমুখ। ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা দীর্ঘ দিন সাহিত্য চর্চা করেছেন। আবার অনেকের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর। তাঁদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবি ভাষায় তখন ইসলামী সাহিত্য এক শক্তিশালী জোয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

ভাবতেও অবাক লাগে, রাসূলুল্লাহর [সা] আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে সাহিত্য ও কবিতাচর্চায় মনোযোগী হয়েছেন এবং কিভাবে তার মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের সেবা করেছেন! আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম ভাষা, সাহিত্য ও কবিতাচর্চা, শেখা ও শেখানোর প্রতি অত্যধিক তাকিদ দিয়েছেন। আধুনিক কালে ইসলামের অনেক কিছুর মত এ অধ্যায়টির ওপরও ধুলোবালি পড়ে আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অবশ্য আজকের দিনে পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়, দীনদার মুসলমান বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাহিত্য ও কবিতাচর্চার প্রতি এক ধরনের অনীহা। ভাবটি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ কাজ যেন দীনদারির

www.pathagar.com

পরিপন্থী। তাই সময় এসেছে, বিষয়টি পঠন-পাঠনের এবং তার ওপর জমা হওয়া ধুলোবালি পরিষ্কার করে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনার। সেইসাথে ইসলামী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন।

দুই.

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আরবদের রচিত কবিতাসমূহ ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থে আজো বিদ্যমান। সংখ্যার দিক দিয়ে যা নিতান্ত কম নয়। সে যুগের প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িত অসংখ্য কবিতা আমরা দেখতে পাই। এমন কোন ছোট-বড় ঘটনা নেই যার সাথে জড়িয়ে কোন কবিতা পাওয়া যাবে না। ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ তাঁর 'আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা' গ্রন্থে সেই সময়ের কাব্যচর্চার চমৎকার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আবির্ভাব ও তাঁর ইসলামের দাওয়াত ছিলো সে সময়ের বৃহত্তম ঘটনা। এ দাওয়াত তাদেরকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করে। আরববাসী মুমিন ও মুশরিক-এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যাঁরা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছিলেন এবং যারা তাদের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের পক্ষে প্রতিরোধ খাড়া করে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক হয়েছিলো- এদের উভয়ের কার্যাবলির বর্ণনা সে যুগের কবিতায় রয়েছে। অবশেষে আরব উপত্যকায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তবে আবু বকরের [রা] খিলাফতকালে কোন কোন গোত্র ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল। আরব উপদ্বীপে আবারো যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এসব যুদ্ধের চিত্রও সমসাময়িক কবিদের কবিতায় সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এরপর এলো ধারাবাহিক বিজয়। আরবরা ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুখে তাদের জিহাদের সঙ্গীত উচ্চারিত হতো। হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ড, আলী, তালহা, যুবায়র ও আয়িশার [রা] যুদ্ধ এবং আলী-মুআবিয়ার সংঘর্ষ-প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবিরা উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। কবিতার ভাষায় তারা সোচ্চারিত হন।

এ ছাড়া এ যুগে বহু কবি কেবলমাত্র বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নয়; বরং নিজ ব্যক্তিসত্তা ও গোত্রকে কেন্দ্র করেও ইসলামের আলোকে কাব্য চর্চা করেছেন। এ যুগে কবিতার গতি স্তব্ধ হয়নি বা পিছিয়েও পড়েনি। আর এমনটি হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কারণ, এ যুগের প্রায় সকল অধিবাসীই তাদের জীবনের বিরাট একটি অংশ জাহেলি যুগে অতিবাহিত করে। তাদের ভাষাগত জড়তাও কেটে গিয়েছিলো। আর কবিতার মাধ্যমে তারা তাদের চিন্তা ও আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। ইসলামের আলোক প্রাপ্তির পরও তারা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী কবিতা চর্চা করতে থাকে। একদিনের জন্যও তাদের এ ধারা বন্ধ হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। কিতাবুল আগানী, তারিখে তাবারি, সিরাতে ইবনে হিশাম, আল-ইসাবাহ, আল-ইসতিআব বা এ ধরনের তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থ পাঠ করলে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এসব গ্রন্থ পাঠে মনে হবে, সে সময়ের প্রতিটি জিহ্বা থেকে যেন কবিতার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এ সকল কবির কিছু কবিতা মুফাদ্দাল

www.pathagar.com

আদ-দাব্বী এবং আসমাঈ তাঁদের গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন। আর ইবনে কুতায়বা তাঁর আশশির ওয়াশ শুআরা এবং ইবন সাল্লাম তাঁর তাবাকাতু ফুহুলিশ শুআরা গ্রন্থে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিদের জীবনী আলোচনা করেছেন।

আরবি সাহিত্যের উল্লিখিত উৎসগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হয়, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আরবদের কবিতাচর্চায় কোন অংশেই ভাটা পড়েনি; বরং তা যথেষ্ট উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা বলে থাকেন, ইসলামের আবির্ভাবে কবিতার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো বা এর ধারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, তাদের এ দাবি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ [সা] কবিতার আসরে নিজে কবিতা শুনেছেন এবং কবিদেরকে তাদের সৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিদানও দিয়েছেন। আমরা জানি, মদিনার তিনজন কবি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং মক্কার মুশরিক কবিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর খাড়া করেন। এরা ছিলেন হাস্‌সান ইবন সাবিত, কাব ইবন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনের শেষ দু'টি বছর, যা মূলত প্রতিনিধি আগমনের বছর হিসেবে খ্যাত, আগত প্রতিটি প্রতিনিধিদলের সাথে তাদের বাগ্মী বক্তা ও কবিরা থাকতেন। বক্তারা আলোচনা করতেন আর কবিরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বক্তা ও কবিগণ তাদের জবাব দিতেন। এটা একটি বিরল ইতিহাস। আজকের জন্যও এটা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। হতে পারে অনুসরণযোগ্য।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের নিকট কবিতার গুরুত্ব কমে গিয়েছিলো এবং তারা কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেছিলো–এমন ধারণা যারা পোষণ করেন, তারা বলে থাকেন, কবিদের বিরুদ্ধে কুরআনের আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলেই এমনটি হয়েছিলো। কুরআন বলছে–'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখতে পাও না, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়? তাঁরা বাস্তবে যা করে না তাই-ই মুখে বলে বেড়ায়। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হলে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে তাদের সম্বন্ধে–এ কথা প্রয়োজ্য নয়।'

এ আয়াতে কবিদের সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির জন্যে আমাদের সামনে তৎকালীন আরব সমাজে কবিদের প্রভাব ও কার্যাবলির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র থাকা প্রয়োজন। আরবে কবি একজন সেনাপতি, বিজেতা ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কবি শুধু তাঁর ভাষার মাধ্যমে গোত্রের পর গোত্রকে ধ্বংস ও নামবিহীন করে দিতে পারতেন। অনুরূপভাবে কোন নাম-পরিচয়বিহীন একটি গোত্রকে মাত্র একজন কবিই খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিতেন। এ জন্যই যখন কোন পরিবারে কোন কবির জন্ম হতো তখন সকল গোত্র থেকে অভিনন্দনবাণী আসতে থাকতো; নিমন্ত্রণ দেয়া হতো, স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয়ে অভিনন্দন গীতি গেয়ে শুনাতো এবং কোরবানি দেয়া হতো।

আরবে কাব্য ছিলো এক মহাশক্তি। কবির একটি পঙ্‌ক্তিও বিফল হতো না। আমর ইবন কুলসুমের এক কবিতা তাগলাব গোত্রকে দু'শ বছর পর্যন্ত মর্যাদা ও বীরত্বের নেশায়

www.pathagar.com

বিভোর রাখে। সিফফিনের যুদ্ধে লায়লাতুল হারীরের দিনে আমির মুআবিয়া হযরত আলীর সম্মুখ থেকে পালানোর জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহর [সা] বিরুদ্ধে কাফিররা যে বারবার মদিনা আক্রমণ করতো, তার মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ কবিরাই সংঘটিত করেন।

জাহেলি যুগের কবিরাও ছিলো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সাধারণ লোক সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলতো। এ কবিদের অনেকে গোত্রে গোত্রে কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফাসাদ জিইয়ে রাখতো। তারা গর্ব অথবা কুৎসা করে কবিতা রচনা করতো। এতে গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধের স্পৃহা প্রবল হতো। তারা মদ, জুয়া ও অশালীন আচার-আচরণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতো। এভাবে মানব চরিত্রের অবনতিতে তাদের কবিতার বিশেষ অবদান ছিলো। তখন পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেও কবিদের এসব ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন। মানবকল্যাণই যে মহাগ্রন্থ ও মহামানবের মুখ্য ব্রত তাঁরা এ ধরনের ভাব-বিলাসী ও অসংযমী কবি ও তাদের কবিতা অপছন্দ করবেন এটা স্বাভাবিক কথা। উল্লিখিত আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হয় কুরআন সেই সব মুশরিক কবিদের নিন্দা ও সমালোচনা করেছে যারা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কুৎসা করে কবিতা রচনা করতো এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সমগ্র কাব্য সাহিত্য এর উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কবিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দিয়েছে কেবলমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাব ইবন মালিক এবং হাস্‌সান ইবন সাবিত রাসূলুল্লাহ [সা]-এর খেদমতে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কবিদের সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আমরা কবি। তিনি উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণ আয়াত পড়। ঈমানদার, নেককারদেরকে বলা হয়নি। তখন তাঁরা নিশ্চিত হলেন। একই উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম [সা] বলেন, 'তোমাদের কারো পেটে কবিতা থাকার চাইতে সে পেটে পুঁজ পরিপূর্ণ হয়ে তা পচে যাওয়া অনেক উত্তম।' আয়িশা [রা] হাদিসটি শুনে বলেছিলেন : হুজুর [সা] কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন যেগুলোতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে। অশালীন, অশ্লীল এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী সকল কবিতাই এ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়।

পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর শানে বলা হয়েছে–

'আমরা তাঁকে কবিতা রচনা শিক্ষা দিইনি এবং এরূপ কাজ তাঁর জন্য শোভনীয় নয়।'

রাসূল [সা] কবি ছিলেন না। তবুও আরবের মুশরিকরা তাঁর ওপর নাজিলকৃত কুরআনের বাণী শ্রবণ করে তাঁকে কবি বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে শুধুমাত্র প্রতিবাদ করেছেন। কাব্যচর্চার বৈধতা-অবৈধতার কোন ঘোষণা এখানে নেই। তাছাড়া নবী তো প্রত্যাদেশ বাহক। তৎকালীন আরবে কবি সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিলো, তার সাথে নবুওয়তের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই কবিতা রচনা তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়।

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেও কবিতা শুনতে ভালোবাসতেন। তিনি একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য করেন, কোন কোন বাগ্মিতায় জাদু রয়েছে। আর কোন

www.pathagar.com

কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিকমতের কথা। একদা শারিদ ছাকাফি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বাহনের পেছনে আরোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁকে আরো শোনাতে বলছিলেন। তিনি সেদিন মোট একশটি শ্লোক শুনেছিলেন। এ কথা সকলের জানা, কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত করেন। এর পর পরই এ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে ছিলো মক্কার কুরাইশ ও তাদের সহযোগী অন্যান্য আরব গোত্র। আর অপর দিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল [সা] ও মদিনার আনসার ও মুহাজিরগণ। এ যুদ্ধের অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের পাশাপাশি উভয়পক্ষের কবিরা কবিতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশ গোত্রে উল্লেখযোগ্য কোন কবি না থাকলেও ইসলামের সাথে সংঘর্ষের যুগে তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবারী, দারার ইবন খাত্তাব আল ফিহরী, আবু ইজ্জাহ আল-জামহি, হুবাইরাহ মাখযুমী প্রমুখ কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। তারা সকলে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ [সা], আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তিচরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করতে থাকে। এটা মদিনাবাসীদের জন্য কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের কুৎসা রচনা করতো শুধু এ কারণে নয়, তারা তাদের রচিত কবিতা দ্বারা অন্যান্য আরব গোত্রে ইসলামের প্রচারকার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, এ জন্যও। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] মদিনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করছে, জিহ্বা দ্বারা সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাধা দিয়েছে?' এ কথা শুনে হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত বলেন, 'আমি এর জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ [সা] কবিকে বললেন, আমিও তো কুরাইশ বংশের। তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বললেন, মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয় আমি তদ্রূপ আপনাকে বের করে আনবো'।

হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিতের জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর কবিতা শুনে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তার সাহায্য করো। আর রাসূল [সা] তাঁকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবু বকরের নিকট গিয়ে কুরাইশদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বল দিকগুলো জেনে নাও। এ সম্পর্কে আবু বকরই অধিক জ্ঞানী। সত্যিই সেদিন হাস্‌সান এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছিলেন, 'তার এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতর।' এসব কারণেই তিনি সঙ্গতভাবেই শাইরুর রাসূল বা রাসূলের কবি নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ কবিতার সংঘর্ষে অপর যে দু'জন কবি তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁরা হলেন, কাব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।

জাহেলি ও ইসলামী যুগের বিশিষ্ট কবি কাব ইবন যুহাইর। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করে রাসূলের বিরাগভাজন হন।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা বানত সুআদ আবৃত্তি করে রাসূলকে [সা] শোনান, তখন রাসূল [সা] তাঁকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশির আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান স্বরূপ নিজ দেহের চাদরটি পর্যন্ত তাকে উপহার দেন।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নির্দেশে নাদর ইবন হারিসকে হত্যা করা হয়। এরপর তার কন্যা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করে। তা শুনে রাসূল [সা] বলেন, যদি এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে তাকে হত্যা করতাম না। তুফাইল ইবন আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ [সা]-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন, আমি একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন। রাসূলুল্লাহ [সা] তাকে তার কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ [সা] ধৈর্যসহকারে তা শোনেন।

এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ [সা]-এর যুগে কবি ও কবিতার অবস্থা। তিনি নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, কবিদেরকে উৎসাহ এবং যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। খোলাফায় রাশেদার আমলে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালিত হতো। এ যুগেও কবিতাচর্চায় তেমন কোন ভাটা পড়েনি। খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাহাবীরা তো অনেক সময় মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর জমাতেন। হযরত আবু বকরের যুগে রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অস্ত্রধারী সৈনিকদের পাশাপাশি উভয়পক্ষ থেকে অসংখ্য কবি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। আবু বকর [রা] নিজেও একজন কাব্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে তাঁকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন এবং বলতেন তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দমাধুর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশি সাবলীল।

দ্বিতীয় খলিফা উমর [রা] সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে–কোন প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং নিজেও কোন কোন সময় সে সব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। বসরার শাসনকর্তা আবু মুসা আশআরীকে তিনি নির্দেশ দেন, তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি আরো বলতেন–

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীরন্দাযী শেখাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেন ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর কবিতা বলে

www.pathagar.com

শোনাও।" তিনি কবিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে আরো বলতেন–

"কবিতা আরবদের সবচেয়ে ভালো ও বিশুদ্ধ কথা। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, উত্তেজনা দমিত হয়, কোন সম্প্রদায় তাদের মজলিস-মাহফিলে যথাযথ আসন করে নিতে পারে এবং কোন প্রার্থী কিছু পেতে পারে।"

তিনি আরো বলতেন–

'কবিতা হলো কোন জাতির এমনই এক জ্ঞানভাণ্ডার যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই।'

কবিতার প্রশংসায় তিনি আরো বলতেন–

'মানুষের উত্তম শিল্প হলো কবিতা। সে তার প্রয়োজনে তা উপস্থাপন করতে পারে, তার দ্বারা সে মহানুভব ব্যক্তিকে বিগলিত করতে পারে এবং ইতর প্রকৃতির মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে পারে।'

ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহি বলেন, 'তিনি যে কোন ধরনের ঘটনা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে কবিতার দু-একটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।' আরবি সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে হযরত উমারকে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ট কাব্য-সমালোচক হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি শুধু রুচির ভিত্তিতে কারো সমালোচনা না করে সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও ব্যাখ্যা করেন। তিনি কবি যুহাইরকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন। শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও বিশ্লেষণ করেন।

যুহাইর সম্পর্কে তিনি বলতেন–

'তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলী ও অশোভন কথাও এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। কোন রকম অতিরঞ্জিত করেননি।'

আয়োশ বলেন : হযরত উমর ইবন খাত্তাব ছিলেন কবিতা সম্পর্কে সকলের থেকে বিজ্ঞ। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।

হযরত উমরের [রা] শাহাদাতের পর যথাক্রমে হযরত উসমান ও আলী [রা] তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। তাঁরা তাঁদের শাসনকার্যে উমরের নীতিই অনুসরণ করেন। তাঁদের যুগেও কবিরা ইসলামী নীতিমালার গণ্ডিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এ যুগেও অসংখ্য কবির সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সে যুগের কবি-সমাজকেও প্রভাবিত করে। অসংখ্য সাহাবী কবি এ ঘটনা স্মরণ করে কবিতা রচনা করেছেন, উসমানের হত্যাকাণ্ডে মরসিয়া গেয়েছেন, হত্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। দিওয়ানে আলী নামক কাব্য সঙ্কলন গ্রন্থটি

www.pathagar.com

আজো তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ দিওয়ানের সব ক'টি কবিতা হযরত আলীর নয়। তবে অন্যান্য আরব কবিদের অসংখ্য কবিতার ন্যায় তাঁরও বহু কবিতা যে রক্ষিত হয়নি, এ কথাও সত্য। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণের মূল সূত্র উদ্ভাবন করেন এবং আরবি শব্দরাজিকে ইসম, ফেল এবং হরফ–এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে সে যুগের অসংখ্য কবি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবলমাত্র সাহিত্যিক-সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি জাহেলি যুগের ভোগবাদী কবি ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন।

রাসূলুল্লাহর [সা] খলিফারা ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীরাও কবিতা চর্চা করতেন। নিজেরা কবিতা শিখতেন ও অন্যদেরকে কবিতা শিখতে নির্দেশ দিতেন। হযরত আয়িশা [রা] বলেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে। এর কারণস্বরূপ তিনি বলেন, 'এতে তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ সাবলীল হবে। আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী-এ চার খলিফার প্রত্যেকেই কবি ছিলেন। বিখ্যাত তাবিঈ সাঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব [রহ] বলেন–

'আবু বকর [রা] কবি ছিলেন। উমর [রা] কবি ছিলেন। আর আলী [রা] ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।'

কোন এক যুদ্ধ সম্পর্কে আবু বকরের [রা] একটি বীরত্বব্যঞ্জক কাসিদা বর্ণিত হয়েছে। উমর [রা] ও উসমানের [রা] কিছু জ্ঞানগর্ব শ্লোকও বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত দেখা যায়। আর আলীর [রা] তো একটি দিওয়ানই আছে। এমনকি রাসূলুল্লাহর [সা] সাহাবীদের এমন কাকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোন কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী আনাস [রা] বলেন–

'রাসূলুল্লাহ [সা] যখন আমাদের এখানে আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহেই কবিতা পাঠ হতো।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলেন : পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পার তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে অনুসন্ধান করো।

উমর [রা] কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন। একবার তিনি মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহলের ৪৭তম আয়াত পাঠ করেন। তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট আয়াতে উল্লিখিত শব্দটির অর্থ জানতে চান। সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন। তখন হুযাইল গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললো : হে আমিরুল মুমিনিন! এটা আমাদের উপভাষা। আর এর অর্থ অল্প অল্প নেয়া। উমর [রা] বৃদ্ধের নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? অর্থাৎ আরব কবিরা কি তাদের কবিতায় এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের কবি আবু কাবির আল হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি শ্লোকে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান। উমর [রা]

www.pathagar.com

তখন বলেন : তোমরা তোমাদের দিওয়ান সংরক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর গোমরাহ হবে না।

একবার যিয়াদ তাঁর এক ছেলেকে আমির মুআবিয়ার [রা] নিকট পাঠালেন। মুআবিয়া [রা] জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষার জন্য তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। সবশেষে তিনি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন বললেন। এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ করলো। তখন মুআবিয়া [রা] যিয়াদকে লিখলেন : তুমি তোমার ছেলেকে কবিতা শেখাওনি কেন? আল্লাহর কসম! কবিতা শিখলে সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ থাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে সাহসী হয়ে যুদ্ধে যাবে।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস তাবিই আশ-শাবীর [রহ] কবিতার জ্ঞান তাঁর হাদিসের জ্ঞানের চেয়ে মোটেও কম ছিল না। তিনি বলতেন, আমি যদি ইচ্ছা করি লাগাতার এক মাস কোন পুনরাবৃত্তি ছাড়াই মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করবো, তা করতে পারি।

ইসলামের পঞ্চম খলিফা হযরত উমর ইবন আবদুল আযিযের স্ত্রী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আরব কবি। ইবাদাত ও খিলাফতের কাজে ব্যস্ত থাকায় স্ত্রীকে বেশি সঙ্গ দিতে পারতেন না। তাই তিনি স্বামীর প্রতি অভিযোগের সুরে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তা অতি চমকপ্রদ। এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকেই কাব্যচর্চা করতেন এবং এটাকে নিন্দনীয় কাজও মনে করতেন না। স্পেনের জাহেরি ফেকা শাস্ত্রের ইমাম ইবন হাযাম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর সাহিত্য তত্ত্বেও গ্রন্থ তাওকুল হামামাহ আজো সারা বিশ্বের সাহিত্য তাত্ত্বিকদের নিকট নন্দিত।

ইসলাম চেয়েছে মানুষের কথা, কাজ ও চিন্তাকে একই খাতে প্রবাহিত করতে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম কাব্যক্ষেত্রেও একটি মূলনীতি পেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর একটি হাদিসে জানা যায়, কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ তা সুন্দর আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে, তাতে মঙ্গল নেই। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কবিতা কথার মতই। ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতাও তেমনি সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ। তাই রাসূলুল্লাহ [সা] জাহেলি যুগের কবি উমাইয়া ইবন আবিস সুলতের কিছু পঙ্‌ক্তি শুনে বলেছিলেন, 'তার কবিতা ঈমান এনেছে, কিন্তু তার হৃদয় কুফরকেই আঁকড়ে ধরেছে।' জাহেলি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তারাফার একটি চরণ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সামনে আবৃত্তি করা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : এতো নবীদের কথা। পঙক্তিটি ছিলো এরূপ–

'আজ তুমি যা অবগত নও, কালের চক্রে তোমার কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তোমাকে এমন ব্যক্তি খবর পরিবেশন করবে যারা তাদের ভ্রমণে কোন পাথেয় সঙ্গে নেয়নি।'

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সর্বজনীন সত্যের আলোকে যে কেউ কবিতা রচনা করলে তা হবে সত্যিকার ইসলামী কবিতা। অপরপক্ষে ইসলামী ভাবধারা বিরোধী কবিতা হবে জাহেলি কবিতা। তা সে কবি যে কোন যুগ বা কালের ও যে কোনো ধর্মেরই হোক না কেন। সে কবিতা বাস্তু

www.pathagar.com

ববাদিতা, প্রতীক-ধর্মিতা, সমাজবাদিতা, ক্লাসিক বা রোমান্টিক যে কোন নাম বা পদ্ধতিতেই হোক না কেন ইসলামী পদ্ধতির সাথে তার কোন মিল নেই।

তিন.

রাসূলের [সা] যুগে শিল্পসাহিত্যের এক স্বর্ণকাল ছিলো।

রাসূল [সা] নিজে কাব্যচর্চা না করলেও কাব্যশিল্পের প্রতি তাঁর ছিলো গভীর অনুরাগ। তিনি কবিতা ও কবিদের প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কবিদেরকে পুরস্কৃত করেছেন। করেছেন তাদেরকে সম্মানিত। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস জুগিয়েছেন সমানভাবে।

আজকের প্রেক্ষাপটে কবিদের প্রতি রাসূলের [সা] এই সীমাহীন সম্মাননা এক বিরাট-বিশাল দৃষ্টান্ত হতে পারে। হতে পারে অনুসরণযোগ্য। সেটাই বাঞ্ছনীয় বটে।

কিন্তু আমরা আজকের দিনে এর বিপরীতটাই লক্ষ্য করি আমাদের সমাজে। বেদনার বিষয় বটে। যারা আজকের দিনে কাব্যকুশলতায় এগিয়ে গেছেন নিজস্ব প্রেরণায়–তাঁরাও নানাভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, তিরস্কৃত এবং নানাভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত। এক কথায় সার্বিক দিক দিয়ে জুলুমের শিকার কবিরাই। পুরস্কার ও সম্মাননা তো দূরে থাক, সব ধরনের সুবিধা থেকে তাঁরাই প্রথমত বঞ্চিত। লজ্জা ও কষ্টের বিষয় বটে।

যারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য কবিতার ক্ষেত্রে, ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন তারাই অবহেলিত অনেক বেশি। ভাবা যায়! ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এদিকে আশু সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অন্তত রাসূলকে [সা] ভালোবেসে হলেও এদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের কবিদেরকে যথাযথ প্রাপ্য ও সম্মাননা, যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া–এটা তাঁদের প্রতি করুণা করা নয়। বরং রাসূলের [সা] সুন্নতেরই একটি বৃহৎ অংশ।

আমরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিই। তাহলে আমাদের ইসলামী আন্দোলনের কবিগণ সৃষ্টিশীলতায় আরও অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবেন। আর সেটা হবে ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক বড় খেদমত।

আমরা ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা যেমন প্রত্যাশা করি, তেমনিভাবে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যারা ইসলামী সাহিত্য রচনায় নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন তাঁদের দিকেও সমানভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই। সর্বোপরি রাসূলের [সা] সুন্নতকেই সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল রাখার প্রত্যাশা করি। তাহলে ইসলামী সাহিত্য এ দেশে যেমন বেগবান হবে, তেমনই ইসলামী আন্দোলনও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আমাদের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিক–এটাই কামনা করছি। ■

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

হেলাল আনওয়ার

বর্তমান বিশ্ব আধুনিকতার শীর্ষে অবস্থিত। চাহিদার সাথে সাথে অনেক কিছুরই পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। সেই সাথে সংস্কৃতিক দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতিকে যদিও সর্বদা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনশীল বিষয় বলে মনে করেন, তথাপিও এখানে এমন কিছু বিষয় আছে যা সংস্কৃতিকে আধুনিকতার গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে আনে।

আমরা জানি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক জাতির সংস্কৃতি অন্য জাতির সংস্কৃতি থেকে আলাদা। এই সংস্কৃতিক বিভাজন বা ভিন্নতাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন : ক. মৌলিক সংস্কৃতি এবং খ. গৌণ সংস্কৃতি।

এই দুই ভাগে ভাগ করার কারণ হলো–চাহিদা কেননা, চাহিদার সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। তাই চাহিদার যেমন বিভাজন আছে তেমনি সংস্কৃতির মাঝেও বিভাজন অনিবার্য।

আগেই বলেছি মৌলিক সংস্কৃতির কথা। মূলত কোনো জাতির ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায় যে সংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে তাকে আমরা মৌলিক সংস্কৃতি বলি। পক্ষান্তরে, গোষ্ঠি গত তা দেশজ পরিমন্ডলে যে রীতি গড়ে ওঠে তাকে আমরা গৌণ সংস্কৃতি বলে থাকি।

www.pathagar.com

ধর্ম কোনো জাতির মূলরূপ সহজে তুলে ধরতে পারে। যেমন সনাতন ধর্মের ধূতি, শাখা, সিঁদুর আবার বৌদ্ধদের গেরুয়া কিংবা ধুতি। কিংবা মুসলমানদের টুপি, পাঞ্জাবি। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকবেই।

কালচারের শাব্দিক বিশে-ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় সংস্কৃতিই হলো মূলকথা। আর এর বাইরের যা তা কেবল গৌন। কেননা ধর্মীয় শাসন ছাড়া নৈতিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়।

কালচার শব্দটি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও তাদের মৌলিক থিম এক ও অভিন্ন। শব্দটি ষোল শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সিস বেকন, প্রথম বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তারপর এটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন ম্যাথ আর্ন এবং ওথা ইমার্মন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এ যারা পার্ক ও উইলার এবং টার্নার ও লাস্কি। এরা সকলেই কালচার বা সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের যুক্তিপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমা সাহিত্যে কালচার শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ্যাসথেটিক কালচার, রিলিজিয়াস কালচার ইত্যাদি।

মূলত কালচার হলো মন ও মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ স্তর-বোধক। আর অর্থ হলো–কোনো সমাজ বা জাতীয় মনে কোনো এক ব্যাপারে ব্যবহার বিধি। যা সর্বজনীন চরিত্র, আখলাকের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে কালচার বলা হয়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, মানুষের যে সভ্যতা, যে বিশ্বাস, জীবন বোধ ও জীবন ব্যবস্থা তারই বহিরঙ্গ নান্দনিক বা অনান্দনিক রূপকে সংস্কৃতি বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ যে জীবন বোধ নিয়ে নিজের জীবন ও নিজের সমাজকে তৈরি করে তোলে তাই সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ, বা রাষ্ট্র যাই বলিনা কেন প্রত্যেকেই তারে আপন সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যায়। এই সংস্কৃতি ব্যক্তি বা সমাজকে অনন্য ব্যক্তিত্বে রূপ দান করে। যদি ব্যক্তি বা সমাজ তার ব্যক্তিত্বকে ভুলে যায় তাহলে সংস্কৃতিকে যথাযথ লালন করাও সম্ভব হবে না।

এখন আমরা সংস্কৃতির সাথে ব্যক্তিত্বের যে নিবির বন্ধন সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পি তগণ ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন বিভিন্ন কথা।

মানুষের জীবনের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেয়। অতীতের বিস্তৃত ও অজ্ঞাত অনুভূতিগুলো বর্তমানের আচরণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের সেরা জীবনের কর্মের মূল্যায়ণের পরিসরে একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্মীত হয়। ব্যক্তিত্ব যেমন জীবনের সাথে সম্পর্কিত, সংস্কৃতিও তেমন জীবনের সাথে গ্রন্থিত। ব্যক্তিত্ব যেমন মানুষের আচার-আচরণ সময় ও সমাজের কথা বলে, সংস্কৃতিও অনুরূপভাবে একই কথা বলে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি মূলত একই সূত্রে গাঁথা।

ব্যক্তিত্ব সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে সভ্যতাকে। এজন্যে ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি, সুসংস্কৃতি লালন করে। আর যখনই সুসংস্কৃতি চালু হয় তখনই তা

www.pathagar.com

সভ্যতায় পরিণত হয়। সে হিসাবে আমরা কতটুকু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, কতটুকু সংস্কৃতিবাস এবং কতটুকু সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পেরেছি তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ইংরেজিতে কালচার, বাংলায় সংস্কৃতি এবং আরবীতে আস সাকাফাত বলা হয়। 'সাকাফাত' শব্দের অর্থ হলো আত-তারবিয়াত। বাংলায় যাকে বলে–প্রতিপালন, লালন পালন করা, দেখাশুনা করা। আমরা জাতি হিসাবে আমাদের সংস্কৃতিকে কতোটুকু লালন করছি তা সংক্ষেপে হলেও বলা প্রয়োজন।

ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র বা গোষ্ঠি ভোদ সংস্কৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমরা যেহেতু মুসলিম জাতি তাই আমাদের জন্যে রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যা কেবল মুসলিম জাতির জন্যে নির্দিষ্ট।

কালচারকে যদি সংকীর্সতার ঊর্ধ্বে রেখে বিশে-ষণ করি তাহলে বলতেই হবে–দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার সাথে সাথে সংস্কৃতি পরিবর্ধন বা পরিমার্জন হয়ে থাকে। এজন্যে সংস্কৃতি ব্যক্তি জীবনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি সমাজ জীবনেও এর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। যেহেতু মানুষের চাল–চলন, আচার-ব্যবহার, ওঠা-বসা, লেন-দেন, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুকেই সংস্কৃতি বলে সেহেতু, মুসলমানদের সংস্কৃতি মুসলমানদেরকেই মেনে নেয়া উচিৎ। ইতিহাস অনুসন্ধ্যান করলে আমরা দেখতে পাব, যে সময়ে মুসলিমগণ নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতো তখন তারা বিশ্ব দরবারে একটি আদর্শবান ও মুসভ্য জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করতো। আমরা জানি মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। তাই মহানবী [সা] মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা অনুযায়ী ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। যাকে আমরা হাদীস বলে থাকি।

দুই.

মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে মহানবী [সা] এর দেয়া সংস্কৃতির রূপরেখা জানা আবশ্যক। রাসূল [সা] একজন মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেমন ভাবে চলা উচিৎ সেসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এমনকি রাজনৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক দিক থেকেও। আর এগুলোকেই বলা হয় সুন্নত।

রাসূল [সা] বলেন–তোমরা আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অর্থাৎ রাসূল [সা] এর দেয়া সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে পালন করলে তা দ্বারা পাপের আশংকা থাকে না। বরং জীবন গঠনের জন্যে এটা হতে পারে প্রধান নিয়ামক।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহানবী [সা] এর আগমনের পূর্বে সমস্ত আরবজাতি একেবারে কুসংস্কারের অতল গহবরে নিমজ্জমান ছিল। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলনা কোন সুসভ্যতার চিহ্নমাত্র। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, খুন, মারামারি ছিল তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ বা নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর অবস্থা ছিল অতি স্বাভাবিক বিষয়।

www.pathagar.com

যখন মহানবী [সা] আগমন করলেন তখন, তাদের সকল সামাজিক অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করেন। পাশাপাশি সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি চালু করেন। এর জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের তিনি দায়িত্ব অর্পন করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিশৃংখল আরব জাতিকে বেহাপনার নাগপাশ থেকে ফিরিয়ে এনে সুশৃংখল ও সবুজ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিকগণ রাসূলের [সা] সামাজিক কর্মকান্ডকে শতভাগ সফল বলে মত প্রকাশ করেছেন। এবং দ্বিধাহীন ভাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইসলামী সংস্কৃতি কেবল দেহ ও মনের পরিশুদ্ধতা আনে তা নয়, বরং সভ্য, মার্জিত ভদ্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। যা দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে। যা আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রধান নিয়ামতকও হতে পারে।

তিন.

আমরা বাংলাদেশী। আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। যেহেতু আমরা মুসলমান তাই প্রথমত : আমাদের সংস্কৃতি হবে ইসলামী ভাবধারার। দ্বিতীয়ত : যে সংস্কৃতি সেটা হলো গতানুগতিক দেশীয় সংস্কৃতির অনুসারী। প্রথমটা হলো মৌলিক সংস্কৃতি এবং দ্বিতীয়টা হলো গৌন সংস্কৃতি। এজন্য আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবতে হবে। তথা-কথিত পশ্চিমা জাতির অন্ধ অনুস্মরণকারীদের খেয়া সংস্কৃতির গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, আদর্শ, চিন্তা এবং ভাবধারার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

বর্তমান এদেশের একশ্রেণীর ব্যক্তিগণ দৃষ্টিকে আড়াল করে নিজেদের অধুনা সংস্কৃতিবান বলে দাবি করে থাকেন। তাদের পশ্চিমা সংস্কৃতি-বন্দনা শুনলে মনে হয় এজাতির কোনো নিজস্ব সংস্কৃতি নেই। তাই বর্তমান এদেশের সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে একটু ভাবলে আমাদের সংস্কৃতিক দীনতা ও উদাসীনতা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা লাভ করতে পারবো।

এক সময় ইংরেজদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন এ জাতিকে। তাছাড়া ছ্যামর্গিয় হিন্দু সংস্কৃতিবানরাও একসময় আমাদের সংস্কৃতিকে হরণ করেছিল। তা থেকে উত্তরণের জন্যেও আমাদের বহু ত্যাগ এবং কুরবানী করতে হয়েছিল।

অথচ আজ আবার পুরনো পৃষ্ঠাগুলো নতুন মোড়কে বাঁধাই করা হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতি আজ নিজস্বতা হারাতে বসেছে। কি সামাজিক, কি ধর্মীয় সর্বত্রই যেন অপসংস্কৃতির প্রবল প্রতাপে ভেসে যাচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতির বিশাল ঐশ্বয্যতা।

মুসলমানগণ নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপ্রত্যাশিতভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। সামাজিক ধর্মীয় ও জাতি সত্তার ঐতিহ্য ভুলে আমরা এখন ভিনদেশী, ভিন্ন ধর্মের অপসংস্কৃতিকে জাপটে বসে আছি। পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সব

www.pathagar.com

কিছুতেই আধুনিকতার শে-াগান তুলে নিজ সংস্কৃতিকে অবহেলা করছি। ফলে একদিকে যেমন সামাজিক ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে তেমনি ধর্মকে অস্বীকার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্ধ অনুসরণ আর অজ্ঞতার সুযোগে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতি আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যার ফলে, আমাদের জাতিসত্তার নিজস্বতা যেমন হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি, যে জাহিলিয়াতকে একসময় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল পুনরায় তা আবার জগদ্দল পাথরের মত জেঁকে বসেছে। এমন সে যুগের জাহিলিয়াতকে এযুগের জাহিলিয়াত হার মানিয়েছে। ফলে জাতি সত্তার ঐতিহ্যে পচন ধরেছে। অজ্ঞ, অন্ধ মানুষের মতো সেই অপসংস্কৃতি আমাদের নিত্য জীবনের সাথী করে নিচ্ছি।

হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, নগ্নতা, সুদ-ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানী এসকল ঘৃণ্য অপকর্ম আমাদের সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক বন্ধন বলতে কিছুই নেই। ওদিকে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় গোটা মুসলিম জাতি দিশেহারা। মিডিয়া গুলো কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান নির্মানে ব্যস্ত। এর ফলে আমাদের সংস্কৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

মুসলমান তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেকটাই অসচেতন এবং অসাবধানী। যদি তারা ঐতিহ্যিক চেতানায় সুদৃঢ় হতো তাহলে অব্যশই অপসংস্কৃতির বদলে আপন সংস্কৃতিকে অকপটে ধারণ করতো।

চার.

দেশীয় সংস্কৃতি বা গৌন সংস্কৃতি ভুলে যাওয়ার অর্থ যদি দেশের প্রতি অবমাননাকর হয় তাহলে, মৌলিক সংস্কৃতি ভুলে যাওয়া মানে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূলত মানুষ যখন তার মৌলিক সংস্কৃতি ভুলে যায় তখনই সে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে দূরে সরে যায়। আর এই সুযোগে দূরারোগ্য অবক্ষয় ঘাড়ে চেপে বসে। দুনিয়ার এমন কোনো জাতি নেই যারা তাদের নিজ ধর্মকে অবজ্হা করে। একমাত্র মুসলিম জাতি ব্যতিক্রমী। আর এজন্য আমরা অপসংস্কৃতির স্রোতে ভেসে যাচ্ছি।

আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে একমাত্র মুসলিম জাতি তার আপন সংস্কৃতির মাধ্যমে সভ্যতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। এটাই হলো আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের অভিমত। মানবতা, সমাজাকি শৃংখলা, ঐক্যতা, পরিচ্ছন্নতা একমনটি জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি। এর মাধ্যমে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি অর্জন করা সম্ভব।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজ আর মুসলমানদের যেন নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র সংস্কৃতিই নেই! আমাদের দেশের মেয়েদের উগ্র কালচার দেখলে বিশ্বাস হতে চায়না এদের কোনো নিজস্ব সংস্কৃতি আচে। তাহলে ভাবতে হবে সত্যিই কি আমরা আবারও সেই অন্ধকার যুগের দিকে ফিরে যাচ্ছি! আর কেনই বা তারা কথিত গৌন সংস্কৃতি বুকে ধারণ করে সফলতার জন্যে হা হতাশ করছে?

www.pathagar.com

আমাদের বুঝতে হবে যে, আপন ভূ দেশ ছাড়া বড় হওয়া যায়না। তদ্রুপ আপনসংস্কৃতি ছাড়া ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়না। কিন্তু দু:খের বিষয়, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সর্বক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতিক মূল্যবোধের বড় সভাব। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, আমাদের মৌলিক শিক্ষার অভাব। আর মৌলিক শিক্ষা কেবল আসতে পারে কুরআন ও হাদীস থেকে।

আমরা আগেই বলেছি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যেখানে প্রবল থাকে সেখানে সভ্যতা কোনোভাবেই অবমূল্যায়ীত হয় না। আর এজন্যে দরকার ইসলামী সংস্কৃতির প্রচলন করা।

এর অভাব থাকার কারণে মুসলিম জাতি আজ বিশ্ব সংসার থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। যে জাতি তার আপন সংস্কৃতিকে লালন করতে পারেনা সে জাতি বিশ্ব সভায় কিভাবে আসন পেতে পারে? অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা না করে যাদি আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে মুসলমানদের হারানো হৃৎগীরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

তাই মুসলমানদের উচিত মানসিক দীনতাকে পেছনে ফেলে আপন সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করা। এর মাধ্যমেই সভ্যতা এবং ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। চেতনার রশি ধরে মুসলিম জাতি আপন সত্তায় ভাস্বর হোক। এটাই কামনা করি। ■

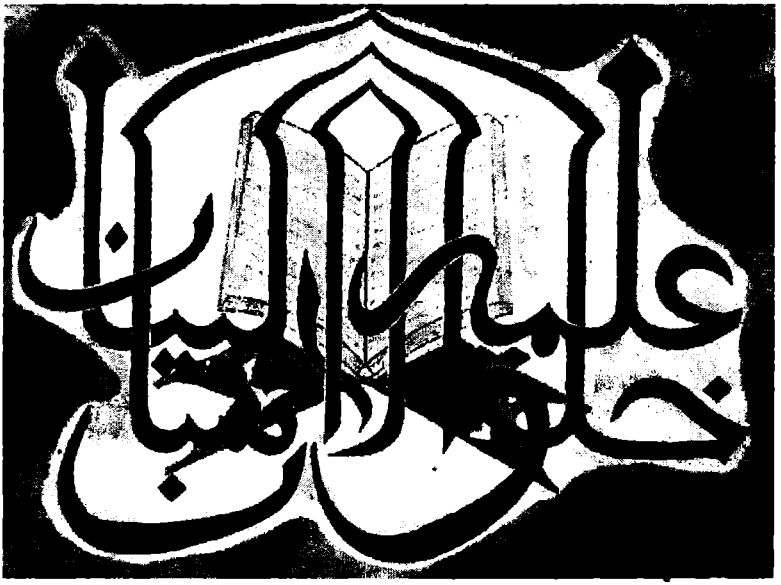

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর অর্থনৈতিক দর্শন ও মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

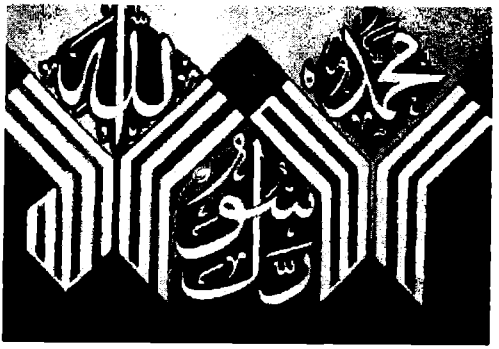

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদিনার এই ইসলামী রাষ্ট্রটি ছিল মানবজাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ছিল স্বতন্ত্র ও সুসংহত এক সিস্টেম। এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হয় মহানবী [সা]-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত ইসলামী সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। এ প্রশাসনের কাঠামো একদিনে গড়ে ওঠেনি। মহানবী [সা] পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিকাশমান পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা সাহাবী [রা] গণ-জনবিচ্ছিন্ন বা দায়িত্বানুভূতিহীন বিশেষ সুবিধাভোগী কোনো গোষ্ঠী ছিলেন না। তাঁরা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দায়িত্বশীলতার এক অত্যুজ্জ্বল নজির

www.pathagar.com

স্থাপন করেছিলেন। ফলে মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে নাগরিকদের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতার নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা একাধারে দায়ী ছিলেন–

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে জবাবদিহিতা।

২. মহানবী [সা]-এর কাছে জবাবদিহিতা বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতা।

৪. নিজের বিবেকের কাছের জবাবদিহিতা।

ইসলামে জবাবদিহিতার চারটি পর্যায়ে রয়েছে। মহানবী [সা] প্রবর্তিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের জন্য চার ভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইসলাম সবাইকেই জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে।

এ চতুর্বিধ জবাবদিহিতার কারণ হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতা একটি আমানত। মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতির পাশাপাশি জনগণের কাছেও জবাবদিহির ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক।

মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসন ছিল সবচাইতে সুসংহত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার। মদিনা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়, ব্যবসায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিদর্শন, বাস্তবায়ন– এসবই ছিল অর্থপ্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ। মহানবী [সা] বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অর্থপ্রশাসনকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্থাপন, শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ও এর সাথে জড়িত সুযোগ্য সাহাবীগণ দক্ষতা, সততা, দূরদর্শিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে শৃঙ্খলা ও কঠোরতার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্পষ্ট ও স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এবং প্রশাসনিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তা অনন্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে চিরদিন অম্-ান থাকবে। তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা, কার্যক্রম ও দৃষ্টান্ত আজকের ইসলামী উম্মাহর গর্বের বিষয় অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল।

মহানবীর অর্থনৈতিক দর্শন ও অর্থপ্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

মহানবী [সা] মদিনা রাষ্ট্রে এমন একটি অর্থপ্রশাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এ প্রশাসনের ভিত্তি ছিল তাওহিদ ও রবুবিয়াত, খিলাফত, রিসালাত এবং আখিরাত ও জবাবদিহিতার অনুভূতি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনুভূতিই মদিনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, শোষণ তথা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত বানিয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

২. মদিনা রাষ্ট্রে অর্থপ্রশাসনের যে দর্শন ছিল তার মৌলিক দিক হলো, এ জগতের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ মালিকানা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। মানুষ সেসব সম্পদের আমানতদার তত্ত্বাবধায়ক। অন্য কথায় মালসম্পদের আসল মালিক আল্লাহ, মানুষ তাঁরই খলিফা হিসেবে এ মাল সম্পদের আমানতদার, অসি। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ সম্পদের উপার্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব পালন করে। সম্পদের ওপর শর্তসাপেক্ষে মানুষের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

প্রথমত, এ সম্পদরাজি কতিপয় ব্যক্তির জন্য নয় বরং সকল মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত, ব্যয়িত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ধন-সম্পদ উপার্জন করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত বৈধ পথ ও উপায়ে। ভিন্ন পথে করা হলে তাতে খিলাফতের শর্ত লঙ্ঘিত হবে।

তৃতীয়ত, বৈধ পথে অর্জিত সম্পদের আমানতের শর্ত-নির্ধারিত উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শুধু নিজ স্বার্থ, নিজ পরিবার পরিজনই নয়, সমাজের অন্য সবার কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে।

চতুর্থত, স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে আল্লাহপ্রদত্ত এ সম্পদ ধ্বংস ও অপচয় করা যাবে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ আচরণকে কুরআনে ফাসাদ বা বিপর্যয় এবং অনাচার সৃষ্টির সাথে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. তাওহিদ, রিসালাত, খিলাফত ও আখিরাতের ভিত্তির ওপর মদিনা রাষ্ট্রের যে অর্থপ্রশাসন সংগঠিত হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল : ১. সকল নাগরিকের ইহকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা, ২. সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ৩. ক্ষতি, বিপর্যয় ও জুলুমের সকল পথ বন্ধ করা, ৪. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করা, ৫. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, ৬. ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করা, ৭. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুকম্পা এবং সকল সৃষ্টি ও মানুষের জন্য নির্মল ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।

৪. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার আদল ও ইহসান। তা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের সব অন্যায়, অত্যাচার ও বে-ইনসাফি থেকে মুক্ত। আদল মানে সুবিচার, ন্যায়বিচার। দু'টি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে আদল গঠিত। ১. মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা ২. প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা। কোনো পক্ষপাতিত্ব না করা যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়ার নাম আদল। প্রকৃতপক্ষে আদলের দাবি হচ্ছে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। প্রত্যেক নাগরিককে তার নৈতিক, সম্পর্কগত, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারপূর্ণ ঈমানদারির সাথে যথাযথভাবে প্রদান করা। ন্যায়বিচারের অন্য অর্থ সমাজ থেকে অন্যায় ও জুলুমের উচ্ছেদ এবং সবল প্রতিরোধ। ইসলামী শরিয়ার ব্যত্যয় জুলুমকেই ডেকে আনে। জুলুমের সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল

www.pathagar.com

ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতারিত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যই মহানবী [সা] এর অর্থপ্রশাসনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ মদিনা রাষ্ট্রে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। একই সাথে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটি মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল। ইহসান মানে সুন্দর ব্যবস্থার হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, অপরকে তার অধিকারের চেয়ে বেশি দেয়া এবং নিজের অধিকারের চেয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা। ইহসান আদলের চেয়ে বেশি কিছু। কোনো সমাজ কেবল আদলের নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যেখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্য হরহামেশা মেপে মেপে নিজের অধিকার নির্ণয় ও আদায় করে; আর অপরের অধিকার কতটা রয়েছে তা খতিয়ে নির্ধারণ করে এবং কেবল ততটুকুই দিয়ে দেয়। এ ধরনের একটি সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটবে না বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে সমাজে প্রেম ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, মাহাত্ম্য, উদারতা, ত্যাগ ও কোরবানি, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং অপরের কল্যাণ কামনার মত মহত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। অথচ এ গুণগুলো তথা ইহসান হচ্ছে ব্যক্তিজীবনে সজীবতা ও মাধুর্য সৃষ্টির এবং সমাজজীবনে সৌন্দর্য ও সুষমা বিকাশের উপাদান। ইহসানের সাথে আর্থসামাজিক সুবিচার এবং কার্যক্রমের যে আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন এ জন্যই তা বাস্তবায়নকে মদিনা রাষ্ট্র ফরজ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মদিনার অর্থনীতিতে কড়া নজর রাখা হতো যাতে আদল ও ইনসাফ কায়েম থাকে এবং কোনো জুলুম হতে না পারে।

৫. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের লক্ষ্য ছিল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার মদিনা রাষ্ট্রে নিশ্চিত করা হয়েছিল। মানবকল্যাণের লক্ষ্য হাসিলের জন্যই মহানবী [সা] অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার করেছিলেন। মদিনা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সম্পদ ও সেবাপ্রাপ্তি এবং ত্যাগ উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে বলেই মনে করা হতো। সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ শুধুমাত্র ইহজাগতিক সুখের জন্য নয়। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণও নিশ্চিত করতে হবে।

৬. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো ও তাদের মানবিক মর্যাদার যথাযথ প্রতিষ্ঠা। মদিনা রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষত আত্মীয়স্বজন এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটি বিত্তবান নাগরিকের ঈমানি দায়িত্ব। কুরআনের আদর্শ অনুসারে নাগরিকগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত তারা দরিদ্র আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের বঞ্চিত ভাগ্যাহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করত। সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ

www.pathagar.com

সাধনের জন্য দেয় কুরআনিক নির্দেশনা মদিনা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৭. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসন যে অর্থব্যবস্থা কায়েম করছিল তাতে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করে জীবিকা অর্জন করার অধিকার ছিল। অন্যথায় জীবিকা অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডার রয়েছে তা খুঁজে বের করে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মদিনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে ব্যবসায়, চাষাবাদ, কৃষি, পশুপালন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশায় নিয়োজিত ছিলেন উৎপাদন কার্য চলত স্বাধীনভাবে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সাহাবীরা নিজেরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরও নিয়োগ করতেন। এক কথায় মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসন ইসলামী শিক্ষার আওতাধীন এক স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এতে বেকার এবং অভাবগ্রস্তদের কর্মসংস্থান অথবা ভাতার ব্যবস্থা ছিল।

৮. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থনীতি স্বাধীন অর্থনীতি হলেও তা অবাধ ছিল না। কারণ ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ করা হয়েছে। ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর আইনের নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত। ফলে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এতে নিশ্চিত।

৯. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ছিলেন রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের রক্ষক। তারা ভক্ষক ছিলেন না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিলেন। বায়তুলমাল থেকে একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন ধারাণোপযোগী সমতুল্য অর্থই তারা পেতেন। কোনো অবস্থাতেই তারা বেশি অর্থ নিতে রাজি হতেন না। অর্থপ্রশাসনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিগণ যাতে আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করেন মহানবী [সা] সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকগণ যাতে আরামপ্রিয় না হয়ে পড়ে সে জন্য আরাম-আয়েশের উপাদানগুলোর ওপর ইসলামের নৈতিক চারিত্রিক বিধিনিষেধারোপ করা হয় এবং সহজ, সরল ও সাদাসিধে জীবনযাপনের ওপর সকলকে উৎসাহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র এর রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারকে সমান চোখে দেখে।

১০. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা। মদিনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে কোনো প্রকার জুলুম ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ সংখ্যালঘুরা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত।

১১. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি আল কুরআন হচ্ছে এমন এক ঐশী

www.pathagar.com

গ্রন্থ যেখানে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব তথা সরকারি আয়ের খাতসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাত সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। সম্পদ ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিভিন্ন মেকানিজমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়, বৈষম্য কমে, সামাজিক বৈষম্য নির্মূল হয় এবং শ্রেণীসংঘাতের অবসান ঘটে। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন ও আয়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পৃক্ত থাকে। ইসলামের নিষিদ্ধ উৎপাদন ও আয় হারাম বলে গণ্য হয়। একদিকে ইসরাফ ও তাবজির সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, অন্য দিকে ইহতিকার বা মজুদদারি সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের মিরাজি আইন বা উত্তরাধিকার আইন আয় ও সম্পদ বণ্টনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন কুরআনের এসব নির্দেশকেই বাস্তবায়িত করেছে।

১২. মদিনা রাষ্ট্রে সুদহীন অর্থনীতি চালু করা হয়েছিল। কুরআন মজিদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহানবী [সা]-এর অর্থনীতিতে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা হয়। কুরআন সুদকে নিষিদ্ধ করেই থামেনি, সুদের কারবারিদের প্রতি যুদ্ধ জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। মদিনার ব্যবসায়ীরা নিজের অর্থে ব্যবসায় করতেন অথবা অন্যের নিকট থেকে লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতেন। লাভের অংশ বিনিয়োগকারীকে দিয়ে দিতেন। শরিকানার ভিত্তিতেও ব্যবসায় করা হতো। শরিকানা ব্যবসায়ে হয় দু'জনের পুঁজিই খাটানো হতো অথবা একজনের পুঁজি, অন্যজনের শ্রম সংযুক্ত হতো এবং নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী লাভ-লোকসান ভাগ করা হতো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিনাসুদে একজন অন্যজনের নিকট হতে কর্জ [ঋণ] গ্রহণ করতেন। মদিনার অর্থনীতিতে আধুনিক ধরনের ব্যাংক কায়েম ছিল না। এ কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের যেসব খারাপ প্রভাব রয়েছে তা মদিনার ইসলামী অর্থনীতিতে দেখা দেয়নি। মদিনার অর্থ-প্রশাসন সুদের মত সব ধরনের শোষণের উপায় উপকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শোষণের হাতিয়ারের কোনো স্থান নেই। ইসলামী অর্থনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে আয় ও উৎপাদনের পথ ও প্রক্রিয়া হবে হালাল, হারাম পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ। এ জন্য মদিনার অর্থনীতিতে ঘুষ, জুয়া, লটারি, বাজি, ধোঁকা, প্রতারণা, ফটকা কারবার বা ফটকাবাজারি, বখরাবাজি, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজালপণ্য বিক্রিকরণ জবরদখল, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, খেয়ানত, ধাপ্পাবাজি, চোরাচালান, মজুদদারি, খোলোবাজারি, মুনাফাখোরি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি– এসবের কোনো সুযোগ ছিল না।

১৩. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি সাধন। হাতের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে

www.pathagar.com

প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের বিস্তার ঘটান হয়। একই সাথে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।

১৪. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থায় ধনবানদের সম্পদ পবিত্রকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এ পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন সৃষ্টি হয়। ধনীদের হাত থেকে সম্পদ নেমে আসে গরিবদের নিকট। ইসলামে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধনবানদের সম্পদ শুধুমাত্র ধনবানদের নয়, এর ওপর দরিদ্রদের হক রয়েছে। কুরআন বলছে : "আল্লাহ রাহে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে তোমরা ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করো না এবং তাদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন আল্লাহর এসব নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল।

১৫. মদিনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের আওতায় অমুসলিমদের ওপর করারোপ বস্তুত তাদের প্রতি কর্তব্যবোধেরই পরিচায়ক। মুসলিম নাগরিকদের মত অমুসলিমদেরও জান ও মালের হিফাজত রাষ্ট্রের কর্তব্য। কাজেই মুসলিমদের জন্য জাকাত অত্যাবশ্যক ধরে অমুসলিমদের জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী। ■

ATAB MEMBER

SOUTH ASIA TRAVEL & HAJJ SERVICE

Govt. Approved Travel Agent

Mohammad Saifuddin
Managing Director

110, Aliza Tower, Room No-6, Fakirapool, Dhaka-1000
Cell : 01680-575890, 01943-820289, 02-7155708, 7195141
e-mail: saifuddin.eye@gmail.com

হজ্জ, ওমরা ও ভিসা প্রসেসিং সহ বিশ্বের যে কোন দেশের এয়ার টিকেটের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর বিদায় হজের ভাষণ
শাশ্বত মানবিক আদর্শের পয়গাম

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ

'হে জনগণ। তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে; পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে; রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে; সম্পদের জাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করবে, তবেই তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' [তিরমিজি, ২খ., পৃ. ৫১৬, নং ৬১৬]

খাতমে নবুওয়ত

'হে মানবম লী আমার পরে আর কোনো পয়গম্বরের আবির্ভাব হবে না। তোমাদের পরে আর কোন উম্মত নেই' [অত:পর দু'হাত উত্তোলন করে বলেন, 'হে আল্লাহ সাক্ষী থেক' [আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০৩]।

ধর্মের ব্যাপারে সতর্কতা

'সাবধান তোমাদের এ শহরে শয়তানকে কেউ পূজা করবে, শয়তান এ আশা চিরতরে পরিত্যাগ করেছে; কিন্তু যেসব কাজকে

www.pathagar.com

তোমরা অতি হালকা বলে মনে কর, এরূপ কাজে তোমরা শয়তানের আনুগত্য করবে এবং এতে সে সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং তোমরা দীনের ব্যাপারে সতর্ক থেক' [তারীখু তাবারী, ২খ., পৃ. ২০৫; মুসনাদ আহমদ, ৫খ., পৃ. ২৫১]।

'তোমাদের আগেই আমি হাউজে কাউসারের কাছে পৌঁছব। অন্য নবীদের উম্মতের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে আমি গৌরবান্বিত হব। সুতরাং আমাকে লজ্জায় ফেল না। আমি অনেকের মুক্তির কারণ হব [অর্থাৎ আমার সুপারিশের ফলে বহু মানুষ নাজাত লাভ করবে]। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, হে প্রভু! আমার অনুসারীদের রক্ষা করুন। তিনি উত্তরে বলবেন, আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পর তারা দীনের ব্যাপারে কী ধরনের বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল' [ইব্ন মাজাহ, ২খ., পৃ. ১০১৬, নং ৩০৫৭]।

'হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের আগে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে' [ইবনে মাজাহ্, ২খ.,পৃ. ১০০৮, নং ৩০২৯]।

দাজ্জালের আবির্ভাব

'আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি; নুহ [আ] এবং তাঁর পরবর্তী নবীরাও সতর্ক করেছেন। বস্তুত তোমাদের মধ্যে [মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মত] সে আবির্ভূত হবে তার কিছু লক্ষণ তোমাদের কাছে গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা তোমাদের কাছে মোটেই গোপন নয়। [রাসূলুল্লাহ [সা] এটা তিনবার বললেন]। নিশ্চয় তোমার প্রভুর এক চক্ষু অন্ধ নয়, পক্ষান্তরে তার [দাজ্জালের] ডান চক্ষু অন্ধ, দেখতে মনে হয় যেন বের হয়ে পড়া আঙুরের থোকা' [বুখারি, ৪খ., পৃ. ১৫৯৮]।

কুরআন ও সুন্নাহ : মুক্তির পথ

'হে মানবমণ্ডলী! আমার কথা শোন! আমি আমার কথা পৌঁছিয়েছি? আমি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, এগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে [অনুসরণ করলে] ধরলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো 'আল্লাহর কিতাব' ও 'আমার সুন্নাত' [জীবনাদর্শ]। আরেক বর্ণনায় 'আমার পরিবারবর্গ'। নিঃসন্দেহে 'সাদাকাত' আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারবর্গের জন্য এবং আমার বংশধরদের জন্য অবৈধ। স্বীয় উষ্ট্রীর কেশর থেকে একটি চুল হাতে ধারণপূর্বক তিনি বলেন, দৈর্ঘ্য ও ওজনে এ পরিমাণ 'সাদাকাত'ও যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে' [তিরমিজি, ৫খ., পৃ. ৬৬৩, নং ৩৭৮৮; ৫খ., পৃ. ১৯১, নং ৫০৫৭]।

নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ

'তোমাদের মা, তোমাদের বাবা, তোমাদের বোন, তোমাদের ভাই, তোমাদের নিকটাত্মীয় এবং পরবর্তী নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করবে' [নাসাঈ, কিতাবুয্ জাকাত, বাবু আইয়তুহুমাল ইয়াদুল উল্য়া, ৫খ.,পৃ. ৬১, নং ২৫৩২]।

'যে সন্তান তার বাবা ব্যতীত অন্য কারও নামে বংশ সূত্র দাবি করবে কিংবা দাসদাসী

www.pathagar.com

নিজের মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব সাব্যস্ত করবে, তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লা'নত এবং সব ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন নফল কিংবা ফরজ [ইবাদত] কবুল করবেন না' [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭১; ইব্ন মাজাহ, পৃ. ১৯৪-৫]

ক্ষমা ঘোষণা

'হে জনগণ! আমার কাছে জিবরাঈল আসলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করে বলেন, আরাফাত ও পবিত্রস্থানে অবস্থানকারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন' উমর ইব্ন খাত্তাব [রা] জানতে চাইলেন। এটা কী [কেবল] আমাদের বিশেষত্ব? রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, 'তোমাদের এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করবে [হজ করবে] তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে' [আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২খ., পৃ. ২৩১]।

বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় :

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন মনোনীত করলাম' [সূরা মায়িদা : ৩]।

'আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হবে [বলতো] তোমরা তখন কী বলবে? উপস্থিত লোকজন বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আপনি [উম্মতকে] নসিহত করেছেন এবং আপনি দায়িত্ব [যথাযথ আমানত] পালন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর 'শাহাদাত' আঙুল আকাশের দিকে তুলে এবং সমবেত জনতার দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, 'হে আল্লাহ্ সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো' [আবদুল বার, আদ দুরার, ১১খ., পৃ. ২৭২; মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩৯৪-৭]। 'আমি কী পৌঁছিয়েছি? আমি কী পৌঁছিয়েছি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো; হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো; হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো' [ইব্ন মাজাহ, নং ৩০৫৫]।

শেষ কথা

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর বিদায় হজের ভাষণ ছিল যুগান্ত কারী ও বৈপ-বিক। আধুনিক যুগের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক ভাষণের আবেদন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যদি তাঁর ভাষণের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করি তাহলে জুলুমের অবসান হয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের ন্যায়বিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত হবে। নিজের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজের অপরাপর সদস্যদের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা জরুরি, যাতে কারও প্রতি যেন জুলুম না হয়। মানবতার বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ বিশ্ব পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী [সা] প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণের অনুশীলন পৃথিবীকে আবাদযোগ্য, সুন্দর ও প্রীতিময় করে গড়ে তুলতে পারে। ■

www.pathagar.com

তালে ঠিক

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

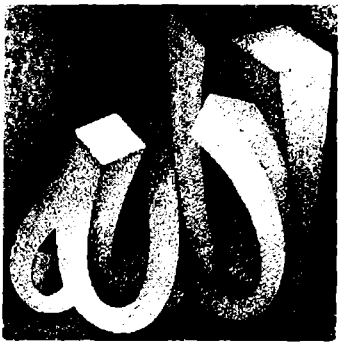

এভাবে দলবল নিয়ে আমার কাছে আসবেন না। মানুষ দেখলেই এখন ভয় লাগে।

ঠিকই কইছেন। এক সময় মানুষ জীন-ভুত–জীব-জানোয়ারের ভয় পেত। এখন মানুষ মানুষকে ভয় পায়। এই যে দুনিয়ায়, মানুষ আর মানুষ নেই। এবার থামেন। মানুষের বদনাম গাওয়ার অনেক ক্যাসেট আছে। কি জন্য আইছেন তাই কন।

একটা দাওয়াত দিতে আইছি।

দাওয়াত খাওয়া বাদ দিছি। পেটে আর সয়না।

খাওয়ার দাওয়াত নয়। কথা শোনার দাওয়াত। সীরাত মাহফিলের দাওয়াত। নবীর জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে।

খাইয়া দাইয়া কি আপনাগো আর কোনো কাম নাই? জন্মের পর থেকে তো শোনতেই আছি। নতুন কইরা আর কি শোনাইবেন?

আমাদের নবীর জীবন, এমন এক জীবন, যা শোনে শেষ হয়না। আমরাও অনেক শোনেছি, আরো শুনব। এতে আমাদের কোন

www.pathagar.com

অরুচি নেই। আপনি যখন শোনে শোনে টায়ার্ড হয়ে গেছেন তাহলে আমাদেরও কিছু শোনান। সংক্ষেপে একটু বলেনতো, আমাদের নবী কি করতেন, কিভাবে দিন কাটাতেন।

আমাদের নবী এলাকার বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন। হুজরায় থাকতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াইতেন। টিফিন ব্যারিয়ারে ভরে মুসুল্লীরা খাবার পাঠাইতেন, তা খাইতেন। মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরে যাইয়া মিলাদ পড়াইতেন। বেতন ছাড়াও কিছু এক্সট্রা ইনকাম হত। এই আর কি?

কোন বই পুস্তকে পড়ছেন, না কি কোন হুজুরের মুখে শোনছেন?

এই সব আবার পড়া আর শোনা লাগে নাকি? আমাদের হুজুররা তাই করে। হুজুরদের হুজুর, সবচেয়ে বড় হুজুর আর কি করবেন?

আমাদের নবী কোন হুজুর ছিলেন না। তিনি একজন অত্যাধুনিক মানুষ ছিলেন। ইন সাইক্রো পেডিয়া বৃটেনিকা পড়েছেন?

ওরে বাবা, নামই শুনি নাই।

পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ব কোষ। এর মধ্যেও মুহাম্মদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। সেখানে লেখা আছে, এস. এ বোলার, এস এ এডমিনিসট্রেটার, এস এ ফাউন্ডার, এস এ সোসোল রিফরমার, এস এ জাস্টিজ, এস এল মেকার, এস এল গিভার, এস এ বিলিজিয়াস টিচার, এস এ সোলজার, এস এ কমা ার, মুহাম্মদ ইজ দ্যা সুপারম্যান অব দ্যাওয়ার্ল্ড।

ও মাই গড। নবীর জীবনী শোনাইতাছেন? নাকি জাতি সঙ্গে ভাষণ দিতাছেন?

কিছুই শোনাইনি। শুধু বিশ্ব কোষ থেকে একটু পরিচয় দিয়েছি। শোনার জন্য দাওয়াত দিয়ে গেলাম। মাহফিলে আসবেন, অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন।

তাহলেতো একবার যেতেই হয়। মর্ডাণ লাইফ স্টাইল অব মডার্ন প্রফেট। একটু অন্যরকম হবে বলে মনে হচ্ছে।

বন্ধু বান্ধব সম্ভব হলে সাথে নিয়ে আসবেন। আলোচনাও হবে মডার্ণ। কোন হুজুর নয়। আলোচনা করবেন একজন প্রফেসর।

ব্যাপককানা ঘুষা শুরু হয় এলাকায়। সফুল মাঠে সীরাত মাহফিল হবে। গতানুগতিক ওয়াজ নয়। আলোচনার বিষয় মডার্ণ লাইফ অব আওয়ার মডার্ণ প্রফেট।

আসলেই অন্য রকম আলোচনা। বক্তার মুখে সুললিত সুর নেই। হাসানো কান্দানোর জন্য বুক চাপড়ানো মাতন নেই, গলা ফাটিয়ে আল্লাহু আল্লাহু জিকির নেই। ঘন ঘন ইয়ানবী ছালাম আলাইকা, দরুদ নেই চা খাওয়ার জন্য।

আপনারা শিক্ষিত মানুষ। অনেক কিছু জানেন। আমি কি বলবো? আমি কি বলবনা, সেটা আগে একটু বলে নেই। আমি বলব না, আমাদের নবী কত বছর আকাশে তারা হয়ে জ্বলছিলেন। আমি বলব না, তিনি কিভাবে আল্লাহর কপালে নূর হয়ে

www.pathagar.com

চমকাচ্ছিলেন। আমি বলব না, তিনি কিভাবে মা আমেনার গর্ভে এলেন। এসব মোনে আপনারা কি শিখবেন আর কি আমল করবেন? আপনারা কেউ আকাশে তারা হয়ে জ্বলতে পারবেন না। বাবার কপালো নূর হয়ে ফোকাস ও মারতে পারবেন না। আমি সে আলোচনাও করব না, নবীর মাথার উপর সব সময় একখন্ড মেঘ ছায়া দিত। নবীর পায়খানা প্রস্রাবে কোনো দুর্গন্ধ ছিল না। আপনি যতই বুজর্গ হন, আপনার মাথার উপর সব সময় মেঘ ছাতার মত দাঁড়িয়ে থাকবে না। যতই কোর্মা পোলাও বিরিয়ানী খান, পায়খানা প্রস্রাবে আতরের ঘ্রাণ পাবেন না। লোকজন বেবাক, একদম অবাক। হুজুরতো সাংঘাতিক চিজ। বলব না বলে দারুন বলে ফেলেছে। এখন কি বলবে, সেটা তো না শোনে উপায় নেই।

বলব না বিষয়ে বলা শেষ। আপনারা যা শোনতে চান, আমি তাই বলব। আপনারাই বলুন, আমাদের নবীর কোন বিষয় শোনতে চান?

শ্রোতামন্ডলী পরস্পর মুখের দিকে তাকায়। সহজ প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর দেয়া সহজ মনে হচ্ছে না। তবু একজন জবাব দেয়।

হুজুর, নতুন কিছু কন। আমরা নতুন বয়ান শোনবার চাই। আমাদের দেশে বহু নেতা আছে। কম বেশী কিছু অনুসারীও আছে তাদের নেতাদের জীবনাদর্শ নিয়ে অনুসারীরা আলোচনাও করে। তারা কোন বিষয়ে আলোচনা করে? নেতা কোন ডিজাইনের প্যান্ট পড়ে, কি রং এর জামা পড়ে, কোন পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজে, মিষ্টি না জাল বেশী পছন্দ করে? এসব আলোচনা কেউ করে, না কেউ শোনে? আমাদের নবীর জীবনীর এসব দিক যেহেতু সবই লেখা আছে, তাই বলা যায়। কিন্তু এসব শোনে তেমন ফায়দা নেই। তাই আমি অন্য কিছু বলতে চাই। আমিতো আর নতুন কিছু বানাতে পারব না। পুরান ঘটনাই নতুন করে বলব। সাত ভাই চাম্পা সিনেমার গানের মত। শোনেন শোনেন জাহাপানা, শোনেন রাণী ছয় ছয়জনা। শোনেন বলি নতুন করে পুরান ঘটনা, ও ভাই পুরান ঘটনা।

সত্যিই হুজুর পুরান ঘটনাই বললেন। তবে সম্পূর্ণ নতুন করে। নবীজির মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনা সবাই জানে। কাফেররা কিভাবে বাড়ি ঘেরাও দিয়েছিল। নবীজি কিভাবে বালুতে ফু দিয়ে ছুড়ে মারল আর কাফেররা অন্ধ হয়ে গেল।

হুজুর একটি আজব প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন শ্রোতাদের।

বলতে পারেন, পৃথিবীতে প্রথম টিয়ার গ্যাস কোথায় কে মেরেছিল? এর আবিষ্কারক কে?

গন্ডগোল লাগলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস মারে। শহরের লোক সবাই জানে। প্রথম কে কোথায় মারছে, কে বানাইছে, সেই খবর রাখে কোন পাগলে? তাই শ্রোতারা নিরোত্তর।

–মক্কার কোরাইশ সন্ত্রাসীরা যখন নবীজির বাড়ি ঘেরাও করেছিল, নবী এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে "শাহ আতুল ওজু" বলে ফু দিয়েছিলেন। পাহাড়ী বালু কনার সিলিকন ও ফুঁয়ের কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্দিষ্ট মাত্রার ক্যামিক্যাল রিএকশনে তৈরী হয়েছিল

www.pathagar.com

টিয়ার গ্যাস। নবী পাক শুধু ছুড়ে মেরেছিলেন। আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে বাতাস তা পৌঁছে দিয়েছিল সন্ত্রাসীদের চোখে। এটাই পৃথিবীর প্রথম টিয়ার শেষ একশন। প্রথম ডাইরেক্ট একশন।

হুজুর, চালায়া যান। সারা রাইত নতুন কইরা পুরান ঘটনা শুনুম। কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।

আমাদের নবী অনুসারীদের দেশ ত্যাগের অর্ডার দিয়ে ক্ষমতাশীনদের কাছে আত্ম সমর্পণ করেন নাই। নিজে হিজরত করেছেন। মক্কায় ক্ষমতাশীনতায় নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল। তিনি দশ হাজার মুক্তি যোদ্ধা নিয়ে মক্কা জয় করে নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার করেছেন। হিজরত থেকে মক্কা বিজয়। সময় মাত্র দশ বছর। দশ লক্ষ বছর আলোচনা করে শেষ করা যাবে না সেই ইতিহাস। আমি দশ মিনিটেই শেষ করব।

চার্টার অব মদীনা, ব্যাটেল অব ওহুদ বদর খন্দক, প্যাক্ট অব হোদায়বিয়া, ভিক্টোরী অব মক্কা, জেনারেল এমনিবিট আফটায় ভিক্টোরী, স্পিচ অব বিদয়া হজ্জ, সবই পুরান ঘটনা। কিন্তু মনে হচ্ছে নতুন। নের্টো, সিয়াটো, সেন্টোর সাথে হোদায়বিয়া সন্দীর তুলনা, ইরান-ইরাক-আফগান যুদ্ধের সাথে ওহুদ-বদর-খন্দক যুদ্ধের নৈতিক পার্থক্য, মক্কা বিজয়ের সাথে বিজয় দিবসের সাদৃশ্য সৌদৃশ্য, ১৯৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে সাধারণ ক্ষমার সাথে ওয়াশী, হিন্দা ও আবু সুফিয়ানের ক্ষমা ঘোষণার উদাহরণ, এসব কোন হুজুরের বয়ান নয়। একজন অধ্যাপকের তাত্ত্বিক আলোচনা। মন্ত্রযুদ্ধ শ্রোতা মন্ডলী।

আপনারা কি আরো শোনবেন? নাকি আখেরী মুনাজাত দিয়ে শেষ করব?

চালায়া যান হুজুর। টিকেট কাইটা শারুক খানের গান আর রাণী মুখার্জীর নাঁচ দেখছি। বিনা টিকেটে নতুন কইরা পুরান ঘটনা শোনবার বইছি। টিয়ার গ্যাস না, বোমা মারলেও আজ নড়ব না। আমরা যাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছি। ■

www.pathagar.com

নূরের পরশ

জুবায়ের হুসাইন

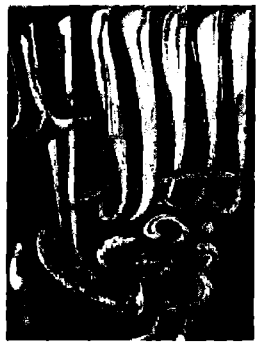

সারওয়ারে আলম হযরত মুহাম্মদ [সা] জীবনে মাত্র কয়েকবার এমনভাবে হেসেছেন যে তাঁর পবিত্র দাঁত থেকে বিচ্ছুরিত আলো দেখা গিয়েছে। আজও তিনি তেমনভাবেই হেসে ফেললেন। আসলে তিনি এতটাই চমকিত ও উচ্ছ্বসিত হলেন যে, এভাবে না হেসে পারলেন না। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়– এক চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় অর্থাৎ ওই চোখটিতে অসুস্থতা নিয়ে লোকটি খেজুর খাচ্ছিলেন। আর শুধু খাচ্ছিলেন বললে ভুল হবে, বরং যেন গোগ্রাসে গিলছিলেন। তা দেখে রাসূলের [সা] প্রিয় সাহাবী হযরত ওমর ফারুক [রা] তো বলেই ফেললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, তাঁর চোখ ব্যথা করছে অথচ কি গোগ্রাসে খেজুর সাবাড় করছে।'

আসলে চোখের অসুখের সময় খেজুর খাওয়াটা ক্ষতিকর হয়। সবাই সেটা জানতো। এ কারণে রাসূলও [সা] লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তোমার চোখে অসুখ হয়েছে, আর তুমি খেজুর খাচ্ছ?'

www.pathagar.com

লোকটি একটুও দেরি না করে জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার ভালো চোখটির পক্ষ থেকে খাচ্ছি।'

লোকটির এই উজ্জর শুনে দীনের নবী এভাবে না হেসে পারলেন না।

ইরাকের ওই গ্রামের এই পরিবারটির বেশ সুনাম। সিনান বিন মালিক পিতার নাম। সোহায়েবের বয়স যখন বেশ অল্প, সেই সময় একদিন উবুল্লাহ পল্লীর উপর রোমকরা হামলা করে। এ সময় অন্য মালামালের সাথে রোমকরা তাকেও ধরে নিয়ে যায়। তাই তার শৈশবকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রোমকদের গোলামিতে অতিবাহিত হয়। আর যার কারণে নামের পাশে রুমী শব্দটি যোগ হয়ে যায়। অর্থাৎ সোহায়েব হয়ে যান সোহায়েব রুমী।

দাসের জীবন আর কতদিনই বা ভালো লাগে? তাই তো তিনি পালিয়ে মক্কায় চলে এলেন। আসলে তিনি তো খুবই কৌশলী ও পরিশ্রমী মানুষ। তবে মক্কা পৌঁছানোর সময় তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনেক অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন। এবং মক্কার অন্যতম বিত্তবান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভালোই চলছিল সোহায়েবের দিনগুলো। এখন তো তিনি আর অন্যের গোলাম নন, তিনি মুক্ত, স্বাধীন। নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারেন। বেশ কিছুদিন ধরেই একটা কথা তার কানে আসছিল। কোন্ এক মহান পুরুষ নাকি সত্য দীনের দাওয়াত প্রচার করছেন। তিনি নিজেও তো ছিলেন একজন সত্যসন্ধানী, তাই ছুটে গেলেন সত্য প্রচারকারীর কাছে। গিয়ে কালেমা শাহাদাত পড়ে সত্য দীনের দীক্ষা নিলেন।

এই সত্য প্রচারক মহান পুরুষটি ছিলেন খোদার রাসূল মুহাম্মদ [সা]। রাসূলেপাক [সা] সোহায়েবের ইসলাম গ্রহণে খুবই খুশি হলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন, 'সোহায়েব হচ্ছে রোমের প্রথম ফল।'

সোহায়েব বিদেশী মানুষ। মক্কায় তার বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। ইচ্ছা করলেই তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে পারতেন। কারণ তখন তো যারাই ইসলামের পথে আসছিলেন, তাদের উপরই কাফেররা অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে দিচ্ছিল। সোহায়েব এসব থেকে বেখবর ছিলেন না। কিন্তু তিনি কাপুরুষদের দলে নাম লেখাতে চাইলেন না। ইসলাম শ্রেষ্ঠ। আল্লাহতায়ালা মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। এটাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহপাক বড় রহম করে মানুষের মাঝে প্রিয় হাবিবকে প্রেরণ করেছেন। আর এখন তো তিনিও সেই দলের একজন কর্মী। তাহলে আর গোপনীয়তা কেন? এ কারণেই তার ঈমানী আবেগকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। মুশরিকদের সামনে নিজেকে সত্যপথের একজন পথিক হিসেবে উপস্থাপন করলেন এবং এই কাফেলায় শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। ব্যস, ভিমরুলের চাকে যেন ঢিল ছুঁড়ে মারা হলো। আল্লাহর দুশমনরা তার ওপর সকল শয়তানী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে নিত্য নতুন নির্যাতন চালিয়ে যেতে লাগল। এমনকি, এই পুণ্যাত্মা

www.pathagar.com

লোকটিকে নিজেদের আমোদ-প্রমোদের বিষয় বানিয়ে নিতেও কুণ্ঠা করলো না। দুপুরের তপ্ত রোদে বালির ওপর তাকে শুইয়ে দেয়া হলো। প্রচণ্ড তাপে পিঠের চামড়া পুড়ে ঝলসে গেল। চর্বি পোড়ার গন্ধ ছুটলো। আবার পরক্ষণই পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরে রাখা হলো। দম বের হয়ে যায় যায় অবস্থা। তাকে প্রহার করা হলো এমনভাবে যে, সারা দেহ দিয়ে রক্তের ধারা বইতে লাগল। অত্যাচারের নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে তিনি যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম, সেই সময় পাপাত্মারা আরো নির্মমতার পরিচয় দিতে যেন তাকে মুহাম্মদের [সা] দল হতে সরে আসার আহ্বান জানাতো। কিন্তু তিনি তো এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে মাথা না নোয়ানোর শপথ নিয়েছেন। তাই তাদের মুখের উপরে বলে দিতে লাগলেন, 'না, সেটা কক্ষনো নয়। আল্লাহ এক। আর মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর রাসূল।'

ব্যস, নতুন উদ্যমে অত্যাচার শুরু হয়ে গেল।

সময়টা মুসলমানদের জন্য খুবই বেদনার ও কষ্টের। এমনই একদিন রাসূলে খোদা [সা] আল্লাহর নির্দেশে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। সাহাবীরা [রা] একে একে মদিনায় হিজরত করলেন। কিন্তু সোহায়েব মক্কাতেই রয়ে গেলেন।

এই সোহায়েবের সামনেই একবার রাসূল [সা] বলেছিলেন, 'তোমরা একদিন হিজর অথবা মদিনায় হিজরত করবে।' আর সেদিন থেকেই সোহায়েব ইচ্ছা করে রেখেছিলেন তিনি হিজরতের সময় নবীর [সা] সঙ্গে থাকার মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করলো যে, রাসূল [সা] আবু বকরের [সা] সঙ্গে গোপনে হিজরত করলেন এবং সোহায়েব তাঁর সফর সঙ্গী হওয়া থেকে মাহরুম হয়ে গেলেন। সোহায়েব মনে মনে বেশ দু:খ পেলেও তা বাস্তবতার কারণে মেনে নিলেন এবং তিনি নিজেও একদিন হিজরতের জন্য বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুশরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো এবং তাকে মদিনায় যেতে দেবে না বলে জানিয়ে দিল। সোহায়েব তখন ধনুকের ওপর তীর রেখে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'হে মক্কাবাসী, তোমরা খুব ভালোভাবেই অবগত আছো যে, আমার তীরের নিশানা কখনো ভুল হয় না। আল্লাহর কসম, আমার তুনিরের সকল তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বেঁচে যায়, তাহলে আমি তরবারি বের করবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকবে ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবো। তাই যদি নিস্তার পেতে চাও, তাহলে আমার পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং নিজেদের ঘরে ফিরে যাও।'

মুশরিকরা তখন বলল, 'তুমি যখন মক্কা এসেছিলে, তখন খুব দরিদ্র ও কপর্দকশূন্য ছিলে। কিন্তু এখন তুমি এখান থেকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছ, এই সম্পদ আমাদের। আমাদেরকে তা দিয়ে দাও এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।'

সোহায়েবের তো ধন-সম্পদের প্রতি এখন আর তেমন লোভ নেই। তিনি আল্লাহর রাসূলের [সা] সান্নিধ্য পেতে উদগ্রীব। তাই সকল ধন-সম্পদ তাদের সামনে ফেলে

www.pathagar.com

দিলেন এবং খালি হাতে মদিনায় রওনা দিলেন।

মক্কাকে এমনিভাবে বিদায় জানিয়ে সোহায়েব রুমি সোজা কুবা পৌঁছালেন, যেখানে দয়ার নবী কতিপয় সাহাবীদের সঙ্গে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। এখানেই খেজুর খাওয়ার মজার ঘটনাটি ঘটল।

কপর্দকহীন নিঃস্ব এক চোখে অসুখ নিয়ে সোহয়েব রাসূলের [সা] সামনে উপস্থিত। চোখের ক্ষতি হবে জেনেও তিনি খেজুর খাচ্ছেন। যখন তার খেজুর খাওয়া শেষ হলো, তখন ইসলামের ত্রাণকর্তা আবু বকর সিদ্দীকের [সা] দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি তো স্বয়ং রাসূলের [সা] সঙ্গে এসে গেলেন। অথচ আমাকে সঙ্গে আনলেন না।' তারপর হুজুরে পাক [সা]-কে উদ্দেশ্য করে তার অত্যাচারিত হওয়ার কথা এবং ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র সবকিছু মক্কায় মুশরিকদের দিয়ে খালি হাতে মদিনায় শুধুমাত্র জীবন বাঁচিয়ে আসার কথা বর্ণনা করলেন। তা শুনে দীনের নবী [সা] মুচকি হেসে বললেন, 'আবু ইয়াহহিয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছো। আবু ইয়াহহিয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছো।' আর তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাজিল হলো, যা তিনি সাহাবীদের শোনালেন : "অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তুত আল্লাহ এসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।"

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু সাঈদ হারিছ [রা]-এর সাথে ইসলামী ভাই বানিয়ে দেয়া হলো সোহায়েব রুমি [রা]-কে। সেখানে [কুবায়] তিনি অবস্থান করলেন বেশ কিছু দিন।

রাসূল [সা] তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি এই বীরের প্রতি এতই মেহেরবান ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তার কুনিয়াত 'আবু ইয়াহহিয়া' প্রস্তাব করেন। অথচ সোহায়েবের [রা] 'ইয়াহহিয়া' নামক কোনো পুত্র ছিল না।

তীর ও তরবারি পরিচালনায় তিনি খুব নিপুণ ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের যথার্থতা প্রদর্শন করেছেন। আপাদমস্তক যিরাহ পরিধানকারী এমন কোনো দুশমন যদি তার সামনে আসতো তাহলে তাক করে তার চোখে এমনভাবে তীর মারতেন যে, সে পিছনে উল্টে গিয়ে পড়তো। হক পথে তার যুদ্ধের বড় গৌরব ছিল।

একদিনের ঘটনা। অর্ধজাহানের খলিফা হযরত ওমর ফারুক [রা] সোহায়েবকে [রা] বললেন, 'হে সোহায়েব, তুমি নিঃসন্দেহে আমার প্রিয়। কিন্তু তোমার তিনটি জিনিস আমার পসন্দনীয় নয়। প্রথমত, তোমার ভাষায় আছমী ছাপ বেশি। অথচ তুমি আরবি হওয়ার দাবি করে থাকো। দ্বিতীয়ত, তুমি দয়া মায়াহীনভাবে তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করো। আর তৃতীয়ত, তুমি নিজের কুনিয়াত এক পয়গম্বরের নামে রেখেছ। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহহিয়া নামের কোনো পুত্র তোমার নেই।'

সোহায়েব একটুও রাগ করলেন না বা অসন্তুষ্টও হলেন না। তিনি ধীরস্থিরভাবে জবাবে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, বাস্তবিকই আমি আরব। শৈশবকালে রোমকরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের মাঝেই লালিত পালিত হয়েছি এবং যৌবনকাল

www.pathagar.com

পর্যন্ত কাটিয়েছি। এ জন্য আমার ভাষায় আছমী ছাপ বেশি। তাতে আমার কোনো কসুর নেই। রইলো অপব্যয়ের কথা। আসল ব্যাপার হলো, আমি অপব্যয় করি না। বরং আমার আমলের বুনিয়াদ নবী করিমের [সা] একটি ফরমান। এই ফরমানে দীনের নবী বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে লোকদেরকে খাবার খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দান করে"। সর্বশেষ রইলো কুনিয়াতের ব্যাপার। তা আমি নিজে গ্রহণ করিনি, বরং রাসূলে করিম [সা] প্রস্তাব করেছিলেন।'

হযরত সোহায়েব আশা করেছিলেন রাসূলের সঙ্গী হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করবেন। সে সৌভাগ্য তার হয়নি ঠিকই, তবে তিনি রাসূলের করিমের [সা] হিজরতের প্রায় অল্প সময়ের মধ্যেই কুবায় তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি ইসলামের জন্যে এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে, সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহর পথের সৈনিকরা এমনই হন। সে কারণেই রাসূল [সা] তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ভালোবেসে কুনিয়াত ঠিক করে দিলেন আল্লাহর একজন নবীর নামে। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়! এ যে অন্ধকার আকাশের শামিয়ানায় জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকা তারা। যে তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলে পাক [সা]-এর নূরের ছোয়ায় জ্যোৎস্নালোকিত। আর এমনটি আলোকময় হয়েছিলেন সে তো রাসূলের [সা] হৃদয় নিংড়ানো মমতা ও ভালোবাসার পরশেই। ■

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স

১১, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ৭১২৪৩২৮,০১৬৭৮-১৪০৩০২

আমাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রয়োজনীয় ইসলামী বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আল কুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দুআর ভান্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন [নামাযের প্রামাণ্য মাসআলা]
৯. আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন সূরা ফাতিহা ও বাকারা
১২. তাফসীরুল কুরআন আমপারা
১৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঞ্চয়ন
২২. যুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) (১ম খণ্ড) [বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কিভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্বের বিধি-বিধান
৩৪. দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব, পর্দা ও ফ্যাশন
৩৬. আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র
৩৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (স) উৎপত্তি, ভিত্তি ও আপত্তি
৩৯. মাও. মওদূদীর সঙ্গে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ
৪০. জান্নাতের পথ পাথেয়
৪১. আল কুরআনে আস সালাত
৪২. আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল
৪৩. ডাঃ জাকির নায়েক রচনাসমগ্র (১)
৪৪. হাদীসে কুদসী
৪৫. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জিহাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
বার্ষিক প্রতিবেদন
(মে-২০১১ - এপ্রিল-২০১২)

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

প্রাথমিক কথা

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরাধা প্রতিষ্ঠান। এর কার্যক্রম দেশের সীমানা পেরিয়ে বহি:বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। একদল সুদক্ষ সংগঠকের সমম্বয়ে পরিচালিত হয় এ সংগঠনটির যাবতীয় কার্যক্রম । পাঠকের জ্ঞাতার্থে বিগত বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরছি।

সাহিত্য সংস্কৃতি "সীরাত স্মারক" ২০১২

কবি মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনা ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের চমৎকার প্রচ্ছদে এ স্মারক প্রকাশিত হয়। এতে দেশের খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের লেখা স্থান পায়। সমকালীন বাংলা ভাষায় এটি শ্রেষ্ঠ নিয়মিত সীরাত স্মারক হিসাবে সুধী মহলে সমাদৃত। এর মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা।

"সাহিত্য সংস্কৃতি" মাসিক বুলেটিন

কবি আসাদ বিন হাফিজ এর সম্পাদনায় এপ্রিল ২০০৯ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি বুলেটিন প্রকাশ হয়ে আসছে। এ বুলেটিনে কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন ছাড়াও দেশ বিদেশের সাংস্কৃতিক অংগনের বিশেষ বিশেষ খবরাখবর স্থান পায়।

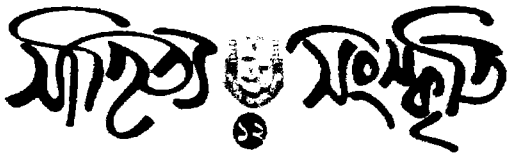

www.pathagar.com

ইসলামিক টেলিভিশনে "হেরার আলো" ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান

বিগত ২ বছর ধরে ইসলামিক টিভিতে প্রতি জুময়া'বার রাত ৯ টায় "হেরার আলো" ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে আসছে। এ অনুষ্ঠানে টক-শো, ডকুফ্লিম, নাটক, গান, আবৃত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনসহ বৈচিত্রপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। দেশের খ্যাতিমান, কবি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাংবাদিক ও সংগঠকরা এতে অংশ নিয়ে থাকেন।

জোন দুই এর উদ্যোগে চা-চক্র

৪ মে ২০১১ বুধবার সাহিত্য সংস্কৃতি জোন দুই এর উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে শিল্পী সাহিত্যিক মিডিয়াম্যান ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে এক চা-চক্রের আয়োজন করে। তৎকালীন জোন-২ এর সভাপতি শরীফ বায়জীদ

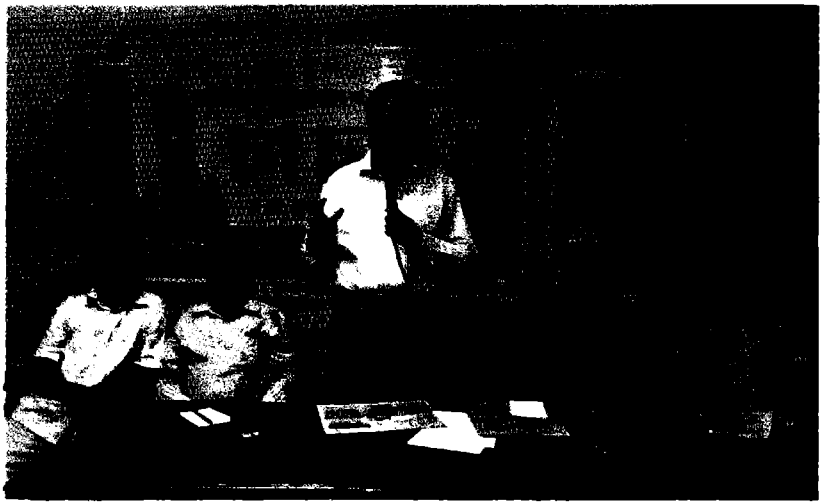

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের

www.pathagar.com

সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ ও বিখ্যাত গীতিকার সুরকার তফাজ্জাল হোসেন খান । অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন জোন সেক্রেটারী যাকীউল হক জ্যাকী । এ অনুষ্ঠানে গান কবিতা ও কথা মালা উপস্থাপন করেন শিল্পী ফজলুল হক শামিল, শিল্পী আবদুস শাকুর তুহিন, আবু শাকের মুহাম্মদ ইউনুছ, প্রিন্সিপাল মোহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুব মুকুল, আহসান হাবীব খান প্রমুখ ।

মরহুম শাহাবুদ্দিন আহমদ স্মরনে বিশেষ সাহিত্য সভা

১৫ মার্চ ২০১১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব হল রুমে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক মরহুম শাহাবুদ্দিন আহম্মদ স্মরনে বিশেষ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীমের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তব্য রাখেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি নাসির হেলাল প্রমুখ, নিবেদিত কবি পাঠে অংশ নেন নবীন প্রবীন কবি বৃন্দ ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাহিত্য সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ

জাতীয় কবির ১১২তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল স্মরণোৎসব

২৯ মে ২০১১ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে জাতীয় কবির ১১২তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরনোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাবেক সচিব মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ

www.pathagar.com

সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ও সাবেক সচিব মোহম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক ডিজি শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী, কবি আল মুজাহিদী ও ড.এস এম লুৎফর রহমান। বক্তব্য রাখেন কবি আসাদ বিন হাফিজ ও কবি মোশাররফ হোসেন খান। জাতীয় কবির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শফি কামাল ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। গান পরিবেশন করেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী ও অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীম।

কবি আল মাহমুদকে শ্রবণযন্ত্র প্রদান

জুলাই ২০১১ মাসে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদকে শ্রবণযন্ত্র প্রদান করে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। সেনসো হিয়ারিং সেন্টার এর সহযোগিতায় শ্রবন যন্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি হাসান আলীম, মো: তৌহিদুর রহমান ও সেনসো হিয়ারিং সেন্টার এর অন্যতম পরিচালক মীর মোশাররফ হোসেন রাজু।

কবি আল মাহমুদকে শ্রবণযন্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সেক্রেটারী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

সময়-
সাংস্কৃতিক চেতনা- ঐক্যবোধ শীর্ষক
গোলটেবিল আলোচনা ও ইফতার মাহফিল

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিগত ২৬ আগষ্ট ২০১১

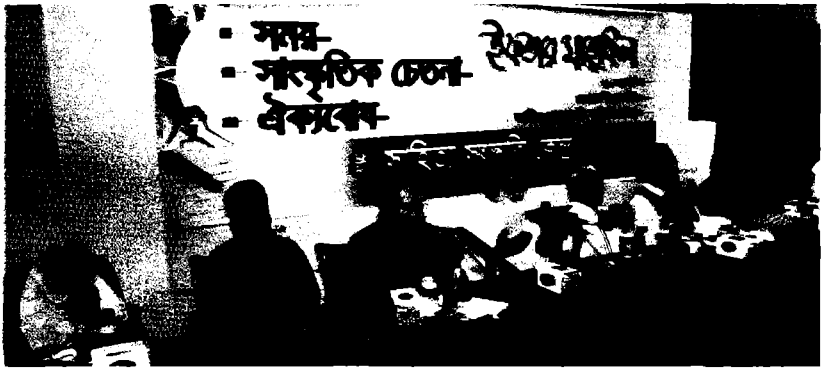

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক সিইসি বিচাপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ মোনাজাত পরিচালনা করছেন

শুক্রবার বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে সময়-সাংস্কৃতিক চেতনা ঐক্যবোধ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সি ই সি বিচারপতি আবদুর রউফ। নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নেন কবি মাহবুবুল হক, চলচ্চিত্র অভিনেতা শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, ডিবেট সোসাইটির কর্ণধার হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, অধ্যাপক মতিউর রহমান,

গোল টেবিল ও ইফতার অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ

www.pathagar.com

ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ

প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লাহ, নিউ নেশন সম্পাদক মোস্তাফা কামাল মজুমদার, শিশু একাডেমীর সাবেক পরিচালক জুবাইদা গুলশান আরা, ডিইউজের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী ও সেক্রেটারী শওকত মাহমুদ, ড. তারেক শামসুর রহমান, অধ্যাপক মোজাহিদুল ইসলাম, দিগন্ত টিভির ই ডি নাট্য ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল আলম গোরা, ড. এস এম লুৎফর রহমান, কবি আল মুজাহিদী, দৈনিক নয়াদিগন্ত সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন প্রমুখ।

বক্তারা সময়কে ধারণ করে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

জোন দুই উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী

২৩ নভেম্বর ২০১১ স্থানীয় একটি মিলনায়তনে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র জোন-২ এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মজিবুর রহমান মন্জু। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জোন সেক্রেটারী যাকিউল হক জ্যাকী। গান কবিতা ও কথামালায় অংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু

www.pathagar.com

নেন নাট্যকার শাহ আলম নূর, শিল্পী সুরকার হাসিনুর রব মানু, আবৃত্তিকার আহসান হাবিব খান, সংবাদপাঠক আসরারুল আজিজ নোমান, টিভি রিপোর্টার হোসাইন মোহাম্মদ নাহিয়ান ও ইমাম হোসেন সৌরভ, শিল্পী শামসুজ্জামান, আই টি এক্সপার্ট আবু তাহের প্রমুখ।

বিজয় উৎসব ২০১১

গান, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিগত ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় উৎসব ২০১১। দৈনিক নয়া দিগন্ত

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক ডিজি ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ মুস্তাফা জামান আব্বাসী

সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে মনোজ্ঞ এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী, কথামালা গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন প্রখ্যাত কবি আল মুজাহিদী, স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল আলম গোরা, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, কবি হাসান আলীম, কবি ইব্রাহীম বাহারী প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন মুস্তাগিছুর রহামন মুস্তাক ও আহসান হাবীব

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের একাংশ

www.pathagar.com

খান। গান পরিবেশন করেন সাইমুম ও অনপম সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীরা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জোন ২ এর সেক্রেটারী যাকীউল হক জ্যাকী। আলোচকরা স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তরুন সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহবান জানান।

সাংস্কৃতিক সফর ২০১২

ইট পাথরের এই মহানগরীতে কর্মক্লান্ত শরীর ও মনের রিফ্রেশমেন্টের জন্য সৃজনশীল মানুষগুলোর জন্য কোলাহলমুক্ত আবহাওয়া খুবই প্রয়োজন। তাই

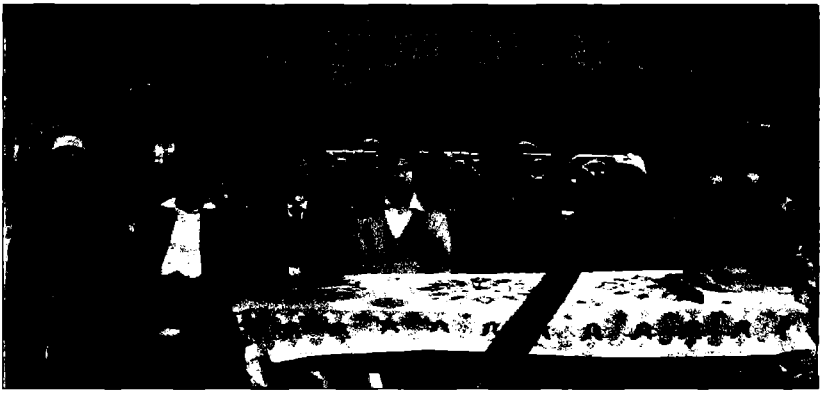

সাংস্কৃতিক সফরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের সাথে অতিথিবৃন্দ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রায় প্রতিবছর আয়োজন করে সাংস্কৃতিক সফর। স্বপরিবারে অনুষ্ঠিত এই সফর এবার অনুষ্ঠিত হয় বিগত ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারী

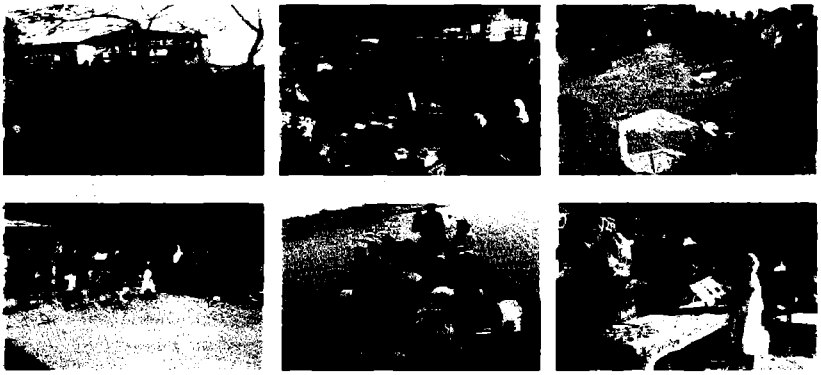

সাংস্কৃতিক সফরে বিভিন্ন ইভেন্টের কিছু খণ্ডচিত্র

www.pathagar.com

২০১২। যমুনা রিসোর্ট এর মনোরম পরিবেশে এই সফরের প্রথম দিন ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। ৩ ফেব্রুয়ারী অধিকাংশ সফর সংগীরা পৌছান যমুনা রিসোর্টে। প্রায় ২৫০ জন নারী পুরুষ এতে অংশ নেন । কেন্দ্রের এই আয়োজন, সকল পর্যায়ের জনশক্তির মাঝে সেতু বন্ধনের এক উজ্জল মাইলস্টোন হয়ে থাকবে এ বিশ্বাস আমাদের।

দ্বিতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিতীয়

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ চারুকলা ইনিস্টিটিউট এর সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট শিল্পী আবদুস ছাত্তার

শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রতিযোগতায় অংশ নেন শতাধিক শিশু-কিশোর। তারা মনের রঙের মতো রং তুলি দিয়ে আঁকে শহীদ মিনার, ৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলনে উত্তাল ছাত্র সমাজের মিছিলের ছবি। যেখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে ছাত্ররা মিছিল করছে, আর পাকিস্তানি পুলিশ নির্দয়ভাবে গুলি ছুড়ে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। আঁকাবাঁকা গেঁয়ো

প্রতিযোগিতায় বিচারকার্য পরিচালনা করছেন সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী

www.pathagar.com

নিবিড় মনে ছবি আঁকছেন ক্ষুদে প্রতিযোগীরা

পথ। নদী ও গ্রামের সবুজ গাছপালা। আরবী, বাংলা, ইংরেজী বর্ণে লাল নীল সবুজ হলুদ হরেক রকম রঙে এক টুকরো কাগজে ফুটে ওঠে আল্লাহ আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহসহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত। তাদের কচি হাত দিয়ে অংকিত হয় আরবী বাংলা হরফের শহীদ মিনার। যা বিচারকমন্ডলীকেও অবাক করে দিয়েছে। রং তুলি দিয়ে এই ছোট্ট শিশু-কিশোররা এত সুন্দর করে আঁকতে পারে, তা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেছে।

ক-গ্রুপ শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী (বয়স অনুর্ধ্ব ১২) পর্যন্ত এবং খ-গ্রুপে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী (বয়স অনুর্ধ্ব ১৭) পর্যন্ত এই দুই ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয় বেলা পোনে ১টায়। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শিল্পী অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিল্পী চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সবিহ উল আলম, নয়া দিগন্তের শিল্প সম্পাদক হামিদুল ইসলাম ও শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিযোগতার আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী ও বাস্তবায়ন কমিটির সমন্বয়ক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার বলেন, নবী করিম সা. ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের ভালোবাসতেন। তিনি এ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি বলেন

www.pathagar.com

শিশুরা সুন্দরের মধ্যে বসবাস করে। সুন্দরের চর্চা করে। ভবিষ্যতে তারা দেশকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সভাপতির বক্তব্যে ড. আবদুর রব বলেন, মুসলমান শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি এবং আল্লাহর সৃষ্টি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে তাদের শিল্প দক্ষতার প্রমাণ করেছেন। অশ্লীল ও নগ্ন এবং জীবের ছবি আঁকা ছাড়াও যে শিল্প চর্চা সম্ভব, তা আগামী প্রজন্মকে প্রমাণ করতে হবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ সকালে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ

সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিস্ট বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ।উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সহ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের একাংশ

www.pathagar.com

সভাপতি মজিবুর রহমান মন্‌জু, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। সহকারী সেক্রেটারীদ্বয় মো:আবেদুর রহমান,শরীফ বায়জীদ মাহমুদ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

বাংলা বর্ষবরণ ১৪১৯

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, বাংলা বর্ষপঞ্জিকা প্রবর্তন হয়েছে মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে তার মন্ত্রিসভার সদস্য আমীর ফতেহ উল্লাহ খান

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন সাবেক সিইসি বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

সিরাজী হিজরি চন্দ্রবর্ষের আলোকে সৌরবর্ষ বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন। আর এটিকে ঈসায়ী বা খ্রিস্টাব্দের সাথে সমন্বয় করেছেন জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি আমাদের বিশ্বাসের সাথে সমন্বয় রেখে বৈশাখ পালন করার আহবান জানান।

কোরাস পরিবেশন করছেন মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী

গত ১৪ এপ্রিল সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে তামান্না ওয়াল্ড ফ্যামিলি পার্কে আয়োজিত ১৪১৯ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কবি আল মুজাহিদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বর্ণিল আয়োজনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, কবি আবদুল হাই শিকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর,

www.pathagar.com

চিত্রনায়ক শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, কেন্দ্রর সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমান ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

কোরাস পরিবেশন করছে সন্দীপন শিল্পগোষ্ঠীর ক্ষুদে শিল্পীরা

নতুন বছরকে বরণ করতে গান, আবৃত্তি, অভিনয়সহ কথামালার এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়। উপচে পড়া দর্শক শ্রোতাদের উপস্থিতে নাট্যকার আহসান হাবীব খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সালাউদ্দীন আহমদ, শিল্পী আবু বকর সিদ্দিক, মাহানগর শিল্পীগোষ্ঠী, সাইমুম, অনুপম, নিমন্ত্রণ ও টুনটুনি আসরের শিল্পীরা। কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি আমিনুল ইসলাম, ডা. মোরশেদ আলী, কবি মনসুর আজিজ, কবি নাজমুস সায়াদাত প্রমুখ।

নাটিকা পরিবেশন করছে অনুপম থিয়েটারের শিল্পীরা

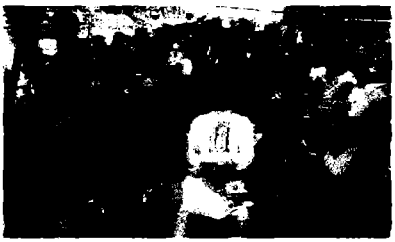

দর্শকদের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বৈশাখী গান পরিবেশন করছে সাইমুমের ক্ষুদে শিল্পীরা

কোরাস পরিবেশন করছে টুনটুনি আসরের শিল্পীরা

দর্শকদের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

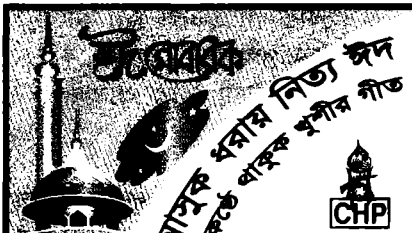

নতুন কনটেন্ট

শিল্পী	ঈদের গান	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
[illegible]	ঈদ মোবারক আজ	৫৪৫২২	১৮১৭২১	৫৪৭১৬	৮৭০৮৪
[illegible]	ঈদ এলো	৫৪৫২৩	১৮১৭২২	৫৪৭১৪	৮৭০৮২
[illegible]	অনুরাগে রঙিন গোলাপ	৫৪৫১১	১৮১৭০৮	৫৪৭১১	৮৭০৭২
[illegible]	ঈদ এলো মানুষের জন্য	৫৪৫২১	১৮১৭২০	৫৪৭১৫	৮৭০৮৩

নতুন কনটেন্ট

শিল্পী	রোজার গান	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
[illegible] মানছুর	আবার এলো রমজান	৫৪৫৬৭	১৮১৭১০৯	৫৪৭৫৬	২৭৭৯৬৯৫
[illegible] (কোরাস)	আকাশে মেঘের দেশে	৫৪৫৬৮	১৮১৭১০১	৫৪৭৫৮	২৭৭৯৬৯৬
[illegible] (কোরাস)	মাহে রমজান এলো	৫৪৫৭১	১৮১৭১০৪	৫৪৭৬১	২৭৭৯৬৯৯
[illegible]ল্লাহ মানছুর	একটি বছর পরে আবার	৫৪৫৫১	১৮১৭৮৫	৫২১৮২১	৮৭০৬২
[illegible]উর রহমান	রমজান রমজান	৫৪৫৭৩	১৮১৭১০৬	৫৪৭৬৩	২৭৭৯৭০১
[illegible]কনুজ্জামান	রমজান এলো	৫৪৫৭২	১৮১৭১০৫	৫৪৭৬২	২৭৭৯৭০০

শিল্পী	নতুন কবিতা	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
সাইফুল্লাহ মানছুর	যে কেউ সুঘ্রাণ (হযরত ফাতেমা (রা.) লিখিত কবিতার অনুবাদ)	৫৪৫৬৯	১৮১৭১০২	৫৪৭৫৯	২৭৭৯৬৯৭
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ (কবিতা)	টিভির পর্দায়	৫৪৫৬৬	১৮১৭১০৭	৫৪৭৬৪	২৭৭৯৭০২

নতুন ইসলামী গান	কন্টেন্ট	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
ফুলকুঁড়ি (কোরাস)	খোকাখুকু সোনামনি	৫৪৫৭০	১৮১৭১০৩	৫৪৭৬০	২৭৭৯৬৯৮
সাইফুল্লাহ মানছুর	হিজল বনে	৫৪৫৫৮	১৮১৭৯২	৫৪৭৪৮	৯৬০৪০
সাইফুল্লাহ মানছুর	যে কোন কাজ কর	৫৪৫৬০	১৮১৭৯৪	৫৪৭৫০	৯৬০৪২
সাইফুল্লাহ মানছুর	সময়তো বয়ে বয়ে	৫৪৫৬৪	১৮১৭৯৮	৫৪৭৫৪	৯৬০৪৬
মশিউর রহমান	হাজার গানের মাঝে	৫৪৫৫৭	১৮১৭৯১	৫৪৭৪৭	৯৬০৩৯
মশিউর রহমান	যার এতায়াত করলে	৫৪৫৫৯	১৮১৭৯৩	৫৪৭৪৯	৯৬০৪১
মশিউর রহমান	কতদূর ঐ মদীনার	৫৪৫৬১	১৮১৭৯৫	৫৪৭৫১	৯৬০৪৩
নাদিয়া	আমার লাগি	৫৪৫৫৬	১৮১৭৯০	৫৪৭৪৬	৯৬০৩৮
নাদিয়া	রাব্বি র হামহুমা	৫৪৫৬৩	১৮১৭৯৭	৫৪৭৫৩	৯৬০৪৫
নাদিয়া	তোমরা আল্লাহর	৫৪৫৬৫	১৮১৭৯৯	৫৪৭৫৫	৯৬০৪৭
ওবায়েদুল্লাহ তারেক	মাওলা তোমার	৫৪৫৬২	১৮১৭৯৬	৫৪৭৫২	৯৬০৪৪

সুপার হিটস

শিল্পী	কন্টেন্ট	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
মতিউর রহমান মল্লিক	পৃথিবী আমার আসল	৫৪৫৪০	১৮১৭৪০	৫২১৮২৫	৮৭১০২
মতিউর রহমান মল্লিক	টিক টিক যে ঘড়িটা	৫৪৫৪৬	১৮১৭৪৬	৫৪৭৪৩	৮৭১১০
সাইফুল্লাহ মানছুর	গোলাপ ফুলকে দেখি	৫৪৫২৪	১৮১৭২৩	৫৪৭৫	৮৭০৮৬
সাইফুল্লাহ মানছুর	মিনারের সুর কি তুমি	৫৪৫৩৩	১৮১৭৩২	৫২১৮২৪	৮৭০৯৫
সাইফুল্লাহ মানছুর	কাতো কার ইশারায়	৫৪৫১৪	১৮১৭১৩	৫২১৮২৬	৮৭০৭৫
সাইফুল্লাহ মানছুর	আল্লাহ আমার রব	৫৪৫৪	১৮১৭৪	৫৪৭১	৮৭০৬৪
মশিউর রহমান	রোজ বিহানে একটা	৫৪৫৪৩	১৮১৭৪৩	৫৪৭১৮	৮৭১০৫
নাদিয়া	দুনিয়া সুন্দর	৫৪৫১৯	১৮১৭১৮	৫২১৮২২	৮৭০৮০

একক গান- মতিউর রহমান মল্লিক

মতিউর রহমান মল্লিক	তোমার সৃষ্টি যদি	৫৪৫৪৮	১৮১৭৪৮	৫৪৭২০	৮৭১১১
মতিউর রহমান মল্লিক	ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি	৫৪৫১৭	১৮১৭১৬	৫৪৭২৯	৮৭০৭৮
মতিউর রহমান মল্লিক	আমার গানের ভাষা	৫৪৫৭	১৮১৭৭	৫৪৭২৫	৮৭০৬৮
মতিউর রহমান মল্লিক	দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো	৫৪৫১৮	১৮১৭১৭	৫৪৭৩০	৮৭০৭৯

ক্বারী	কোরআন তেলাওয়াত	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
ক্বারী আবুল হোসাইন	সূরা এখলাস	৫৪৫৫৪	১৮১৭৮৮	৫২১৮১৯	৮৭১০৮
ক্বারী আবুল হোসাইন	সূরা নাস	৫৪৫৫৩	১৮১৭৮৭	৫২১৮২০	৮৭১০৯

শিল্পী	দরুদ	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
সাইফুল্লাহ মানছুর	ইয়ানবী সালামুআলাইকা	৫৪৫৫৫	১৮১৭৮৯	৫২১৮১৮	৮৭১১৫
সাইফুল্লাহ মানছুর	আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ	৫৪৫৫২	১৮১৭৮৬	৫২১৮১৭	৮৭০৬৫

নতুন শিল্পী	কন্টেন্ট	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
বাঁধন	আকাশটা পড়েছো আল্লাহ	৫৪৫২	১৮১৭২	৫৪৭২১	৮৭০৬১
বাঁধন	তোমার নূরের	৫৪৫৪৭	১৮১৭৪৭	৫৪৭৪৪	৮৭১১২
বাঁধন	হলদে সবুজ নীল পাখি	৫৪৫২৭	১৮১৭২৬	৫৪৭৩২	৮৭০৮৯
হাসনা হেনা	ওরে নিশি পন্থা	৫৪৫৩৯	১৮১৭৩৯	৫৪৭৩৯	৮৭১০১
হাসনা হেনা	সালাতে কমলো না মন	৫৪৫৪৪	১৮১৭৪৪	৫৪৭৪২	৮৭১০৬
শাম্মা	আল্লাহ তোমার কবুল	৫৪৫৬	১৮১৭৬	৫৪৭২৪	৮৭০৬৬

শিল্পী	মায়ের গান	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
সাইফুল্লাহ মানছুর	মা তোমার মুখের হাসি	৫৪৫৩১	১৮১৭৩০	৫৪৭৭	৮৭০৯৩
সাইফুল্লাহ মানছুর	আমার যত দু:খ সুখ	৫৪৫৮	১৮১৭৮	৫৪৭২	৮৭০৬৯
সাইফুল্লাহ মানছুর	মায়ের জন্য ফেরদাউস	৫৪৫৩২	১৮১৭২৯	৫৪৭৮	৮৭০৯৪
নওশাদ মাহফুজ	আমার মায়ের কথা	৫৪৫৯	১৮১৭৯	৫৪৭২৬	৮৭০৭০
আমিরুল মোমেনিন	মা যে দশ মাস দশ দিন	৫৪৫৩০	১৮১৭৩১	৫৪৭০৪	৮৭০৯২

শিল্পী	কন্টেন্ট	গ্রামীণ	রবি	বাংলালিংক	এয়ারটেল
একক গান- সাইফুল্লাহ মানছুর					
সাইফুল্লাহ মানছুর	একটি বছর পরে	৫৪৫৫১	১৮১৭৮৫	৫২১৮২১	৮৭০৬২
সাইফুল্লাহ মানছুর	বহতা নদীর মত	৫৪৫১৩	১৮১৭১২	৫৪৭৩	৮৭০৭৪
সাইফুল্লাহ মানছুর	এই যে সবুজ বন বনানী	৫৪৫১	১৮১৭১	৫৪৭৪	৮৭০৮৫
সাইফুল্লাহ মানছুর	সুবহান আল্লাহ	৫৪৫৪৫	১৮১৭৪৫	৫৪৭১০	৮৭১০৭
সাইফুল্লাহ মানছুর	হে করুনার আধার	৫৪৫২৫	১৮১৭২৫	৫৪৭৬	৮৭০৮৭
সাইফুল্লাহ মানছুর	অমায়িক ব্যবহার	৫৪৫৩৮	১৮১৭০৭	৫৪৭৯	৮৭১০০
একক গান- মশিউর রহমান					
মশিউর রহমান	তুমি আমার মাবুদ মওলা	৫৪৫৪৯	১৮১৭৪৯	৫৪৭১৯	৮৭১১৩
মশিউর রহমান	দাও খোদা দাও আমায়	৫৪৫১৫	১৮১৭১৪	৫২১৮২৭	৮৭০৭৬
মশিউর রহমান	বাড়ী গাড়ী টাকা কড়ি	৫৪৫১২	১৮১৭১১	৫৪৭১২	৮৭০৭৩
মশিউর রহমান	দুটি নয়ন মুদিলে হায়	৫৪৫২০	১৮১৭১৯	৫৪৭১৩	৮৭০৮১
মশিউর রহমান	লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা	৫৪৫২৯	১৮১৭২৮	৫৪৭১৭	৮৭০৯১
একক গান- রোকনুজ্জামান					
রোকনুজ্জামান	আল আরাবী নবী তুমি	৫৪৫৩	১৮১৭৩	৫৪৭২২	৮৭০৬৩
রোকনুজ্জামান	হে খোদা মহান	৫৪৫২৬	১৮১৭২৪	৫৪৭০১	৮৭০৮৮
রোকনুজ্জামান	ও দুনিয়ার মালিক তুমি	৫৪৫৩৬	১৮১৭০৪	৫৪৭০৬	৮৭০৯৭
রোকনুজ্জামান	অবাক হয়ে আমি থাকি	৫৪৫৩৫	১৮১৭০৫	৫৪৭০৭	৮৭০৯৮
রোকনুজ্জামান	তুমি রহমানুর রাহীম	৫৪৫৫০	১৮১৭৫০	৫৪৭৪৫	৮৭১১৪
রোকনুজ্জামান	মুহাররমের চাঁদ	৫৪৫৩৪	১৮১৭০৩	৫৪৭০৫	৮৭০৯৬
একক গান- আমিরুল মোমেনিন					
আমিরুল মোমেনিন	কথায় না বড় হয়ে	৫৪৫২৮	১৮১৭২৭	৫৪৭০৩	৮৭০৯০
আমিরুল মোমেনিন	এই আকাশ নদী	৫৪৫৩৭	১৮১৭০৬	৫৪৭০৮	৮৭০৯৯
একক গান- নওশাদ মাহফুজ					
নওশাদ মাহফুজ	আমি চোখ বুজে দেখি	৫৪৫১০	১৮১৭১০	৫৪৭২৭	৮৭০৭১
নওশাদ মাহফুজ	রব কি তোমার, দ্বীন কি	৫৪৫৪২	১৮১৭৪২	৫৪৭৪১	৮৭১০৪
একক গান- শাহাবুদ্দিন					
শাহাবুদ্দিন	আল্লাহকে সত্যিই ভালবাসে	৫৪৫৫	১৮১৭৫	৫৪৭২৩	৮৭০৬৭
শাহাবুদ্দিন	ঢেউয়ের পরে ঢেউ	৫৪৫১৬	১৮১৭১৫	৫৪৭২৮	৮৭০৭৭
শাহাবুদ্দিন	রাত নিঝুম হলো	৫৪৫৪১	১৮১৭৪১	৫৪৭৪০	৮৭১০৩

GP Welcome Tune করবেন যে ভাবে: Message > wt space > song code > Send to 4000

ROBI goongoon করবেন যে ভাবে: Message > gt space > song code > Send to 6466

গ্রামীণ ফোনে ২২০০ ডায়াল করুন, প্রতিদিন সেহ্‌রী ইফতারের সময়সূচি, ইসলামী তথ্য
সাহাবী কবিদের কবিতা আবৃত্তি, হামদ-না'ত ও ইসলামী গান শুনুন

Powered by SPONDON
Tel: 8342215
01711827933
01630692065
01971595182
01682358849

DARLAND

Follows Curriculum of London University

THE SCHOOL OFFERS

- Introduction of World famous Digi Board (DigiClass)
- The first English Medium School at Mirpur Estd- in 1994.
- Full-time Schooling & Special educational assistance for weak students
- Regular Tripartite (Guardan-Teacher & Students) Meetings
- Regular Debate, Literary Competition & Brains Trust
- Special Guide Teachers for IGCSE (O' & A Level) Students
- Combination of Modern & Moral Education
- CC TV secured Zone & Multimedia Projector
- Grand Picnic, Study Tours & Class Party
- Games Zone & Recreational Facilities
- Merit scholarship and Sibling Benefits
- Satisfactory O' & A Level Results
- Motherly love and care for all
- Air Conditioned Classrooms
- Science Lab & Rich Library
- Ten Active Clubs
- Medical Check-up
- Own Transport

A View of World famous DigiClass

Prof. M. Fazlur Rahman
Founder & Chairman (DIS)

Since 1994

DARLA

INTERNATI

House # 5, Road # 11/2

Phone : 900981

কানে শুনতে সমস্যা?

HEARING CHECK-UP

WIDEX
high definition hearing

Get Hearing Check by Widex top Audiologist along with Special Offers*

SPECIAL OFFER
Choose Widex hearing Aids & Get Attractive Discount

24 Month
Worldwide Warranty
Made in Denmark

* Conditions apply

SENSO HEARING CENTRES

152/2/N (Nahar Plaza) Panthopath, 1st Floor, Dhaka.
Phone : 01731008075, 01712621035

www.widex.com

www.pathagar.com

সবুজ নগর সবুজ দেশ বদলে দেবো বাংলাদেশ

'আগামীকাল মারা যেতে পারো জানলেও
আজ একটি গাছ লাগাও- আল হাদীস'

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৫২ হাজার শেয়ারহোল্ডার ৬০ লাখ জমা গ্রাহক, ৫ লাখ বিনিয়োগ গ্রাহক, ৬১টি জেলার ১০,৭৪৫টি গ্রামের ৬ লক্ষাধিক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের নারী-পুরুষ সদস্য, ১০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দেশের সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৬ কোটি মানুষের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান- আসুন সকলে অন্তত ১০টি করে গাছ লাগাই এবং পরিবেশ রক্ষা করি।

ইসলামী ব্যাংক শুরু থেকেই সরকারের সকল কর্মসূচীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে আসছে এবং বনায়ন কর্মসূচীর মতো বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা, সবাই এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে দেশ গড়তে এগিয়ে আসবে।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com